ঋগ্বেদের দেবতা

নিগূঢ়ানন্দ

লেখকের বক্তব্য

ঋগ্বেদের দেবতাদের বহু দেবতার পরিচয় এতে দেওয়া হলেও কোথাও কোথাও কেউ বাদ পড়ে যেতে পারেন। বর্তমান গ্রন্থের উদ্দেশ্য এই নয় যে ঋগ্বেদে বাচ্যার্থে যে দেবতাদের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁদের একটা ইতিহাস দেওয়া। বর্তমান গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য ঋগ্বেদের দেবতারা প্রকৃত পক্ষে কি তাই জানানো। তাঁদের যথার্থ মূল্য নিরূপণ করাই বর্তমান গ্রন্থের লক্ষ্য। ঋগ্বেদের সূক্তগুলিতে কাহিনীর ভাব থাকলেও প্রকৃত পক্ষে বহু বক্তব্যই মরমিয়া। ঋগ্বেদীয় ঋষিদের সেই মরমিয়া ভাবটুকু ধরতে না পারলে দেবতাদের পরিচয় যথার্থ পাওয়া যাবে না। সুতরাং বাস্তবদৃষ্টি থেকে যাঁরা ঋগ্বেদের দেবতাদের দেখার চেষ্টা করেছেন তাঁদের বক্তব্য উল্লেখ করেও কোথায় এর গোপন সত্যটি নিহিত আছে বর্তমান গ্রন্থে তাই ধরবার চেষ্টা করেছি। ঋগ্বেদের দেবতাদের দুটো দিক আছে, একটি বাইরের আর একটি অন্তরের। বাস্তব জ্ঞানের ভিত্তিতে যদি এঁদের আলোচনা করা যায় তাহলে মনে হবে প্রকৃতির বিভিন্ন অবস্থার এঁরা ব্যক্তিরূপ মাত্র—personification of nature. কিন্তু যথার্থ অর্থে এঁরা তা নন। এঁদের যথার্থ সত্য নিহিত রয়েছে অন্তরানুভূতির মধ্যে। সেখানেই তাঁদের সত্যিকারের পরিচয়। বর্তমান আলোচনা সে দিক থেকে পাঠকদের কাছে নতুন একটি দিক খুলে দেবে আশা করি। ঋগ্বৈদিক ঋষিদের দেবতা কল্পনায় আধুনিক বিজ্ঞান-চেতনারও অভাব ছিল না। বিজ্ঞানের বক্তব্যের উল্লেখ করে করে সে দিকটিও দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে। ভারতবর্ষের প্রাচীনতম অধ্যাত্ম চেতনার মধ্যে যে কোন কুসংস্কার ছিল না বরং শ্রদ্ধা জানানোর মত সত্য ছিল আশা করি পাঠক তা বুঝতে পারবেন।

এই লেখকের অন্যান্য অধ্যাত্ম গ্রন্থ

সাধুসন্তের দেশে
সহস্রারের পথে
আত্মার রহস্য সন্ধানে (২য় সং)
প্রাণ মন আত্মা
পরমাত্মার চোখ
মহাতীর্থ একান্ন পীঠের সন্ধানে (৩য় সং)
মৃত্যু ও পরলোক (৩য় সং)
জন্মান্তর (২য় সং)
সর্পতান্ত্রিকের সন্ধানে (১/৫ খণ্ড)
দিব্যজগৎ ও দৈবী ভাষা (১/২ খণ্ড)
পৃথিবীর অধ্যাত্ম সাধনা ও ভারত (১/২ খণ্ড)
দিব্যজগৎ রহস্য
শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার আত্মা ও পরমাত্মা
দেবদেবীর উৎস সন্ধানে
আত্মা মৃত্যু স্বর্গ নরক
জাতিস্মর
আত্মা ও পরমাত্মা
চল মন বৃন্দাবন
ঈশ্বর সন্ধানে ভারত
প্রভৃতি

মামীমা—

বাণী রানী ঘোষ

শ্রীচরণেষু

ঋগ্বেদের দেবতা

প্রথম অধ্যায়

ঋগ্বেদের দেবদেবীর চিন্তা ঋগ্বেদেই প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিল তা নয়। এদের শেকড় ছিল আরো অনেক অতীতে, প্রাক্‌বৈদিক মানুষের চিন্তার মধ্যে। আর এদের উদ্ভব সম্ভবতঃ ভারতের মহান প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে। ভারতবর্ষে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর সৌন্দর্যের তুলনা নেই। তুষার বিজড়িত নগাধিরাজ হিমালয়ের চাকচিক্যময় গিরিশৃঙ্গ, নিবিড় সবুজের আস্তরণে জড়িত মনোহারী অধিত্যকাসমূহ, সীমাহীন সমুদ্র, ষড়ঋতু এ-সবই মনকে প্রাকৃত থেকে অপ্রাকৃত বা অতিপ্রাকৃত জগতে নিয়ে যাবার মত। এমন যে কাব্যচেতনাহীন মানুষ তারো মনে শরৎ হেমন্ত শীত বসন্ত বর্ষা গ্রীষ্ম সবই অব্যক্ত একটা অনুরণন জাগায় বৈকি। এই প্রকৃতিই হয়তো প্রাচীনতম কাল থেকে আর্যদের মনে বিরাট পরিমাণ প্রভাব ফেলে থাকতে পারে। যার ফলেই তাদের মানসিকতার মধ্যে ধীরে ধীরে একটা অধ্যাত্মতা ও কাব্যিক ভাব জেগে উঠেছিল। প্রকৃতির এই প্রভাব শুধুমাত্র তার মনের মধ্যেই থাকেনি— চোখের মধ্য দিয়ে মরমে প্রবেশ করে তাকে মরমিয়া করে তুলেছিল। আর তার এই মরমিয়া স্বভাবই বিশ্ব থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে অদ্ভুত একটি স্বতন্ত্রতা দান করেছে। প্রাক্‌বৈদিক যুগে এই মহান প্রকৃতিই হয়তো তার কবি-বৃত্তিকে নাড়া দিয়ে থাকবে। তার শিশুর মত মনে স্বাভাবিক ভাবেই মনে হয়েছে যে, এমন মহান দৃশ্যের পেছনে কোন দৈবশক্তির হাত না থেকেই পারে না। এঁরাই এই সুন্দর মহান সব দৃশ্যের স্রষ্টা অতিপ্রাকৃত চিৎসত্তা। 'দিব্'-দান করা এই ধাতু থেকেই দেবতা। এই মহান প্রাকৃত চিত্র যাঁরা দান করেছেন তাঁরা তাই দেবতা। এই ভাবেই সম্ভবতঃ ঋগ্বৈদিক দেবতাদের উদ্ভব। কিন্তু এসবই আমাদের অনুমান মাত্র। প্রাচীন কাহিনীকারদের তৎকালীন মানসিকতার সঙ্গে একাত্ম না হতে পারলে এঁদের চরিত্র যে সম্যক বোঝা যাবে তা কখনও নয়। মনের কারবার যখন বেশী তখন মরমিয়া হতে না পারলে মনের গভীরগহনজাত সৃষ্টির স্বরূপই বা কি করে বোঝা যাবে! একটি কবিতা বা একটি কাহিনী বাইরের উপাদানে সমৃদ্ধ হলেও মনের জারক রসে তা পাচ্য না হলে সৃষ্টির আকারে প্রকাশ পেতে পারে না। সেই যে মন— তার হদিশ পেয়েছে ক'জন! মনের মধ্যে ডুব যাঁরা দিয়েছেন—তাঁরা অবাক হয়েছেন এই দেখে যে, একটা দেহের আবরণের মধ্যে যার স্থান, ভেতরে ঢুকলে তার সীমাই খুঁজে পাওয়া যায় না। যাঁরা মনের মধ্যে ডুব দেবার এই কলা-কৌশল আয়ত্ত করেছেন তাঁরা সবাই জানেন সেখানে ব্যাপারটা কি রকম। মানুষের সমগ্র জৈব-চেতনাকে মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দেখার এই কলাকৌশলের নামই যোগ। হয়তো অন্তরের সঙ্গে বহির্চেতনার এই সংযোগ ঘটানো হয়

বলেই এর নাম যোগ। অন্তরের সঙ্গে বাইরের চেতনার সংযোগ বলে এর নাম যেমন যোগ, তেমনই এটা বিয়োগও—বাইরের সঙ্গে বিয়োগ। হোমিওপ্যাথি ঔষধে স্থূল ঔষধির বাস্তবসত্তাকে বিয়োগ করতে করতে যেমন তার মৌল-শক্তিকে প্রচণ্ড রকমে বাড়িয়ে দেওয়া যায়—ব্যাপারটা তেমনই। বাইরে বিয়োগ করে যাঁরা ভেতরে আরও বেশী প্রবেশ করেন তাঁরা এই ক্ষুদ্র দৈহিক খাঁচার অভ্যন্তরে ততই বড় এক বিস্তৃতি দেখে চমকে যান। বাইরের আকাশ থেকেও বড় এক আকাশ ছড়িয়ে আছে সেখানে। আরও বড় কথা সে আকাশে কালের খামখেয়ালী রাজত্বই আর চলে না। অর্থাৎ ত্রিকাল বলতে আমরা যা বুঝি সেই ধরনের কালের কোন রাজত্বই নেই। সেখানে অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ এক আকাশে এমন বৃত্তায়িত ভঙ্গীতে ধৃত হয়ে আছে যে, পাহাড়ের চূড়া থেকে দাঁড়িয়ে সমতল ভূমির পারিপার্শ্বিকের চতুষ্পার্শ্বস্থ দৃশ্য একবারে দেখার মত তিন কালকেও একবারে দেখা যায়। আর যাঁরা এটা দেখতে পান তাঁরা ত্রিকালজ্ঞ। তাঁরাই কবি। এই কারণে কবিকে ত্রিকালজ্ঞই বলা হয়। এখানে কাল কোন মাধ্যাকর্ষীয় টানের মুখে বেঁকে যায়নি। এখানে দেশ কোন ভারিবস্তুর চাপে বেঁকে ন্যুব্জ হয়ে পড়েনি। বেদের কবিতা যাঁরা লিখেছিলেন তাঁরা কবি। তাঁরা বাইরের জগৎকে অন্তরে নিয়ে অন্তরের রসে জারিয়ে যা তৈরি করেছিলেন বাইরের চেতনা দিয়ে আজ কি তা সবটাই বোঝা সম্ভব ? এ জন্য চাই মানসিক শক্তির বড় রকমের উদ্বোধন। বাইরের মাত্রায় আমরা চলি ত্রিমাত্রায়—যে মাত্রাটা ইউক্লিডের জ্যামিতিব মাত্রা—নিউটনীয় সরল প্রান্তের উপর দাঁড়িয়ে। আসলে মাত্রা সবকিছু আপাত স্থূলবস্তুরই চারটি—দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, ঘনত্ব ও দেশকাল। এর উপর আর একটি মাত্রা বাড়লে সীমার বাঁধন দূরে চলে যায়। যাকে ভেতর মনে হয় তা বাইরে এসে বাহির অপেক্ষাও মহান এক অসীমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। এ যে কোন কবির কল্পনা, পাগলের প্রলাপ তা নয়। বিজ্ঞানই এখন এর স্বীকৃতি দিচ্ছে। নিসর্গ-বিজ্ঞানী কার্ল স্যাগান বলেছেন—"যদি কোন চতুঃমাত্রিক জীব আমাদের তথাকথিত ত্রিমাত্রিক জগতে থাকতো তাহলে ইচ্ছামত দেখা দিতে পারত, আবার মিলিয়ে যেতেও পারত। আবদ্ধ ঘর থেকে আমাদের নিঃশব্দে তুলে অকস্মাৎ অন্য কোথাও দৃষ্টিগোচর করাতে পারত। আমাদের ভেতরটাকে বাইরে আনতে পারত। নানাভাবে আমাদের ভেতরটাকে বাইরে আনা যেতে পারে। সবচেয়ে বোধহয় কম মনোহর হবে সেই দৃশ্যটাই যখন আমাদের দেহের আভ্যন্তরীণ নাড়িভুঁড়ি ও প্রত্যঙ্গগুলি বাইরের মহাকাশে ছড়িয়ে পড়বে, দেখতে পাব সমগ্র মহাকাশ আন্তছায়াপথীয় জ্যোতির্ময় বাষ্প, ছায়াপথ গ্রহ নক্ষত্র সবই আমাদের ভেতরে। অবশ্য এরকম আমার পছন্দ কিনা বলতে পারি না।[১] এ ধরনের

১ If a fourth-dimensional creature existed it could, in our three dimensional universe, appear and dematerialise at

চিন্তা আমাদের ত্রিমাত্রিক জীবের স্বাভাবিক চিন্তাধারা বিরোধী বটে, তবে তা একেবারেই যে অসম্ভব তা নয়। এলিসের ওয়ান্ডারল্যান্ডের ঘটনা ঘটতেই পারে। তবে সে জন্য আমাদের বিশ্ব নয়, প্রতিবিশ্বের দরকার। আর এ ধরনের প্রতিবিশ্ব যে নেই তাও নয়। এই প্রতিবিশ্বের জগতের সম্ভাবনার দুয়ার যিনি খুলে দিয়েছেন তাঁর নাম পল ডিরাক। এই ডিরাক যেমন তেমন পদার্থবিদ নন। তাঁর সম্পর্কে বোর (Bohr) বলেছেন, 'সকল পদার্থবিদের মধ্যে ডিরাক হচ্ছেন সর্বাপেক্ষা নির্মল চিত্ত।' পরে অবশ্য ডিরাক নির্ভেজাল গণিতশাস্ত্রেই নিজেকে সমর্পণ করেন।

১৯২০ সাল অবধি সাধারণভাবে সকল পদার্থবিদই বিশ্বাস করতেন যে, প্রকৃতিতে দুটোই মৌল পরমাণু আছে—প্রোটন ও ইলেকট্রন। দুইয়েরই চার্জ বিপরীত মেরুপ্রান্তিক। ডিরাক ধনাত্মক চার্জ সম্পন্ন ইলেকট্রন আবিষ্কার করেন। কার্ল এন্ডারসন ক্লাউড চেম্বারে এই ধনাত্মক ইলেকট্রন বা পসিট্রনের অস্তিত্ব আবিষ্কার করে ডিরাকের ধারণাকে প্রমাণিত করেন। ফলে দু'জনেই নোবেল পুরস্কার পান। প্রমাণিত হয় যে প্রত্যেকটি পরমাণুরই বিপরীত ঘূর্ণন ও চার্জ সম্পন্ন প্রতিপরমাণু আছে। প্রমাণিত হয় প্রত্যেকটা বস্তুরই প্রতিবস্তু আছে। বিশ্বে সমপরিমাণ বস্তু ও প্রতিবস্তু রয়েছে। প্রতিবস্তুতে ব্যবহার বিচিত্র রকম। যেমন ইলেকট্রন যদি ধনাত্মক হয় তবে তার গতি হবে সময়ের হিসেবে পেছনের দিকে। আর এই ধনাত্মক ইলেকট্রনের গতি ধরে যদি সত্যি সত্যি পেছনের দিকে যাওয়া যায় তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াবে কিরকম? —আগে মৃত্যু পরে জন্ম। আগে বিশ্বজগৎ পরে বিশ্বজগতের উৎপত্তি। দৃশ্যগুলো হবে যেন সিনেমার চলমান রিলের শেষ থেকে শুরুর দিকে যাত্রা। তাহলে আমাদের বিশ্বের যা আইন তা গতির মাত্রার তারতম্যে বৈপ্লবিক ভাবে পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে বৈকি! আর এই যে সব বিচিত্র লীলা সবই মানুষের মন-সাপেক্ষ। এইজন্যই বৈজ্ঞানিক হুইলার বলেছেন, 'আমাদের বাদ দিয়ে বিশ্বের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। দর্শক ছাড়া পদার্থ-বিজ্ঞানের নিয়মও কার্যকর নয়।'[২] সুতরাং মনের কোন্ মাত্রিক অবস্থা থেকে

will, change shape remarkably, pluck us out of the locked rooms and make us appear from nowhere. It could also turn us inside out. There are several ways in which we can be turned inside out : the least pleasant would result in our viscera and internal organs being on the outside and the entire cosmos glowing intergalaetic gas, galaxies, planets everything on the inside. I am not sure, I like the idea, Cosmas, F. N. Carl Sagan p. 219.

২ ব্যাপারটাকে স্পষ্ট বোঝার জন্য পাঠক John Boslough-এর Masters of

ঋগ্বেদের মরমিয়া ঋষিরা তাঁদের সূক্তগুলি রচনা করেছিলেন তা আমাদের সাধারণ মানুষের দৃষ্টি দিয়ে বিচার করলে বিচার যথার্থ হবে কি হবে না সেটা তো নিশ্চয়ই ভেবে দেখতে হবে। তা ছাড়া শব্দের তাৎপর্য যে এখনও আগের অর্থই প্রকাশ করছে তা তো নয়। ভাষাটাও তো আর মৃত নয়, জীবন্ত। লতার ডগার মত বেড়ে উঠে কখন কি ভাবে তার রঙ পাল্টেছে বলাটা তেমন সহজ একটা ব্যাপার নয়। তবু মানুষের বোঝার চেষ্টায় ক্ষান্তি কই। যে যেমন বোঝে তেমন ভাবে প্রকাশ করার একটা আকৃতি তো থাকেই। এক মন সৃষ্টি করলে আর একটা মন ধ্বংস করতে পারেই। এই তো লীলা। বাস্তব বুদ্ধিতে ঋগ্বেদের দেবদেবীকে যেমন বিচার করা গেছে তাই দেখা যাক। তার বিজ্ঞান, অতিবিজ্ঞান আর মরমিয়া ভাব? সুযোগ পেলেই চেষ্টা করে দেখা যাবে।

প্রকৃতিই যে ঋগ্বেদের দেবদেবীর উৎস, আপাতদৃষ্টিতে তাই তো মনে হয়। প্রাকৃত দৃশ্যের অন্তরালে অতিপ্রাকৃত কোন শক্তিকে কল্পনা করেই এসেছে মিত্র, বরুণ, দ্যু, পৃথিবী, অগ্নি ইত্যাদির কল্পনা। যদি মরমিয়া দৃষ্টিতে তাকান তাহলে এই মিত্র নিত্যদৃষ্ট আমাদের আকাশের সূর্য নয়—এ হল সৃষ্টির প্রারম্ভের বিস্ফোরণজনিত আলো, যা দিব্য জ্যোতিরূপে আজো ব্যাপ্ত হয়ে আছে দেশের কোন সূক্ষ্ম স্তরে, অন্তর্দর্শী যোগীরাই যা শুধু মানস নেত্রে দেখতে পান। এইই হল প্রাণের উৎস—প্লাজমা। স্তরে স্তরে নানাভাবে যা বস্তু বিশ্বরূপে প্রতিভাত। অপর পক্ষে বরুণ আদিতে ঋগ্বেদে আকাশ হিসেবে চিহ্নিত হলেও পরবর্তীকালে অর্থ বদলে হয়েছেন সাগরের দেবতা। সুতরাং ঋগ্বেদের শব্দের আদি অর্থ যে নির্ভেজাল তেমনটিই রয়েছে—তা তো নয়। সিন্ধু উপত্যকার সীলমোহর দেখে বা অন্যান্য প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য দেখে তার ইতিহাস উদ্ধার যতটা সত্য প্রাচীন মানসের মধ্যে না ঢুকে বর্তমান মন নিয়ে আদিবৈদিক ভাষা বিশ্লেষণ করে তার অন্তর্নিহিত অর্থ ধরার প্রয়াসও তেমনই। তবু এই সীমাবদ্ধতা নিয়েই আমাদের অগ্রসর হতে হবে।

মিত্র, বরুণ, দ্যু, পৃথিবী, অগ্নি ইত্যাদি প্রাক্‌বৈদিক দেবতা। আর্যদের প্রাচীনতম কাল থেকেই পূজা পেয়ে আসছেন। কিন্তু ঋগ্বেদে এসে চূড়ান্ত মহত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছেন। আর্যরা দ্যু ও পৃথিবীর উপর চিন্তা করতে করতে শেষ পর্যন্ত যেন অসীমের দ্যোতনা পেয়ে গেছেন। সেই অসীমই তাঁদের কাছে হয়েছেন অদিতি। সকল দেবতার মাতৃরূপে তিনি প্রতিষ্ঠিতা হয়েছেন। সন্তানেরা হয়েছেন আদিত্য। অদিতি আসলে প্রাচীনতমকালে অসীমেরই এক নাম। এই অসীম যে নৈর্ব্যক্তিক চিন্তার পরিণতি তা নয়, দৃষ্টিতে যে অসীমতা ধরা পড়েছে—তারই পরিণাম। এ অসীম তার প্রান্তহীন অস্তিত্বে

Time গ্রন্থের ১৩১-৩২, ১৪৯, ২১৪-১৫, ২২৯ পৃষ্ঠা ও Dr. Michio Kaku ও Jennifer Trainer-এর Beyond Einstein গ্রন্থের দশম অধ্যায় Back to the Future অংশটি পড়ে দেখতে পারেন।

ছড়িয়ে রয়েছে পৃথিবী ছাড়িয়ে, মেঘ ছাড়িয়ে, আকাশ ছাড়িয়ে কোথায়, কেউ জানে না। অদিতির মূল অর্থ অবিচ্ছিন্ন, অদৃশ্য, অসীম। যাস্ক অদিতিকে বলেছেন দেবকুলের জননী। দেব মানে 'দিব্' ধাতু থেকে দান করা। কিন্তু ঋগ্বেদে দেবতারা আলোরই প্রতীক। আশ্চর্য যা কিছুর সৃষ্টি তা তো এই অপরিচ্ছিন্ন এক থেকেই! সেই অপরিচ্ছিন্ন এক আবহাওয়া মণ্ডলীর আকাশেরও ঊর্ধ্বে যে দেশ (space) তারও উপরের অবস্থান। আবহাওয়া-মণ্ডলের উপরের এই যে আকাশ বিজ্ঞান বলেছে সেই আকাশ বা দেশ থেকে বিশ্বের যাবতীয় কিছুর উদ্ভব।[৩] এই যে বিজ্ঞানের ধারণা যারা এটাও না জানবেন তাঁরা বস্তুবাদে বিশ্বাসী হলে ঋগ্বেদের অদিতি কল্পনাকে নিতান্তই কল্পনার বিস্তার বলে মনে করবেন। অর্থাৎ যার বাস্তবিক কোন ভিত্তি নেই। কিন্তু ব্যাপারটিকে এখন কি তাই মনে হচ্ছে? প্রশ্ন হতে পারে এই যে, কোয়ান্টাম ফিজিক্সের ধারণা, তৎকালে পদার্থবিজ্ঞান না জেনেই ঋগ্বেদীয় ঋষিরা করলেন কি করে? তাহলে তো ব্যাপারটাকে অকস্মাৎ ঢিল ছোঁড়ার মত বলতে হয়। লাগে তাক, না লাগে তুক। আসলে সেদিক থেকে বিচার করতে গেলে ব্যাপারটাকে মরমিয়া অভিজ্ঞতার মধ্যে আনতে হয়। মরমিয়ারা বলেন, মরমের মধ্যে ঢুকে গেলে এসব আপনিই উদ্ঘাটিত হয়। কিন্তু আমরা যারা বই লিখি, নিজেদের মত বিচার করি, তাঁদের কেউ যদি বিজ্ঞান জানেন তো মরমিয়া অভিজ্ঞতা তাঁদের নেই, আবার কারো যদি মরমিয়া অভিজ্ঞতা থাকে তো বিজ্ঞানের জ্ঞান নেই। শুধু নিজেদের বিচার বুদ্ধি দিয়ে যা ধরা। সেখানেও যে দর্শনশাস্ত্রের একটা নিয়ম আছে তা কি আমরা মানি? সেই আমরাই যখন প্রাচীন মরমিয়া ঋষিদের অন্তর্দর্শনের বিচার করতে যাই, তার ঠিক বিচার করি কিনা তা ভেবে দেখার মত বৈকি। তবু আমাদের যদি কিছু লিখতে হয় বাস্তব বুদ্ধিকে এড়িয়ে যেতে তো আর পারব না। সুতরাং আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে যা মনে হচ্ছে ভেবে দেখি।

সাধারণ বুদ্ধিতেও একটা চমক যে আমাদের মনে না লেগেছে তা নয়।

"Hence space may grow out of nothing and matter may come out of space." God and New Physics—Paul Davies p. 41.

"Physicists for years have been intrigued by the possibility that the entire universe came from a quantum transition from nothing (i. e. pure space-time without matter or energy).······There was no violation of the conservation of energy when it was created out of nothing.······Again it appears that empirically the total energy of the universe is close to zero.—Beyond Einstein Dr. Michio Kaku and Jennifer Trainer. pp. 40-41.

সত্যিই তো বৈদিক ঋষিরা, স্বভাব-কবিরা একটা বিরাট অবিচ্ছিন্নের চিন্তা তাঁদের মধ্যে কিভাবে আনতে পেরেছিলেন! ঋগ্বেদের সময়ের মত প্রাচীন যুগে কি করে সব কিছুর উৎপত্তির মূলসূত্র ধরতে পেরেছিলেন! এই অপরিচ্ছিন্নকে যে সত্য হিসেবেই তাদের প্রতীতির মধ্যে এনেছেন, তা নয়, এই বস্তুবিশ্বের নিয়ন্ত্রক অন্যান্য সত্তাকেও তাঁর থেকে জাত বলে ধারণা করতে পেরেছিলেন। যদিও অদিতির নামে ঋগ্বেদে বহু সূক্ত নেই, তথাপি প্রায়ই বৈদিক সাহিত্যে আদিত্যদের সঙ্গে তাঁর উল্লেখ পাওয়া যায়। অদিতিই হলেন স্বর্গীয় গোলক—যাকে বর্তমান বিজ্ঞান বলছে ফাঁকা দেশ, যে দেশের কোন প্রান্ত নেই। সুতরাং একে বলা হয়েছে hypersphere.[৪] সময় ও দেশ থেকে সব কিছুর উৎপত্তি। এই যে দেশ এ কিন্তু মহাদেশ অর্থাৎ মহাশূন্যতা বা বিজ্ঞানের ভাষায় supervoid নয়। এ হল মহাশূন্যতা ও বস্তুজগতের মাঝখানের শূন্যতা। এ 'দেশ' হল সেই দেশ যার মধ্যে সময় রয়েছে।[৫] একমাত্র সময়হীন দেশই মহাশূন্যতা। এই যে অন্তর্বর্তী দেশরূপ অদিতি তিনি কেবল মাতা নন—মাতা, পিতা, পুত্র সব। তিনিই সর্বদেবতা:

৪ There is in fact another possible model for the universe that avoids the complication of infinities ; it was proposed by Einstein himself in 1917. Based on the fact that space can bend, Einstein argued that space can connect upto itself in a variety of unexpected ways. The curved surface of the earth can be used as an analogy. The earth's surface is finite in area but unbounded : nowhere does a traveller meet an edge or boundary. Similarly space could be finite in volume but without any edge or boundary.······The shape is called a hypersphere.—God and New Physics—Paul Davies p. 17.

৫ The idea of space being created out of nothing is a subtle one that many people find hard to understand, especially if they are used to thinking of space as already being 'nothing'. The physicists however regards space as more like an elastic medium than as emptiness. Indeed we shall see in later chapters that because of quantum effects even the purest vacuum is a ferment of activity and is crowded with evanescent structures. To physicists 'nothing' means 'no space' as well as no matter.—God and New Physics—Paul Davies. p. 18.

পশুশ্রেণীর প্রাণসত্তা। তিনি সৃষ্ট আবার সৃষ্টিরও কারণ। এই ধারণাই পরে রূপের জালে জড়িয়ে পড়ে পুরাণ কাহিনীর সৃষ্টি করেছে।

এই যে অদিতি উদ্ভূত দেবতাবৃন্দ—এঁদের বুঝতে গেলে প্রথমতঃ বৈদিক ধর্ম সম্পর্কে একটা ধারণা করে নেওয়া উচিত। ধর্ম যথার্থ অর্থে অধ্যাত্মতা—একে বুঝতে হলে এর সঙ্গে সঙ্গে আরও দুটি বিষয়কেও জানতে হবে। প্রাচীন ধর্ম অর্থাৎ অধ্যাত্মতা। অধ্যাত্মতা, পুরাণ কাহিনী ও জাদুর এক অদ্ভূত সংমিশ্রণ। সাধারণ অর্থে ধর্ম বলতে বুঝি অতিপ্রাকৃতকে বোঝার চেষ্টায় মানুষের কতকগুলি ধ্যান-ধারণা। এর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে যুক্ত হয়ে রয়েছে বহু প্রার্থনামূলক সূক্ত, অনুষ্ঠান ইত্যাদি। অনুষ্ঠানের সঙ্গে রয়েছে যাগ বা যজ্ঞ। পুরাণ কাহিনী বলতে বোঝায় দেবদেবী বা প্রাগৈতিহাসিক উল্লেখযোগ্য পুরুষদের বর্ণনা, তাঁদের উৎস, পরিবেশ, কার্যকলাপ ইত্যাদি। পুরাণ কাহিনী এই জন্য মানুষের বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত।

মানুষ অন্তর্জগতে যে অভিজ্ঞতা লাভ করে প্রকাশ করে—যাঁরা মরমিয়া নন তাঁরা তাকে অ-আন্তরিক করে যখন বাইরে প্রকাশ করেন তখনই হয় পুরাণ কাহিনী।[৬] অন্তর্জগতের অভিজ্ঞতাকে গল্পের প্রতীকে প্রকাশ করাই পুরাণ কাহিনীর কাজ। এই প্রকাশ বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রকাশ না করা হলেও পরে দেখা যায় বিজ্ঞানের আবিষ্কারের সঙ্গে তার প্রতীকি অর্থের বেশ মিল হচ্ছে। যেমন Ursa Major বা নক্ষত্রসমূহের অবস্থান এমন যে, দেখতে একটা সসপেনের মত দেখায়। যখন লিপির উদ্ভাবনা হয়নি তখন এই নক্ষত্রসমূহকে ভালুকের আকারে এঁকে দেখানো হত। বর্তমানে অণুর পরিকল্পনামাফিক চিত্রে পদার্থবিদেরা অনুরূপ ডায়াগ্রামই আঁকেন। এই চিত্রকেই পরে অভিজ্ঞতার অভাবে তৎকালীন পুরোহিতেরা যথার্থ অর্থে ধরে নিয়ে গল্পকথা তৈরি করেছিলেন। ঋগ্বেদের কথাই ধরা যাক। ঋগ্বেদে দেবতাদের অদিতির সন্তান হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। সেই অদিতি বর্তমানে এসে দাঁড়িয়েছেন একজন দেবী হিসেবে—যাঁর গর্ভ থেকে সৃষ্টির সবকিছু আত্মপ্রকাশ করেছে। অথচ প্রাচীন কালে আর্য ঋষিরা যখন অদিতির কল্পনা করেছিলেন তখন এই নাম দ্বারা সীমাহীন দেশকেই বুঝিয়েছিলেন। দক্ষ, পুরুষ এবং বিরাজ সম্পর্কেও এই কথা প্রযোজ্য। দক্ষ শব্দ দ্বারা প্রাচীন ঋষিরা বুঝিয়েছিলেন সৃজনী মানস। 'পুরুষ' শব্দ দ্বারা শক্তি ও বস্তুসত্তার নানা অবস্থা। 'বিরাজ' দ্বারা বোঝাতে চেয়েছিলেন বস্তুসত্তা।

কখনও কখনও অন্তদ্রষ্টা ঋষিদের বর্ণনায় বাহ্য একটা স্ববিরোধী উক্তি দেখা যায়। যেমন ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের বাহাত্তর নং সূক্তের চতুর্থ শ্লোকে আছে ঃ

৬ Mysticism reduced to non-mystical level is mythology. Brahman $E=mc^2$—James Wallace. p. 3.

"ভূর্জজ্ঞ উত্তানপদো ভুব আশা অজায়ন্ত।
অদিতের্দক্ষো অজায়ত দক্ষাদ্বদিতিঃ পরি ॥"

অর্থাৎ "উত্তানপদ থেকে পৃথিবী জন্মাল, পৃথিবী থেকে দিক জন্মাল, অদিতি থেকে দক্ষ জন্মালেন, দক্ষ থেকে আবার অদিতি জন্ম নিলেন।" স্বভাবতই প্রশ্ন জাগবে অদিতি এবং দক্ষের মধ্যে তবে কে প্রথম এসেছিলেন? কিন্তু যখনই অদিতির ব্যক্তিরূপ বাদ দিয়ে তাকে ধরব সীমাহীন দেশরূপে এবং দক্ষকে সৃজনী মানস হিসেবে এই আপাতবিরোধী ভাব উঠে যাবে। তখন এই ধরনের অর্থ স্পষ্ট হবে—সীমাহীন দেশের গর্ভেই সৃজনী মানস থাকে। আবার এই সীমাহীন দেশও সৃজনী মানস থেকেই এসেছে। মনে রাখতে হবে, অদিতিরূপী যে দেশ তা কিন্তু মহাশূন্যতা বলতে যা বোঝায় তা নয়, এ হল অন্তর্বর্তী দেশ—যার মধ্যে সময়ের ভূমিকা আছে। যেহেতু এর কোন প্রান্তভাগ নেই সেইজন্য একে সীমাহীন প্রতীয়মান হয়।

সৃষ্টির জগতে একই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি প্রায়ই দেখা যায়। আমরা যদি ছায়াপথ, নক্ষত্রসমূহ, সৌরজগৎ সব কিছুর সৃষ্টির ইতিহাস লক্ষ্য করি—তাহলেই ব্যাপারটাকে ভাল ভাবে ধরতে পারব। ছায়াপথের উদ্ভব হয় তখনই যখন হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম অণুসমূহ দ্বারা সৃষ্ট মেঘসদৃশ অবস্থার ঘূর্ণাবর্ত শুরু হয়। এই আবর্তের কেন্দ্রীয় শক্তি ঘনবদ্ধ হয়ে সৃষ্টি করে উজ্জ্বল বস্তুসত্তার। এই উত্তপ্ত উজ্জ্বল বস্তুসত্তার কেন্দ্র থেকে কিছু দূরে সমমেঘেরই কিছু অংশ স্বতন্ত্র আবর্ত সৃষ্টি করে এবং এই নবঘূর্ণাবর্ত-কেন্দ্রের চারদিকে সূর্যসমূহ সৃষ্টি হতে থাকে। যেখানে মূল মেঘের বিস্তৃতি অনেক বড় সেখানে কোথাও কোথাও আরও ক্ষুদ্র ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি হয়ে গ্রহসমূহের জন্মদান করে। এসব ঘটনাই পুনরাবৃত্তিমূলক। এ থেকেই প্রাচীন ঋষিদের ধারণা হয়েছিল যে, পুনরাবৃত্তিমূলক ঘূর্ণায়মান আকৃতিই বিশেষ বিধান, যা যথার্থের মূল সত্তা হিসেবে তাকে পরিচালিত করে। এ থেকেই এরকম বিশ্বাস জন্ম নিয়েছে যে, শক্তি বস্তুতে রূপান্তরিত হল। সূক্ষ্ম শক্তি তার ব্যোমীয় চরিত্র হারিয়েই স্থূল বস্তুরূপে প্রকাশিত হয়েছে। এরকমই একটা বিশ্বাস আপাতবিরোধী উক্তিতে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৯০তম সূক্তের পঞ্চম শ্লোকে ব্যক্ত হয়েছে। যেমন,—

"তস্মাদ্বিরাড়জায়ত বিরাজো অধি পূরুষঃ।
স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ভূমিমথো পুরঃ ॥"

অর্থাৎ "তাঁর (পুরুষ) থেকে বিরাট জন্ম নিলেন এবং বিরাট থেকে পুরুষ জন্মগ্রহণ করলেন। তিনি জন্মগ্রহণপূর্বক পশ্চাদ্ভাগে ও পুরোভাগে পৃথিবীকে অতিক্রম করলেন।" আপাতদৃষ্টিতে এর কোন বাস্তব বুদ্ধিজাত ব্যাখ্যা করা অসম্ভব প্রতীয়মান হবে। কিন্তু যখনই আমরা প্রথম পুরুষকে সূক্ষ্ম বস্তুসত্তা ও দ্বিতীয় পুরুষকে স্থূল বস্তুসত্তারূপে দেখব—তখন শুধুমাত্র 'বিরাজ'-এর চরিত্রই স্পষ্ট হবে না, আপাত স্ববিরোধী উক্তির ধাঁধাও দূর হবে। প্রথম পুরুষ হলেন শক্তি। দ্বিতীয় পুরুষ স্থূল বস্তুসত্তা।

বিরাজ এই দুইকেই যুক্ত করছেন। কিন্তু এই সূক্তটির নামগুলিকে যখন ব্যক্তিসত্তা দেওয়া হচ্ছে তখনই তা কাহিনীর রূপ পাচ্ছে, পুরাণ কাহিনী সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে। আপাতদৃষ্টিতে সেগুলিকে অবিশ্বাস্য বলে মনে হচ্ছে।

এরই পরবর্তী কাহিনী বিস্তারে দেখা যাচ্ছে ব্রহ্মার পর অর্থাৎ ব্রহ্মাণের অর্থাৎ মৌলের অধিকতর বস্তুসত্তার দিকে ধাবমানতার পর মৌল দুভাগ হয়ে যাচ্ছে—পুরুষ ও প্রকৃতি রূপে, অর্থাৎ ধনাত্মক ও নঙর্থক ইলেকট্রিক চার্জ হিসেবে। বিরাজ প্রকৃতিতে স্থাপিত হচ্ছেন। এর দ্বারা এই বোঝাবার চেষ্টা হয়েছে যে, ব্রহ্মার পুরুষ+প্রকৃতির মিলন থেকে বিরাজের জন্ম হচ্ছে, এই দুই অবস্থার একীভবন বা দ্বন্দ্ব থেকে নয়। ব্যাপারটা ঠিক বিজ্ঞানের হাইড্রোজেন অণুর মত। হাইড্রোজেন অণু অবআণবিক ও স্থূল বস্তুসত্তার মধ্যে যোগাযোগের সূত্র হিসেবে কাজ করে। হাইড্রোজেন অণু আবার আসছে অবআণবিক পরমাণু নিউট্রন থেকে। নিউট্রন থেকে স্বতই বেরিয়ে আসছে একটি ধনাত্মক চার্জসম্পন্ন প্রোটন ও একটি নঙর্থক চার্জসম্পন্ন ইলেকট্রন। ইলেকট্রন ধনাত্মক চার্জসম্পন্ন প্রোটনের চারদিকে ঘুরছে।

সাংখ্য সম্প্রদায় পরবর্তীকালে বিরাজের বদলে প্রকৃতি শব্দটির আমদানি করেছে। বলেছে, প্রকৃতিই হল পুরুষের সহধর্মিণী। প্রকৃতি এখানে বস্তুগুণ। এই চরিত্র পরিবর্তন সত্ত্বেও মৌল চিন্তার পরিবর্তন ঘটেনি। শক্তির মৌল চিন্তা প্রথম পুরুষ হিসেবে প্রকৃতির মধ্য দিয়ে (বিরাজ) যে বস্তুসত্তার (দ্বিতীয় পুরুষ) জন্ম দিচ্ছে তা সবটাই মিলিয়ে যায়নি।

অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, তা যদি হয় তবে প্রাচীনেরা একই শব্দ দিয়ে দুটো ভিন্ন জিনিস বোঝাবার চেষ্টা করেছেন কেন ? একই 'পুরুষ' শব্দ দ্বারা কেন শক্তি ও বস্তু দুইই বোঝাচ্ছেন ?

এর জবাব যে খুব একটা কঠিন তা নয়। যাঁরা সত্যের যথার্থ চরিত্র আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন, সৃষ্টির বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে একটি মূল সূত্র চলে গিয়েছে এটা বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁদের কাছে বস্তু ও শক্তির মধ্যে আর কোন পার্থক্য থাকেনি। ফলে প্রকৃতির বিভিন্ন প্রকাশকে একই নামে অভিহিত করতে দ্বিধা হয়নি। এ হল আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের $E=mc^2$-এর মত। এই ধারণা অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল বলেই প্রাচীন ঋষিরা ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ১৬৪তম সূক্তের ৪৬তম শ্লোকে বলতে পেরেছিলেন ঃ

"ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্।
একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ ॥"

অর্থাৎ "আদিত্যকে মেধাবীগণ ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি বলে থাকেন। ইনি স্বর্গীয় পক্ষবিশিষ্ট ও সুন্দর গমনশীল। ইনি এক হলেও একে বহু বলে বর্ণনা করা হয়। একে অগ্নি, যম ও মাতরিশ্বাও বলে।"

এই যে অন্তর্দর্শনের নৈর্ব্যক্তিক বোধ তাকে অন্তদর্শনীয় চরিত্রচ্যুত করে নামের মধ্যে ব্যক্তিত্ব আরোপ করলে তবেই পুরাণ কাহিনীর সৃষ্টি হয়। এর যথার্থ স্বরূপ আবিষ্কার করা না গেলে পুরাণ কাহিনী ও দর্শনের দ্বৈতাবস্থা

কিছুতেই অতিক্রম করা যাবে না। প্রাচীন হিন্দুদর্শন যথার্থই অন্য যে-কোন দার্শনিক চিন্তাকে অতিক্রম করে গেলেও যথার্থ স্বরূপ না বুঝলে প্রাচীন ভারতীয় পুরাণ কাহিনী ঈশপের গল্পের কাছাকাছিও যেতে পারে না। পুরাণ কাহিনীকে পরীর গল্পজাতীয় ভাব থেকে মুক্ত করা গেলে দেখা যায়, তা বর্তমান পদার্থবিজ্ঞানের চিন্তার সঙ্গে সুরে সুর মিলিয়ে নিজেদের যথার্থতা প্রমাণ করতে পারছে। যা ভারতীয় পুরাণ কাহিনীর ক্ষেত্রে সত্য, তা অনুরূপ ভাবে পৃথিবীর অন্যান্য পুরাণ কাহিনীরও আন্তরিক সুর। বিশেষ করে প্রাচীন পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কিত কাহিনী সর্বত্রই আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তার সঙ্গে তার গল্পেব খোসা ফেলে দিতে পারলে এক হয়ে যায়।

এই প্রসঙ্গে প্রাচীন পৃথিবীর জগৎ-উৎপত্তির বিষয়ে কিছু সংখ্যক প্রাচীন মানুষের চিন্তার কথা তুলে ধরা যাক।

মধ্য অস্ট্রেলিয়ার অরণ্ড জাতীয় মানুষদের জগৎ-উৎপত্তির প্রারম্ভিক চিন্তা ছিল এই রকম ঃ

"প্রারম্ভে সবই চিরন্তন অন্ধকারের মধ্যে স্থিত হয়ে ছিল। রাত্রি যেন দুর্ভেদ্য ঘন ঝোপের মত সবকিছুকে পিযে মারছিল।"

আমেরিকার কুইচি মায়ারা এই আদি অবস্থার চিন্তা করেছিল এইভাবে ঃ

"আদিতে সব কিছুই ছিল স্তব্ধ হয়ে, স্থির হয়ে, নিবিড় নীরবতার মধ্যে। সবই ছিল গতিহীন স্থির হয়ে। আকাশের কোন বিস্তার ছিল না।"

গিলবার্ট দ্বীপের মইয়ানারা গল্পকথা তৈরি করে এই অবস্হার কথা বর্ণনা করেছিল। গল্প এই ধরনের ঃ

"শূন্যে ভাসমান মেঘের মতন এরিয়ান একা দেশের মধ্যে বসেছিলেন। অথচ তিনি নিদ্রিত ছিলেন না, কারণ তখন ঘুমই ছিল না। তিনি ক্ষুধার্ত বোধ করেননি, কারণ তখন ক্ষুধা ছিল না। যতক্ষণ তাঁর মনে কোন চিন্তা না এল তিনি এইভাবেই অনেকক্ষণ বসে থাকলেন। নিজের মনে মনেই তিনি বললেন—আমি কিছু সৃষ্টি করব।

চৈনিক পুরাণ কাহিনীতেও এই অবস্হার বর্ণনা আছে ঃ "প্রথম ছিল এক নিখিল বিশ্বডিম্ব। সেই ডিমের ভিতর ছিল বিশৃঙ্খলা। সেই বিশৃঙ্খলার মধ্যে অপরিস্ফুট দৈবী ভ্রূণ হিসাবে ছিলেন পানকু। পানকু ডিম ভেঙে বেরিয়ে আসেন মনুষ্যরূপে। তখন তিনি ছিলেন বর্তমান মানুষের চতুর্গুণ আকৃতি। তাঁর হাতে ছিল হাতুড়ি বাটালি, তাই দিয়ে তিনি জগৎ তৈরি করেন।"

খ্রীষ্টপূর্ব ১ম শতকে চীনে হুয়াই নান জু এই অবস্হার বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছিলেন ঃ

"আকাশ ও পৃথিবী রূপ গ্রহণ করার আগে সবই ছিল আকৃতিবিহীন। এই অপরিচ্ছিন্ন স্বচ্ছতায় আলো এসে স্বর্গ তৈরি করে। ভারি ও ঘোলা জিনিস ঘনীভূত হয়ে সৃষ্টি করে পৃথিবী। নির্ভেজাল সূক্ষ্ম উপাদনসমূহ সহজেই কাছাকাছি চলে আসে। তবে ভারি ও অপরিচ্ছন্ন উপাদানগুলির

পক্ষে ঘনীভূত হওয়া কণ্টকর ছিল। এই কারণেই আগে সৃষ্টি হয় আকাশ পরে পৃথিবী। যখন মহাশূন্যে আকাশ ও পৃথিবী সংযুক্ত হয়, তখন সবই যেন সহজ হয়ে যায়। সৃষ্ট না হয়েও তখন নানা জিনিস আত্মপ্রকাশ করে। ছিল এক। সেই এক থেকে সবকিছু বেরিয়ে এসে হল পৃথক পৃথক।"

উপরোক্ত বর্ণনার সঙ্গে বেদের নামদীয় সূক্তের বর্ণনাও হুবহু মিলে যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের মধ্যে প্রাচীনকালে যখন যোগাযোগের অভাব ছিল তখন তাঁদের চিন্তার মধ্যে এই অপূর্ব সাদৃশ্য লক্ষ্য করলে সত্যিই অবাক হতে হয়। এটা সম্ভব হয়েছিল এই কারণে যে, প্রত্যেকেই অন্তরের মধ্যে এই সত্যকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। অন্তরের গভীরতম প্রদেশে সব মানুষই সমান। এবং তারা একই সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে। সমুদ্রের উপরে শিরতোলা পাহাড়ের চূড়াগুলিকে পৃথক মনে হলেও গভীর সমুদ্রের তলদেশে সবই অবিচ্ছিন্ন সত্তায় একত্রে যুক্ত হয়ে আছে। এই অভ্যন্তরের অবিচ্ছিন্ন সত্তাকেই মনস্তত্ত্ববিদ য়ুঙ বলেছেন 'অচেতন মানস' স্তর। চেতন ও অবচেতন মানস স্তর ভেদ করে সেখানে নামতে পারলে সকলেই সমমানসিকতায় যুক্ত হয়ে যায়। যাঁরা সেই মনের গভীর গহনে ডুব দিতে পেরেছিলেন—তাঁরা সকলে তাই সমমানসিক স্তর থেকে সমান মুক্তাই সংগ্রহ করেছেন। আপাত বিচ্ছিন্ন জগতে আমরা সেই অবিচ্ছিন্ন মানসস্তরের খবর জানি না বলেই একে অপরকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন দেখি। প্রাচীন স্তরের মনীষীরা সেই মহামানস-স্তরে গিয়ে যে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন তা তাই সকলের ক্ষেত্রেই সমান। তাই বহির্দুনিয়ায় বিচ্ছিন্ন হয়েও একদা পৃথিবীর বহু প্রান্তের মানুষ একই ধরনের সত্যে উপনীত হতে পেরেছিলেন। আজ সেই যোগাযোগের সূত্র রচনা করেছেন বিশ্বের বিজ্ঞানীরা। উপরোক্ত অনুভব বর্তমান পদার্থবিজ্ঞানের Big Bang তত্ত্বের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। বিজ্ঞানের Singularity অবস্থার মধ্যে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন যে সেখানে দেশ ও কালের কোন অস্তিত্ব ছিল না। দেশ ও কাল পরের সৃষ্টি। এবং উভয়ে উভয়ের সঙ্গে একাত্ম সম্পর্কে যুক্ত—যাকে বলা হয়েছে Time space continuum. উপরোক্ত বর্ণনা ও কাহিনীর সঙ্গে Big Bang-এর পার্থক্য এই যে, বিজ্ঞানের এই তত্ত্বকে আমরা পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ পাই। কিন্তু প্রাচীন অনুভূতির মূল্যে সেই অনুভূতিতে না গেলে বোঝার কোন উপায় নেই।

প্রাচীন তত্ত্বগুলি সাধারণ মানুষ বোঝার মত অবস্থায় ছিল না। সেই জন্য প্রতীকের আবরণে তাঁরা এই ধারণাগুলিকে মুড়ে দিতে চেয়েছিলেন; প্রাকৃত এই শক্তিকে ব্যক্তিরূপ দিয়ে, দেবতা নামে চিহ্নিত করে সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধা কুড়াবার ব্যবস্থা করেছিলেন। Alfred Hillebrandt তাঁর Vedic Mythology গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন যে, যে সকল উপাদান থেকে পুরাণ কাহিনী সৃষ্টি হয়েছে—তা, নানা ধরনের। কল্পনাকে যা নাড়া দেয়, যা ভয়ের সৃষ্টি করে, আনন্দের সৃষ্টি করে, আমাদের মনকে প্রভাবিত করে, তা স্বপ্নেই হোক বা জাগ্রত অবস্থাতেই হোক দিব্য সত্তা বা দৈত্য দানোর উৎস

স্বরূপ কাজ করেছে। অনুভূতি যখন কাব্যের আকারে আত্মপ্রকাশ করে তখনও তা পুরাণ কাহিনীর উৎস হতে পারে। কবিতার মধ্যে পুরাণ কাহিনীর সমচরিত্রের সহোদরা রয়েছে।[৭] একটি দেশের চরিত্র, জনগণের মানসিক ও সাংস্কৃতিক গঠনশৈলী যার যার পুরাণ কাহিনীর উৎস ঠিক করে দেয়, দেবতাদের বেদী নির্দিষ্ট করে দেয়। যে মানসশৈলী দেবতা তৈরি করে, তাই কবিতার উৎস হিসাবে কাজ করে। গল্পকথার উৎসের মত কবিতার উৎসও স্রষ্টার পরিবেশ, প্রাকৃতিক চরিত্র, জলবায়ু ইত্যাদি। অবশ্য এর পাশাপাশি অধ্যাত্মতাও বড় কথা। প্রাকৃতিক পরিবেশের পার্থক্য অনুযায়ী দেবদেবী ও কবিতার চরিত্রও ভিন্ন ভিন্ন হয়। কোন নির্দিষ্ট নিয়ম দ্বারা যে এ পরিচালিত হয় তা নয়। এর মধ্যে যেমন রয়েছে মানসিক অবস্থা, তেমনই বাইরের প্রভাব। অভিবাসন, ভিন্ন নরগোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ, সভ্যতার বিকাশ ও অবক্ষয়, আবহাওয়া, নবপ্রজন্মের নতুন ভাবনা, ব্যক্তি মানুষের সৃজনী প্রতিভা—এ সবকিছুই কবি বা পুরোহিত উভয়ের উপরই সুদূর-প্রসারী প্রভাব ফেলেছে। এসব কিছুই মিলেমিশে মনের দূরধিগম্য গভীর গহন থেকে যে সৃষ্টির প্রেরণা তৈরি করে তাই পুরাণ কাহিনীর উৎস।

J. W. Hauer-এর মতে ধর্মমতের উদ্ভব, এর প্রগতি বা অবক্ষয় সবই নির্ভর করে প্রাকৃতিক পরিবেশ বা আবহাওয়ার প্রভাবের উপর। আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক পরিবেশ মানুষের সমগ্র মানসক্ষেত্র ও জাতির ভাবাবেগের উপর অনিবার্য প্রভাব ফেলে।

আমরা দেবতার আবির্ভাব, বা তাঁর আত্মপ্রকাশের যথার্থ সময়ের কথা খুব কমই জানি। যেমন ইন্দ্র ও বৃত্রের ধাপে ধাপে বিকাশের কথা একটা বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করে ঠিক করা খুবই কষ্টকর। কি ভাবে যে একদা বিষ্ণু এসে প্রবল প্রতাপান্বিত ইন্দ্রকে মর্যাদা-চ্যুত করে নিজে মহামহিয়ান হয়ে উঠেছেন তার সঠিক হদিশ করাও দায়।

সূর্য ও চন্দ্র এই দুইই বোধহয় প্রাকৃত সত্তা হিসাবে যুগে যুগে মানুষ ও বিভিন্ন জাতির মানসিকতাকে সর্বাপেক্ষা বেশী নাড়া দিয়েছে। তাই তাদের নিয়ে গল্পকথা তৈরি করারও শেষ নেই। ভারতবর্ষেই দেখা যায় বিভিন্ন আঞ্চলিক ধর্মবিশ্বাস গোষ্ঠী বিশ্বাস এই সব থেকে বেদের নানা দেবদেবী উঠে এসেছেন। প্রকৃতির ভিন্ন কোন অবস্থা থেকে এত বহুপ্রকার দেবদেবীর জন্ম হয়নি। আবার শুধুমাত্র বৈদিক পুরাণ কাহিনী নয়, ভারতীয় পুরাণ কাহিনীতেও দেখা যাচ্ছে কিছু কিছু দেবতার আবির্ভাব ঘটেছে মানুষ থেকে। মর্ত্যভূমি থেকে ধীরে ধীরে তাঁদের স্বর্গের দুয়ারে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

তবে বেদে দেখা যাচ্ছে সৌরধর্মচর্চা খুব কমই আছে। চন্দ্র উপাসনার ধারা ছিল না বললেই চলে। কিন্তু বজ্রবিদ্যুতের কথা বহু পরিচিত।

---

৭ Mythology has a sister of kindred nature in poetry.—Vedic Mythology—Alfred Hillbrandt. p. Introduction-2.

বর্ণনামূলক নৃতত্ত্ব যদি চর্চা করা যায় তাহলে মনে করতে খুব দ্বিধা হবে না যে, বহু দেবতার উৎসই প্রকৃতির ঘটনাবলী। বাক্যের বা ভাষার ত্রুটি থেকেই যে এঁরা দেবতারূপে আত্মপ্রকাশ করেছে তা নয়। যথার্থই এঁদের উৎস প্রকৃতি। প্রকৃতির এই প্রভাব শুধু যে সমাজের নিচুস্তরের মানুষের মধ্যে ছিল তা নয়, সংস্কৃত ও রুচিবান মানুষের উপরেও সমান ভাবে পড়েছিল। প্রাচীন মানুষের কাছে সূর্য ও চন্দ্র অভিবাসন ও যুদ্ধযাত্রাকালে বিশেষ ভূমিকা পালন করত। তাদের পশুচারণা ও পশুকুলের উপরও এর প্রভাব ছিল। শিকারযাত্রার সময়ও এই নক্ষত্রটি ও উপগ্রহটি তাদের পথের দিশারী ছিল। তাদের চাষবাসের সাফল্য নির্ভর করত আলোর উপর। চন্দ্রের কলা পরিবর্তন সর্বত্রই মানুষের কল্পনাকে প্রবল ভাবে নাড়া দিয়েছিল।

দেবতারা শুধু যে একটা নৈর্ব্যক্তিক চিন্তার মধ্যেই থেকেছেন তা নয়, তাঁরা ব্যক্তিরূপ পরিগ্রহ করেছেন। একে বলে Personification of the God. এর কারণ, বৈদিক ভারতীয়রা যে-কোন চিন্তাকেই ধরাছোঁয়ার মধ্যে আনার চেষ্টা করতেন। ঋগ্বেদের কাল নির্ভেজাল দার্শনিক চিন্তার পক্ষে তেমন সহায়ক ছিল না। তবে তাঁদের মধ্যে যে নৈর্ব্যক্তিক চিন্তা ছিল না তা নয়। মনু, কাম, পুরন্ধি প্রভৃতি চিন্তা রূপ ধরে ধরাছোঁয়ার মধ্যে তেমন করে আসেনি। ঋত্ শব্দটির কল্পনাই অব্যক্তিবাচক। ঋগ্বেদে এমন অনেক সূক্ত আছে যার উৎস প্রকৃতি। বৃহদারণ্যক উপনিষদ থেকে বেশ ভালভাবেই দার্শনিকতার প্রভাব লক্ষ্যণীয়। মিত্র, বরুণ, আর্যমন প্রভৃতির মধ্যে দার্শনিক চিন্তার এমন সূক্ষ্মধারা প্রবাহিত হয়েছে যাকে প্রাচীন ভারতীয় মানসিকতাতে বর্বর পর্যায়ের বলা চলে না।

দেবদেবীর নাম মূলত উপাধিবাচক। ধীরে ধীরে এ-সব নির্ভেজাল রূপাত্মক নাম পর্যায়ে নেমে এসেছে। ব্যক্তিভাব আরোপের মধ্যে কোন 'একদা' বা 'এখন' এমন কোন ভেদরেখা নেই। এত প্রাকৃত দিক কিভাবে নৈর্ব্যক্তিক চিন্তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বলার উপায় নেই। আবার কেনই যে এই নৈর্ব্যক্তিক কল্পনাগুলি দার্শনিক মানসিকতা থেকে প্রাকৃত গুণের রূপ ধরেছে তা বলাও কষ্টকর। সবিতৃ, ধাতৃ প্রভৃতি শব্দ পরে এসেছে। প্রাচীন ইন্দ্র, বিষ্ণু, মিত্র এবং বরুণ অনেক আগেই তাঁদের উপাধিবাচক সংজ্ঞা হারিয়ে ব্যক্তিরূপ পরিগ্রহ করেছেন। ভাষাতত্ত্ব ভাল করে জানা গেলেও—পুরাণ কাহিনীর উদ্ভবের পটভূমি তেমন করে জানা যাবে না। ভাষা জ্ঞান দ্বারা বহু ব্যক্তিরূপের অর্থ উদ্ধার করতে গেলে ভুল হবার সম্ভাবনা। কেউ কেউ পূষণকে বলেছেন পথের দেবতা, বিষ্ণুকে দিব্য পদসঞ্চারী। তবে এই শব্দগুলির উদ্ভবের মুখে যে প্রথম দিকে এমন অর্থই ছিল তা জোর দিয়ে বলার উপায় নেই। পূষণকে দেখা যাচ্ছে অন্তত পনের বার আঘ্রিনি নামে উল্লেখ করা হচ্ছে—যার অর্থ উজ্জ্বল, জাজ্জ্বল্যমান। ফলে নিশ্চিন্তরূপে বলা যায় না পূষণ অর্থ পথদেবতা। পূষণ সম্পর্কে বলা হচ্ছে ঊর্ধ্বগগনে তাঁর আসন। চন্দ্রের সঙ্গে দ্বৈত সম্পর্কে যুক্ত হয়ে সেখানে বিরাজ করছেন। যদি সত্যসত্যই পথদেবতা হবেন—তবে

নিশ্চয়ই তাঁর স্হান মৃত্তিকায় হত আকাশে নয়। পূষণের আলোর সঙ্গে যোগই বেশি থাকার কথা, কারণ ঋগ্বৈদিক আর্যরা আলোর দেবতাদেরই বেশি মর্যাদা দিতেন। ঋগ্বেদ কোন লোকগাথা নয়। সে কালের সার্বিক বিশ্বাসকে ধরে রাখার চেষ্টা যে এর মধ্যে আছে তাও নয়। একটা বিশেষ মানসিকতা থেকেই সূক্তগুলির উদ্ভব ও সংকলন। দিব্যজগতের সন্ধানী হলেও ঋগ্বৈদিক ঋষিদের যে দৈত্যদানব ভীতি, ভূতপ্রেতের ভীতি না ছিল তাও নয়। সেই কারণেই ঋগ্বেদে আমরা পিশাচের উল্লেখ পাই। পাই যাতুধানের। নানা-ধরনের জাদুর ব্যাপারও রয়েছে। এমন পূর্বপুরুষীয় আত্মার সাক্ষাৎ পাই যারা পিতৃপুরুষদের পরলোকে নিয়ে যায়। উদ্ভিদ ও বৃক্ষপূজার ব্যাপারও রয়েছে। এমনকি সোমরস পেষণ করার পাথরেও দেখা যায় দেবত্ব আরোপ করা হয়েছে। তবে ভূতপ্রেত, রাক্ষস, ডাইনীবিদ্যা, রোগ-সারানোর মন্ত্র এসবের ভূমিকা ঋগ্বেদে তেমন নেই। এদের ব্যক্তিরূপ দেওয়া হচ্ছে এমন খুব কমই নজরে পড়ে। ঊর্ধ্বজগতের বহু প্রাকৃতিক ঘটনাকেই ব্যক্তিরূপ দিতে দ্বিধা নেই। দুটো পথের চিন্তা তাদের মধ্যে ছিল—দেবযান ও পিতৃযান। ঋগ্বেদের মূল লক্ষ্য ছিল দেবযান। বহু পুরোহিত পরিবার উচ্চতর দেবতার স্তুতিই করেছেন। গৃহ্যসূত্র ও পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে যাঁদের দেখা যায়—ঋগ্বেদে তাঁরা প্রায় অনুপস্হিত। যে দেবতাদের তাঁরা স্তুতি করেছেন তাঁরাও নৈর্ব্যক্তিক চিন্তা, ব্যক্তিরূপকল্পনা মাত্র। যখন সে ভাবের উদয় হয়েছে ঋগ্বেদের ঋষিদের কাছে সেই ভাবই প্রাধান্য পেয়েছে। তবে দেখা যায় মাঝে মাঝে দেবতারা দৈত্যে পরিণত হচ্ছেন, আর দৈত্যেরা দেবতায়।

মনে হয় আর্যরা মূলতঃ গতিশীল বা সঞ্চরমান নরগোষ্ঠী ছিল। এক একটা অভিবাসনের সঙ্গে সঙ্গে দেবদেবীর চরিত্রও পাল্টেছে। এ জন্যও এ ধরনের কোন পরিবর্তন ঘটেছে কিনা বলা যায় না। এক্ষেত্রে দেবতা ও অসুরের কথা মনে আনা যেতে পারে। ঋগ্বেদের সবিতৃসূক্তে 'অসুর' প্রাণপদ-দেবতা। কিন্তু পরে 'অসুর' অর্থ হয়েছে অপদেবতা। 'অসুর সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা' একথা বলাতে এটা প্রমাণ হয় যে, ভারতীয় আর্যদের সঙ্গে ইরাণীয় আর্যদের একটা জ্ঞাতিত্ব ছিল। ইরাণের সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা হলেন অহুর মজদ। সিন্ধুর ওপারের 'H' যদি ভারতবর্ষে ভাওয়েল দ্বারা অনুসরিত হয় তবে H হয় S. এই কারণে Ahur ভারতে হয় Asur. আবার 'দেব' বেদে দীপ্তিশালী দেবতা—কিন্তু প্রাচীন ইরাণে দএব হল দৈত্য। অহুর সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা। কিন্তু ভারতে Ahur যখন Asur হয় তখন হয় দৈত্য। (তবে এই দৈত্য বা দানবের অর্থও যে খুব ছোট তা নয়। কারণ আসিরিয় দনু অর্থাৎ বীরত্বপূর্ণ, এই শব্দ থেকেই সম্ভবতঃ দানব শব্দের উৎপত্তি। ফলে দানবও যে বীর্যবান সে বিষয়ে সন্দেহ কি ?) মনে হয় একদা এই 'দেব' নিয়ে ভারতীয় ও ইরাণীদের মধ্যে প্রচণ্ড মতবিরোধ হয়েছিল। যার ফলেই শব্দের এই অর্থান্তর।

অনেকে মনে করেন পাঞ্জাবই বৈদিক পুরাণ কাহিনীর উৎস। কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। যেমন সংস্কৃতের উৎস পাঞ্জাব নয়, তেমনই পুরাণ

কাহিনীরও নয়। কিছু কিছু দেবতার উদ্ভব পাঞ্জাবে হলেও অনেকেরই হয়নি। পুরাণ কাহিনীর উৎস এক কথায় পাওয়া দুষ্কর, যেমন ভাষার জটিলতা সহজেই সমাধানযোগ্য নয়। তবে আর্যরা যদি বহিরাগত হয়ে থাকেন তবে পাঞ্জাবের পরিবর্তিত পরিবেশে তাদের প্রাচীন চিন্তার রূপান্তর ঘটাটা তেমন ব্যাপার নয়। অনেক আদি দেবতাই হয়তো তাঁদের খোলনল্‌চে পাল্টে ফেলেছিলেন ভারতে এসে।

ঋগ্বেদের বহু দেবদেবীর আবির্ভাব নতুন পরিবেশের জন্যই হয়েছে। অনেক কিছুই যা আগে ছিল ঋগ্বেদে ছিল না, যেমন সতীদাহ। আত্মার জন্মান্তর সম্পর্কিত ভাবনাও ঋগ্বেদে নেই। সর্পের উল্লেখ শুধু একবারই আছে ঋগ্বেদে। দীক্ষা ব্যাপারটা সম্পর্কেও তাঁরা অজ্ঞ ছিলেন। অপর পক্ষে বহু ব্যবহৃত, 'ঋত্‌' শব্দ প্রমাণ করে যে, 'অবেস্ত'র সঙ্গে ঋগ্বেদের সম্পর্ক বেশ নিকট। এই 'ঋত্‌' শব্দের ধ্যান-ধারণাই পরে 'ধর্ম' শব্দের মধ্যে স্থানান্তরিত হয়।

ঋগ্বেদ ও ব্রাহ্মণের মধ্যেও পার্থক্যটা কম নয়। এতে মনে হয় উভয় সাহিত্যের উৎস একই নাও হতে পারে। ঋগ্বেদে এমন বহু অনুষ্ঠানের উল্লেখ আছে যার কথা সূত্রগুলির মধ্যে খুঁজে পেতে অসুবিধাই হয়। অপর পক্ষে ব্রাহ্মণ সাহিত্যেও এমন অনেক অনুষ্ঠানের উল্লেখ আছে যার সম্পর্কে বিশেষ কোন খবরাখবর ব্রাহ্মণ সাহিত্য আমাদের দেয়নি। এ থেকে মনে হয় দুটি ভিন্ন ধরনের ঐতিহ্য পাশাপাশি ভেসে এসেছিল, পরে আরও কাছাকাছি এসেছে।

আসলে ভারতীয় জীবন বিশ্বনিখিলের ধারা ধরেই বিকাশমুখী। সেই বিকাশের যুগে ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন তো হবেই। সামান্য একটি উদাহরণেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে যাবে। ঋগ্বেদের ইন্দ্র বৌদ্ধ সাহিত্যে এসে হলেন শক্র। শেষ পর্যন্ত শক্র হলেন রাজনের সমার্থবোধক। বরুণ হলেন নাগ রাজা। অসুররা হলেন সমুদ্রনিবাসী। আবার আকাশের রাজা বরুণকে দেখা যাচ্ছে কালক্রমে সমুদ্রের শাসক হলেন। তবে কেউ যদি এই সলিলকে কারণ-সলিল বলেন এবং পরবর্তীকালে তার সূক্ষ্ম তাৎপর্য স্থূল অর্থে পরিণত হয়, তবে বলার কিছু নেই। তবে এই ভাবেই একদিন ঋগ্বেদের নৈর্ব্যক্তিক কল্পনা রূপে এবং রূপ থেকে গল্পকথায় এসে ঠেকেছে। তার উৎস কোন বিশেষ একটি চৌহদ্দির মধ্যে আবদ্ধ নয়। প্রাকৃতিক ঘটনার পরম্পরা অনেক সময় এমন হয়েছে যে, গল্পকাহিনীর উদ্ভবের তা সহায়ক হয়েছে! যেমন সূর্য ও উষা। উষার পেছনেই সূর্যের উদয় হয়। সেই জন্য উষাকে কেউ কল্পনা করেছেন সূর্যের কন্যা হিসেবে, কেউ বা প্রেমিকা হিসাবে, কেউ বা একেবারে মা হিসেবে। প্রাকৃতিক ঘটনা এই ভাবেই কবি-কল্পনাকে প্রভাবিত করে গল্প-কথার উৎস হয়েছে। কবি কল্পনাতে রাত্রিকে মনে হয়েছে গ্রহনক্ষত্রাদি শোভিতা দেবীর মত। কখনও কখনও দুটি নরগোষ্ঠীর মিলনেও ভিন্নধরনের দৃষ্টিভঙ্গীর একত্র সমাবেশের জন্য অদ্ভুত সব রূপ আত্মপ্রকাশ করেছে।

ঋগ্বেদ যে বিশেষ একটা নির্ভেজাল নরগোষ্ঠীর অবদান তা তো নয়! নানা নরগোষ্ঠীর অবদান রয়েছে এর মধ্যে। ঋগ্বেদের সূক্ত রচয়িতা ভরদ্বাজ বংশীয়দের সঙ্গে অনার্য পুরুকুৎস-এর যোগাযোগ দেখে মনে হয় এরা অনার্য সম্পর্ক বর্জিত নয়। কণ্বদের তো যজ্ঞের অধিকার থেকেই দীর্ঘদিন বঞ্চিত করে রাখা হয়েছিল। অথচ এঁরা ঋগ্বেদের বহু সূক্ত রচনা করেছেন। বশিষ্ঠ গোষ্ঠীর সঙ্গে হরাপ্পার বরশিখ গোষ্ঠীর সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়। এ ছাড়া বশিষ্ঠ গোষ্ঠীর চুল বাঁধার ধরন ছিল মিশরের খনুশু মূর্তির মাথার চুল-বাঁধার মত। ঋগ্বেদীয় ঋষি কবষ ঐলুষ ছিলেন দাসীপুত্র (দাস্যপুত্র), অগস্ত্য ও বশিষ্ঠের পিতৃ পরিচয় নেই। তাঁরা জার জাত, সুতরাং জারজ। বশিষ্ঠের মা প্রাগার্য রমণী। সুতরাৎ বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর ভাবধারা ঋগ্বেদে আসতেই পারে। সুতরাং কি ভাবে যে কার কাহিনী কোথায় ঢুকে গিয়ে রঙ বদলেছে তা সহজে অনুমান করার নয়। ফলে পুরাণ কাহিনীব নিশ্চিত একটা উৎস খুঁজে পাওয়া দুষ্কর বৈকি!

পুরাণ কাহিনীর উপরোক্ত ব্যাখ্যা বাদে এ নিয়ে দার্শনিক ভাবে **Gustav Mensching** তাঁর **Structure and Patterns of Religion** গ্রন্থে যা বলেছেন তা এই ধরনের: মানুষের জীবনে যা কিছু বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রাচীন মানুষ সর্বদাই তার মধ্যে একটা রহস্যময় যথার্থ প্রাণশক্তির অনুমান করেছেন। এই সত্য অতীন্দ্রিয়—যাকে পাবার চেষ্টাই ছিল প্রাচীন নরগোষ্ঠীর অধ্যাত্ম প্রচেষ্টা। এই যে মানসিকতা তার মধ্যে বিচার বিশ্লেষণ অপেক্ষা ভাবাবেগের প্রাধান্যই বেশী। এই কারণেই পুরাণ কাহিনীর উদ্ভব হতে পেরেছিল, কারণ তা ভাবাবেগকে প্রশ্রয় দেবার মত। প্রাচীন নরগোষ্ঠীর জীবনে এই কারণেই পুরাণ কাহিনীর প্রভাব সত্যিই বিরাট। এই কাহিনীর মধ্য দিয়েই তাদের সত্যসন্ধানী ভাবাবেগ স্বপ্নের মত জীবন্ত হয়ে উঠতে পেরেছিল। বাস্তবতার সীমা তার অসীম ব্যাপ্তিকে সীমার মধ্যে শাসন করে রাখতে পারেনি। সুতরাং 'প্রাচীন মানুষের ধর্মবোধ প্রকৃতিজাত ধর্মবোধ' একথা মনে করার কোন কারণ নেই। ধর্মের প্রতি তাদের যে মৌল ধারণা তা অনেক বেশি উন্নত সংস্কৃতির লোকের ধর্মবিশ্বাসের মধ্যেও পাওয়া যাবে। বর্তমানে যে বিশ্বের উল্লেখযোগ্য ধর্মগুলি আছে তার মধ্যেও প্রাচীন লোকবিশ্বাসের সূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে।

আধুনিক মানুষ যেমন বিষয় হিসাবে দুনিয়াকে দেখে, প্রাচীন মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী জগতের প্রতি সেরকম ছিল না। বরং বাইরের জগৎটাকে হুবহু তার নিজস্বরূপে না দেখে তাতে সে তার মানসজগতের প্রতিফলন ঘটাতো। স্বপ্নের মত বাইরের জগৎটাকে মানুষ নিজের আন্তর্ভাবনার রসে সিক্ত করে নিয়ে সেদিনও দেখত, আজও দেখে। এই মানসিকতাই পরীর গল্প জাতীয় গল্পের মধ্যে ফুটে উঠেছে, যেখানে তার বলার ঢং 'এক যে ছিল…' ইত্যাদি।

পুরাণ কাহিনীর মধ্যে বস্তুত মানুষ তার আন্তর অভিজ্ঞতা, উদ্বেগ, ইচ্ছা, সব কিছুকে ঢেলে দেয়। পুরাণ কাহিনীতে মানুষ বাস্তবের সেই রূপটিকেই

দেখে, যা সে নিজে নতুন করে সৃষ্টি করেছে। পুরাণ কাহিনীর মধ্যে দেবদেবীদের ভূমিকাই বেশি। দেবতারা সক্রিয় হয়ে ওঠেন পুরাণ কাহিনীর মধ্যে। তাঁদের কার্যকলাপের রঙ্গমঞ্চ দেশকালের সীমানা ছাড়িয়ে সম্প্রসারিত। কারো কারো মতে পুরাণ কাহিনীতে যে ভাবেই তা ব্যক্ত হোক না কেন মানুষের যথার্থ অভিজ্ঞতাই রূপ ধরে আছে। তবে এই যথার্থ অভিজ্ঞতার কাহিনীর মধ্যে একটা অতীন্দ্রিয়তার স্বাদ লেগে থাকে বলে একে অধ্যাত্মতা হিসেবে প্রতীয়মান হয়। পুরাণ কাহিনী, ইংরেজীতে যাকে বলে 'Myth', এর মধ্যে শুধু যে নৈর্ব্যক্তিক চিন্তা রয়েছে-তা নয়। মিথ বা পুরাণ কাহিনী যাঁরা তৈরি করেছেন তাঁদের কাছে তা বাস্তব। পুরাণ কাহিনী তাঁদের কাছে ঘটনা। যা ঘটেছে, তা হচ্ছে তার বর্ণনা। এই গল্পকথার অভিজ্ঞতা একদা কারো হয়েছিল। সুতরাং যে সকল পুরাণ কাহিনী আজও প্রচলিত তা হল ভাষায় যথার্থের বর্ণনা। বিশেষ করে যে ঘটনা প্রাচীনকালে ঘটেছিল বলে লোকে অনড় ভাবে বিশ্বাস করে। একদা এই কাহিনীর উপজীব্য বিষয় নিশ্চয়ই কেউ যথার্থই জেনেছিলেন, শুধু মাত্র চিন্তা করেননি। আধুনিক চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে যাঁরা মনে করেন যে, পুরাণ কাহিনী বিশ্বাস্য নয়, এ হল mythology অর্থাৎ অবিশ্বাস্য গল্প, incredible story—তাঁরা বিশ্বাসীদের বিশ্বাস ভঙ্গ করতে পারবেন না। যা রচনা করা হয় তা কি সবই বাস্তব উপাদানহীন? গল্প উপন্যাস এদের কি কোন বাস্তব ভিত্তি নেই? যদি তাদের বাস্তব ভিত্তি থাকে তবে পুরাণ কাহিনীরই বা থাকবে না কেন? সেই জন্যই তো কবিগুরু লিখেছিলেন—"যা রচিবে তাই সত্য তুমি। কবি তব মনভূমি রামের জনমস্থান অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।" পুরাণ কাহিনীর উপাদান আমাদের অভিজ্ঞতার বাইরে নয়। চিরন্তন সত্য তার মধ্যেও ফুটে আছে! ধর্ম অর্থাৎ অধ্যাত্মতা তো মৌল শক্তির মুখোমুখি হওয়া encounter with prime powers. যেহেতু আধুনিক মানুষ সেই মৌল শক্তি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, সেই কারণে পুরাণ কাহিনী আজ আর তাদের কাছে বিশ্বাস্য নয়। পুরাণ কাহিনীর মধ্যে মানুষের মৌল আস্তিত্বিক ধারা কাজ করছে।[৮] পুরাণ কাহিনী পাঠ মানে প্রাচীন ঘটনার পুনরাবৃত্তি। তাতে যে মানস চিত্রকল্প ফুটে উঠে তা যথার্থই সত্য। পুরাণ কাহিনীর মধ্যে নেমে আসে অতীন্দ্রিয় জগৎ। চরিত্র মানবসত্তা লাভ করে। তাঁরা মানুষেরই মত কাজ করেন। পুরাণ কাহিনী এই কারণেই সত্য যে, সেগুলি অতীত চরিত্রকে চলমান নায়ক-নায়িকার মত ফুটিয়ে তোলে, দৈবী সত্তা দান করে। পুরাণ কাহিনীর মধ্যে সেই জন্য রয়েছে অতীন্দ্রিয় যথার্থতা। আধুনিক মানস যদি তার নিজস্ব চিন্তা ত্যাগ না করে তাহলে পুরাণ কাহিনীর অন্তস্তলের খবর পাবে না। অতীন্দ্রিয় একটা ভীতিবোধ থেকে

৮ ···Fundamental existence—course of man.—Structure and Pattern of Religion, Gustav Menscing. p. 249.

বাইরের প্রভাবেই ধর্মের সৃষ্টি। যদি উন্নত ধর্মসমূহও বিচার করি তাহলেও দেখব যে, মনের এক ব্যাখ্যাতীত ভাব থেকেই তাদের জন্ম। সাদা, কালো, পীত যে জাতের মানুষই হোক না কেন, ব্যাপারটা সবার কাছেই সমান, সকলেরই ক্ষেত্রে উৎস একই।

পুরাণ কাহিনীর সঙ্গে জাদুবিদ্যাও মানুষের ধর্মজীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। জাদুর মূল অর্থ হল, জাদুকরের বিশেষ ক্ষমতাবলে প্রকৃতির অন্তরালে লুক্কায়িত শক্তিকে বের করে এনে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করা। তবে এই জাদুক্রিয়া যথার্থই ধর্ম কিনা তা নিয়ে ভাবনার অবসর আছে। জাদুবলে শক্তির স্বয়ংক্রিয় অবস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। কিন্তু ধর্মের লক্ষ্য দেবত্ব। কোন স্বয়ংক্রিয় অবস্থার মধ্যে এটা নেই।

একটা বড় প্রশ্ন এই যে, ধর্মের আগেই জাদুর জন্ম, না পরে? দুটো সম্ভাবনাই থাকতে পারে। কেউ মনে করেন মানুষের অনেক গভীর বিশ্বাস জাদু থেকেই জন্ম নিয়েছে। আর সেই বিশ্বাসই ধর্মের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে। আবার উল্টো রকম বিশ্বাসও আছে। যেমন, ধর্ম থেকেই জাদুর জন্ম হয়েছে এবং ধর্ম অধঃপতিত হয়ে হয়ে জাদুতে পরিণত হয়েছে। তবে মনে রাখতে হবে যে, জাদুরও দুটো দিক আছে—ধর্মীয় জাদু এবং বাস্তব জাদু। তবে প্রাচীন কালে ধর্ম ও জাদু এতই নিকট সম্পর্কে যুক্ত ছিল যে, জাদুবৃত্তি থেকেই ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি জন্ম নিয়েছিল। ফলে সকল জাদুক্রিয়াই ধর্ম হিসেবে পরিগণিত হত। তবে মনে হয় জাদু বা ম্যাজিক হল অতীন্দ্রিয় যে অভিজ্ঞতা তাকে গাণিতিক পদ্ধতিতে কাজে লাগাবার একটা পথ মাত্র। প্রাকৃত জগতে কার্যকারণের যে নিয়ম আছে তা থেকে এ আলাদা। মানুষের নিজস্ব ইচ্ছাপূরণের দিকটাই জাদুর মধ্যে বড়। তবে এই মানুষ কোন ব্যক্তিমানুষ নয়, সকল মানুষ। তবে যখনই এই জাদু প্রাকৃত ইচ্ছাপূরণের সহায় হয় তখন ধর্মের সঙ্গে যাকে বলে অধ্যাত্মতা, তার সঙ্গে এর কোন যোগ থাকে না। একটা রহস্যময় শক্তিকে করায়ত্ত করাই এর মূল লক্ষ্য। ধর্মের লক্ষ্য যদি হয় ব্যক্তির কোন ইচ্ছাপূরণ তাহলে জাদুর সঙ্গে ধর্মের বা অধ্যাত্মতার একটা যোগ আছে বলেই ধরে নিতে হবে। কিন্তু অধ্যাত্মতা এমনই এক জিনিস যার লক্ষ্য চিরন্তনকে জানা—সীমিত আত্মা থেকে অবিচ্ছিন্ন আত্মার সঙ্গে যোগ। যে-কারণে এর নাম অধি+(ছাড়িয়ে, beyond) আত্ম (সীমিত আত্মসত্তা)=অধ্যাত্মতা। এখানে সত্যের সঙ্গে একাত্ম হওয়াই লক্ষ্য, সীমিত কোন ইচ্ছাপূরণ নয়। সেই অর্থে জাদুর সঙ্গে একটা পার্থক্য আছে বটেই। পার্থিব জাদু হল কতগুলি কুসংস্কারের সঙ্গে যুক্ত। যেমন—দুপুর রাতে ঘোড়ার পায়ের নাল পিটিয়ে আংটী তৈরি করা, বা গাড়ির আগে জুতো জাতীয়, বা পুতুল জাতীয় কোন জিনিস রাখা। ব্যাপারটা তাবিজ কবজ পর্যায়ের। প্রাকৃত কার্যকারণ পদ্ধতির উপর এর মধ্যে একটা স্বয়ংক্রিয় ভাব আছে। কতকগুলি ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতাও এই কারণে জাদুর মধ্যে পড়ে।

জাদুর উপাদান কি? এ হল একধরনের বশীকরণ ব্যাপার। ধর্মের মধ্যে বহু আনুষ্ঠানিকতাতেই এই ধরনের জাদুক্রিয়া আছে যা অতীন্দ্রিয় সত্যকে বশীভূত করতে চায়। এই যে জাদু সত্য তা যেমন প্রাণশক্তিসম্পন্ন তেমনই নৈর্ব্যক্তিক। জাদুতে মনে করা হয় যে, অতীন্দ্রিয় শক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করে তাকে টেনে আনা সম্ভব। যেমন বালবের মধ্যে বৈদ্যুতিক শক্তিকে ধরে আলো জ্বালানো সম্ভব, অনেকে নামের মধ্যেও এই ক্ষমতা লুকিয়ে আছে বলে বিশ্বাস করে। কতকগুলি শব্দের মধ্যেও এই শক্তি ধরে রাখার ক্ষমতা আছে বলেও বিশ্বাস। টেলিপ্যাথিতে যেমন কোন ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করা যায় জাদুবিদেরা বা ডাইনীরা মনে করে যে, জাদুবলেও তেমনই করা সম্ভব। কতকগুলি অনুষ্ঠান বা ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অতীন্দ্রিয় সেই রহস্যময় শক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। এই জন্যই অনেকে মনে করেন যে, জাদুবিদই হল আদি ধর্মবিশ্বাসের যাজক স্বরূপ। একদিকে তার বাস এই কার্য-কারণে আবদ্ধ বাস্তব জগতে, অপর দিকে অতীন্দ্রিয় সত্তাতে। ধর্মে জাদুর প্রভাব বোধ হয় বজ্রযান বৌদ্ধধর্মের ক্ষেত্রে তিব্বতের লামাবাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রবল। বজ্রযানীদের অনুষ্ঠান-রীতি, বিশেষ শব্দ ও ক্রিয়ার মধ্যে একটা রহস্যময় ব্যাপার আছে। অতীন্দ্রিয় দর্শনের সঙ্গেও যে এর যোগ নেই তা নয়। যে সত্যের প্রকাশ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, সেই সত্যের সঙ্গে যোগসাধান করে ইচ্ছাপূরণই এর লক্ষ্য। এর নামও সেই জন্যই বজ্রযান। বজ্র অর্থ এখানে বাজ নয়, হীরক। হীরক শব্দটিও বস্তুগত অর্থে ব্যবহার করা হয়নি ভাবগত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। হীরক হল এমনই একটি জিনিস যা দিয়ে সব কিছু ছেদন করা যায় অথচ যাকে ছেদন করা সম্ভব নয়। এই হীরক আসলে মহাশূন্যতা। মূলতঃ মহাশূন্যতা থেকেই সবকিছু এসেছে। একথা বিজ্ঞানও স্বীকার করেছে। আধুনিক বিজ্ঞানে একে singularity বলা হয়েছে,— যেখানে দেশ নেই, কাল নেই, আপেক্ষিকতা নেই। তাইতো পদার্থবিদেরা বর্তমানে বলছেন যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমগ্র শক্তি একত্রে একটি 'শূন্য' মাত্র[৯]। তবু এর মধ্যে একটা অবিচ্ছিন্ন সূত্র নিশ্চয়ই আছে—যাকে এঁরা বলছেন supestring. এই সূত্রের মধ্যে রয়েছে বহুমাত্রিক অবস্থা। সাংখ্যে এই মাত্রাকে বলা হয়েছে তত্ত্ব—২৫ তত্ত্ব। অধুনা বিজ্ঞান বলছে ২৬ মাত্রা।[১০] মাত্রার সংখ্যা দিয়ে হিসেব করা হয়েছে বলেই সংখ্যার এই দর্শনকে ভারতে সাংখ্য বলা হয়। এই শূন্যতার সঙ্গে অর্থাৎ বহু মাত্রার সঙ্গে যাঁরা সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন তাঁরাই অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার অধিকারী হন। সেই

…The total energy of the universe is exactly zero—A Brief History of Time—Stephen W. Hawling P. 136.

The string model seemed to have better mathematical structure in twenty six dimensions.—Beyond Einstein, Dr. M. Kaku and J. Trainer P. 100.

জন্যই বজ্রযানীদের সাধনা, শূন্যের সাধনা। তার মধ্যে বিশেষ যে পদ্ধতি তাঁরা আবিষ্কার করে অনুষ্ঠান ক্রিয়া করেন তা বিজ্ঞানেরই সাংকেতিক ভাষার মত। বস্তুতঃ বিজ্ঞানীরাও বিশ্ব থেকে সংকেত সংগ্রহ করেন। বিজ্ঞানীরা বলেন, বিশ্ব কি ? বিশ্বজগৎ হল এক ধরনের সাংকেতিক বক্তব্য, মহাবৈশ্বিক আইন। বিজ্ঞানীদের কাজ এই সাংকেতিক ভাষার অর্থ উদ্ধার করা।[১১] সুতরাং বজ্রযানীদের আপাত জাদুকরি অনুষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে সত্যকে ধরবার একটা চেষ্টা। এই জন্য এধরনের জাদু অধ্যাত্ম জাদু বা magisc religion. সুতরাং জাদু যে সম্পূর্ণভাবেই ধর্মবিবর্জিত তা নয়। জাদুর মধ্যেও ধর্ম আছে ধর্মের মধ্যেও জাদু রয়েছে। জাদুর মধ্যে অদ্ভুত এক কেন্দ্রিভূত মানসশক্তির ব্যাপার রয়েছে। এ সবের আরো বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে এই কারণে যে, অধ্যাত্মতার নৈর্ব্যক্তিক দিকটা সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না। তাকে ধরা ছোঁয়ার মধ্যে আনুষ্ঠানিকতার সাহায্যে ধরে দিলে তবে তারা আকৃষ্ট হয়। তাদের মনের বিশেষ বিশ্বাসই তখন অদ্ভুত একটা শক্তি সঞ্চার করে। সেই জন্য জাদুক্রিয়ার মধ্যেও যে একটা অতীন্দ্রিয় শক্তির ব্যাপার আছে তা সহজে অস্বীকার করবার মত নয়। জাদুক্রিয়াতে যে দেবদেবীর চিন্তা করা হয় তাঁরা আসলে এই অতীন্দ্রিয় শক্তির প্রকাশক। এই শক্তির সঙ্গে প্রাচীন মানুষের যোগাযোগ ছিল। যদিও সাধারণ জাদু ও ধর্মীয় জাদুর মধ্যে বাইরের প্রয়োগ-পদ্ধতির মধ্যে অনেকটাই মিলে আছে, তবু মূলে তারা ভিন্ন। সাধারণ তুকতাক জাতীয় জাদুতে অনুষ্ঠান ক্রিয়ায় ভুল না হলে তা কার্যসিদ্ধ করে বলে দৃঢ় বিশ্বাস। এখানে এ ধরনের ক্রিয়া যাঁরা করেন তাঁদের ধর্মবোধ থাকা যে একান্তই বাঞ্ছনীয় তা নয়। এ ধরনের তুক্‌তাক্‌ বা জাদুক্রিয়া হয় ধর্ম-চৌহদ্দির বাইরে। এখানে যান্ত্রিকভাবে দুষ্টশক্তি বিতাড়ন বা শুভশক্তিকে অনুকূলে আনার জন্য কাজ হয়। তবে এখানে এমন কতকগুলি অর্থহীন শব্দ উচ্চারণ করা হয় যার কোন আপাত অর্থ নেই। এতেই ফল পাওয়া যায় বলে বিশ্বাস। ভারতীয়দের কাছে প্রত্যেকটি বর্ণের আলাদা আলাদা স্পন্দন আছে। এই স্পন্দন শক্তির প্রতিনিধি নির্দিষ্ট দেবতারও কল্পনা করা আছে। এই প্রসঙ্গে ভারতীয় তন্ত্রের কামধেনুতন্ত্র পঠিতব্য।

তবে জাদুক্রিয়া যে শুধু গোষ্ঠীধর্ম বা উপজাতীয় ধর্মের মধ্যে রয়েছে তা নয়। বিশ্বধর্মের মধ্যেও এর চরিত্র লক্ষ্য করার মত। খ্রীষ্টীয় ধর্মানুষ্ঠান যাকে বলে স্যাক্রামেণ্ট, তার মধ্যেও জাদুচরিত্র লক্ষ্য করা যায়। তবে এই ক্রিয়া যাঁরা করেন তাঁদের যে এই ধরনের ক্ষমতা ঈশ্বর দিয়েছেন তা নয়। এটা বিশ্বাসের ব্যাপার। বিশ্বাস নিয়ে যাঁরা গীর্জায় প্রার্থনা করেন তাঁদের

১১ What is the universe ? His answer "a message written in code, a cosmic code, and the scientist's job is to decipher that code."—Masters of Time, John Boslough P. 215.

বিশ্বাস এবং যাঁরা এই ক্রিয়ার ফল পেতে চান তাঁদের আত্মিক চরিত্রের উপরই এর সাফল্য নির্ভর করে। এতে মনে হয় প্রাচীন মানুষের জাদুপ্রভাব প্রচ্ছন্নভাবে আজও তাঁদের মধ্যে ক্রিয়মান। গীর্জা যে তাবিজ কবচ দেয় তার মধ্যেও প্রাচীন মানুষের সেই জাদুক্রিয়াই বিদ্যমান। যাঁরা এটা ব্যবহার করেন, তাঁরা যেরকম ভাবেন ব্যাপারটা তাই। যদি তাঁরা একে ধর্মীয় মনে ভাবেন তবে নিশ্চয়ই তা ধর্মীয় ব্যাপার রূপেই প্রতিষ্ঠিত হয়। জাদুর কারণ নির্ভর করে মানুষের আন্তরসংগঠনের উপর। প্রাচীন মানুষের মানসশৈলীই ছিল জাদুক্রিয়াপ্রবণ। তবে আধুনিক মানুষও এর প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে এই জাদুক্রিয়ার একটা ভূমিকা রয়েই গেছে। যাঁরা সমালোচক, তাঁরা একে ধর্ম না বলে বলেন—'জনপ্রিয় বিশ্বাস'। ধর্মগুরুদের নির্দেশ এ ধরনের বিশ্বাসের পরিপন্থি হলেও জনচিত্ত থেকে একে একেবারে নির্মূল করা সম্ভব হয়নি। কোন ধর্মেই নয়।

সমালোচকরা মনে করেন এই জাদু-বিশ্বাস থেকেই জড় ও প্রাকৃত সর্ববিষয়ে প্রাণের আরোপ করে সর্বপ্রাণবাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। সর্বপ্রাণবাদের মূল সূত্র রয়েছে পুরাণ কাহিনীতে। সর্বপ্রাণবাদ, পিশাচ-ক্ষমতায় বিশ্বাস, দিব্যক্ষমতাসম্পন্ন বস্তুতে বিশ্বাস ইত্যাদি থেকেই এসেছে ঈশ্বরে বিশ্বাস। যখন এই সব কিছু থেকে, জাদু থেকে মানুষের বিশ্বাস মুক্ত হতে পারে তখনই যথার্থ ধর্ম বলতে যা বোঝায় তাই আত্মপ্রকাশ করে। তবে বর্তমানে বিজ্ঞান কিন্তু একটা জিনিস প্রমাণ করেছে যে, সর্বপ্রাণবাদ মিথ্যে নয়; জড় এবং প্রাকৃত সবকিছুর মধ্যেই শুধু প্রাণ নয় চিৎসত্তাও রয়েছে। একথা যদি বৈজ্ঞানিক প্রমাণসহ পাঠক জানতে চান তাহলে Peter Tomkins ও Christopher Bird-এর 'The Secret Life of Plants' পড়ে দেখতে পারেন। সেখানে আচার্য জগদীশ বসুর তত্ত্ব ধরেই পদার্থ ও উদ্ভিদাদির প্রাণ ও চিৎসত্তার কথা প্রমাণ করা হয়েছে। এদের স্মৃতি ভাণ্ডার পর্যন্ত আছে যাকে বলে Memory Bank. সুতরাং সবকিছুকেই যে একেবারে জাদু ও কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দেওয়া যাবে তা নয়। অধ্যাত্মতা এ-সবকে ছাড়িয়ে আরো ঊর্ধ্বে উঠে গেলেও এদের এড়িয়ে যেতে পারেনি, এবং তা সম্ভবও নয়। সুতরাং এমন যদি বলা হয় যে-ধর্মের আরম্ভ এমন কিছু থেকে যা মূলতঃ ধর্ম নয়, তা ঠিক হবে না। বরং বলা উচিত ধর্ম নিজে থেকেই আরম্ভ হয়েছিল। ধর্ম সর্বত্র, প্রাচীন মানুষের জগতেও ছিল। মানুষের গঠনশৈলীর মধ্যেই সেই অতীন্দ্রিয়কে ধরবার একটি ব্যবস্থা আছে। সেই জন্য কোন কালেই সে এটাকে এড়াতে পারেনি। এই গঠনশৈলীই ধর্মকে মরমিয়া করে তুলেছে। কারণ ধর্মের মধ্যে অনুভব না করলে ধর্মের সর্বাত্মক চরিত্র বোঝা যায় না।

আধুনিক কালে এই জাদু বা ডাইনীবিদ্যা নিয়ে যাঁরা চর্চা করেছেন তাঁদের মধ্যে সোভিয়েৎ রাশিয়ার জিমা বিশেষ ভাবে বিখ্যাত। জাদুশক্তির উৎস তাঁর মতে একটি হাসি মুখ দেবতা। তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী। তাঁর মাধ্যমেই জিমা সকল বিষয়ে খবরাখবর জানতে পারেন।

জিমার মতে মানুষ চতুর্দিকেই দেবতা পরিবৃত। তাঁরা দেখতে খুবই সুন্দর। হাওয়ায় ভেসে বেড়ায়। এই দেবতাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে কেউ ব্যবহার করেন স্ফটিক গোলক, কেউ বা স্বচ্ছ মন। জিমা নিজে জলের ভেতর ভবিষ্যতের প্রতিবিম্ব দেখতে পান। নস্ত্রাদামু যেমন দেখতে পেতেন কটাহের মধ্যে। ছবিগুলি স্থির দাঁড়িয়ে থাকে। তাদের গতিশীল করার বিদ্যা অবশ্য তিনি জানতে পারেননি। জিমার ভবিষ্যৎ দর্শন হয় কখনও যথাযথ চিত্রের মধ্য দিয়ে, কখনও বা প্রতীকের মাধ্যমে। আজ সোভিয়েৎ ইউনিয়নের যে অবস্থা হয়েছে জিমা বিশ বছর আগেই তা ভবিষ্যৎবাণী করে বলেছিলেন।

মধ্য এশিয়ার শমনেরা বিশেষ এক ধরনের আত্মিক ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন। যে পদ্ধতিতে তাঁরা ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন তাকে অনেকটা জাদুক্ষমতাই বলা যেতে পারে। তবে এর পদ্ধতিটা ছিল এক ধরনের উন্মাদ নৃত্য। আমাদের দেশে একেই বলা হয় বায়াল। এরা এই সাধনা দ্বারা তাৎক্ষণিক ভাববিনিময় ক্ষমতা, দিব্যদৃষ্টি, আকাশভ্রমণ প্রভৃতি অর্জন করেছিলেন। তবে তাঁদের বক্তব্য ছিল এই যে, দুষ্ট ব্যক্তিরা এই ক্ষমতা অর্জন করতে পারে না। আত্মার জগতে প্রবেশের ক্ষেত্রে এই উন্মাদ নৃত্য এঁদের প্রচুর ভাবে সাহায্য করত। নাচতে নাচতে এক সময় তাঁরা উন্মাদ হয়ে যেতেন। উন্মাদ হয়ে ভাবের ঘোরে পড়তেন। তক্ষুণি তাঁদের সূক্ষ্মদেহ আকাশে উড়ে যাবার সুযোগ পেত। এই ধরনের উন্মাদ নৃত্য রাসপুটিনও করতেন। তাঁর মধ্যে শমনদের ধারা ও খ্রীষ্টীয় মরমিয়া ধারা একত্রে যুক্ত হয়েছিল। এই জাদুক্ষমতা বলেই মানুষের সূক্ষ্ম সত্তা বাইরে গিয়ে নিজের স্থূলসত্তার ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করতে পারে। বিখ্যাত গায়ক সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় একসময় এই যৌগিক পদ্ধতি অনুসরণ করে স্থূলদেহ থেকে সূক্ষ্ম সত্তাকে বিচ্ছিন্ন করে নিজেকে অবলোকন করতে পারতেন। তিনি নিজে বর্তমান গ্রন্থের লেখককে তাঁর অভিজ্ঞতার কাহিনী বর্ণনা করে শুনিয়েছেন। যোগ অভ্যাস করেন এমন বহু ব্যক্তির কাছেই আমি অনুরূপ অভিজ্ঞতার কাহিনী শুনেছি। শ্রীমতী মণিকা ভট্টাচার্য (ইন্দ্রলোক হাউসিং এস্টেট) আমার কাছে যোগ শিখে তাঁর এই ধরনের অভিজ্ঞতার কাহিনী বলেছেন। নিজেকে এই ভাবে বাইরে থেকে দেখাকেই বলে ectstasy—চরমানন্দ। সোভিয়েৎ রাশিয়ার Nijinsky এই বিদ্যা জানতেন। তাঁর বায়াল-নৃত্যের ছন্দ তিনি উপভোগ করতে পারেন না সাংবাদিকদের এই ধরনের প্রশ্নে তিনি বলেছিলেন—'আমার স্থূলদেহটাকে তো আমিই বাইরে থেকে নাচাই।'[১২] নিজিনস্কি ভারতীয় যোগ অভ্যাস করতেন। তিনি ভারতীয় যোগীদের ভূমিত্যাগ তত্ত্বে বিশ্বাস করতেন। কুলকুণ্ডলিনী অনাহত চক্রে অধিষ্ঠিত হলেই এই শক্তি অর্জন করা যায় বলে তাঁর বিশ্বাস ছিল।

---

১২ 'I make myself dance from outside.' Nijinsky—Psychic Discoveries Behind the Iron Curtain.—Sheila Ostrander and Lynn Sehroeder. p. 250.

ডাইনীবিদ্যা হল সাধারণ বিশ্বাসে কালোজাদু বা black magic. Dr. Gardener ১৯৫৪ সালে 'Witchcraft Today' বলে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এর ভূমিকায় Dr. Margaret Murry বলেন যে, 'ডাইনীবিদ্যা বলতে লোকে যাকে বলে, তা প্রাচীন অনুষ্ঠানেরই একটি অবক্ষয় মাত্র।…… ডাইনীবিদ্যা আসলে প্রাচীন ডায়ানিক বিদ্যা (Dianic cult), প্রাচীন পৌত্তলিকদের একধরনের রীতি। খ্রীষ্টধর্মেরও পূর্বে এর জন্ম। উর্বরা শক্তিপূজার রীতি থেকেই এই প্রথার জন্ম। এই উর্বরা শক্তি (মাতা) সকল দেবদেবী অপেক্ষা প্রাচীন। এ ছাড়া রয়েছে শৃঙ্গযুক্ত দেবদেবী। শৃঙ্গ হল প্রাচীনদের কাছে দিব্যশক্তির প্রতীক। গার্ডেনারের মতে ব্রিটেনের প্রথম অধিবাসীদের ধর্মই ছিল এই ডাইনীবিদ্যা। ব্রিটেনের এই আদিবাসী ব্রিটনরা ছিল খর্বকায়। তারা অদ্ভুত রহস্যময় শক্তির সাধনা করত নিশীথ রাত্রিতে। বস্তুত witch-craft বলা হলেও এটা যে খারাপ কিছু ছিল তা নয়। অ্যাংলো-স্যাকসন-wicca শব্দ থেকে witch শব্দের উদ্ভব। Wicca অর্থ 'the wise one' অর্থাৎ জ্ঞানী। ভারতবর্ষেও ডাইনী অর্থ জ্ঞানী। ডাক (জ্ঞান) এই শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ হল ডাকিনী। অর্থাৎ জ্ঞানী মহিলা। ডাকিনী থেকেই ডাইনী শব্দের উদ্ভব। শেষ পর্যন্ত এই ডাইনীবিদ্যা অধঃপতিত হয়ে কালোজাদু বা black magic-এ পরিণত হয়। কিন্তু এই black magic বা ডাইনীবিদ্যাতেও উৎস হিসেবে কাজ করে মানুষের আত্মশক্তি। আত্মশক্তি প্রয়োগ করেই এটা করা হয়। এই বিদ্যা একসময় ভারতীয় তন্ত্রসাধনার 'ম' কারের মত তার আদি অধ্যাত্ম গুরুত্ব হারিয়ে নিন্দনীয় যৌন সাধনাতে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। আর ডাইনী বলতে লোকে এতই ভীত হয়ে পড়েছিল যে, ডাইনীবিদ্যাকে ক্ষতিকর বিদ্যা ছাড়া আর অন্য কিছু বলে ভাবতে পারত না। ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ ইউরোপে এই ডাইনীবিদ্যা তুকতাকের সম-পর্যায়ে নেমে এসেছিল। সারা ইউরোপ ডাইনীদের ভয়ে স্তব্ধ হয়ে থাকতো। শেক্সপীয়রের মত নাট্যকারও ডাইনীবিদ্যার প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেননি। 'ম্যাকবেথ'-এ ভাগ্যবিধাতার ভূমিকায় তো ডাইনীরাই নেমেছিল। ফলে ডাইনীবিদ্যা দমনের জন্য খ্রীষ্টান ইউরোপে নিগ্রহও কম হয়নি। হাজার হাজার নরনারীকে ডাইনী সন্দেহে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। সপ্তদশ শতকের শেষের দিকে শেষপর্যন্ত এই ডাইনীভীতি যায়।

কিন্তু প্রাচীন মানুষের কাছে জাদুবিদ্যা black magic ছিল না। জাদুর মধ্য দিয়ে তারা অতীন্দ্রিয় শক্তিকেই বশ করার বা খুশি করার চেষ্টা করত। ফলে অধ্যাত্মতা থেকে জাদুকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করা যায় না।

ধর্ম বলতে সাধারণ মানুষ যা বোঝে তা কিন্তু যথার্থ ধর্ম নয়। তাকে ভারতীয় ভাষায় বলা হয়েছে অধ্যাত্মতা। জীবাত্মার ঊর্ধ্বে অবিচ্ছিন্ন এক চিৎসত্তারূপী আত্মার সন্ধানই এর লক্ষ্য। যে অবিচ্ছিন্ন চিৎসত্তা থেকে জগতের উৎপত্তি অধ্যাত্মতার মূল লক্ষ্য সেই অবিচ্ছিন্ন সত্তা। একে অস্তিত্ব বলা যাবে না এই কারণে যে, অস্তিত্ব অর্থ কোন কিছু থেকে এসে রূপ ধারণ

করা—ইংরেজীতে যাকে বলে existence। আস্তিক্যবাদী (existentialist)রা একে উচ্চারণ করেন ex-sistence হিসেবে। সুতরাং সর্বকিছুর বাইরে সেই চিরন্তন 'অস্তি'কে অস্তিত্ব বলা যায় না যা চিরকাল আছে। সেই এক অবস্থাই হল অধি = beyond, beyond every tangible. অধ্যাত্মতা এই beyond tangible-এ যাবার জন্য। ইংরেজীতে Religion-এর লক্ষ্যও তাই। এর উৎস হল ল্যাটিন শব্দ Relegare = to tie back অর্থাৎ যেখান থেকে আসা হয়েছে ফিরে সেখানে যাওয়া। সুতরাং Religion-এর বাংলা ধর্ম নয় অধ্যাত্মতা। ধর্ম অর্থ ধৃ-ধাতু থেকে ধারণ করা। যে সকল রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক আইন মানব সমাজকে ধারণ করে রাখে তাই ধর্ম। ধর্ম অধ্যাত্মতা নয়। সাধারণ ধর্মের অর্থ যখন যথার্থ অর্থে অধ্যাত্মতা, তখন সেই কারণেই তাকে জাদু থেকেও বিচ্ছিন্ন করা যায় না। ফলে ঋগ্বেদের দেবদেবীর চরিত্র যদি বুঝতে হয়, একে পুরাণ কাহিনী বা Myth ও জাদু বা Magic থেকে বিচ্ছিন্ন করে আলোচনা করলে চলবে না।

বৈদিক ধর্মের (অধ্যাত্মতা) চরিত্র আলোচনা করতে গিয়ে ধর্মের অঙ্গ হিসেবে পুরাণ কাহিনী ও জাদুবিদ্যার ভূমিকার কথা আলোচনা করা হল। এবার আবার মূল আলোচনায় ফিরে আসা যাক।

দেখেছি 'ধর্ম' শব্দটি অধ্যাত্মতা, পুরাণ কাহিনী ও জাদুবিদ্যার সঙ্গে একাত্মভাবে জড়িয়ে আছে। এর পটভূমিতে ধর্মের অর্থ দাঁড়ায় দৈব ও অতি-প্রাকৃত শক্তি সম্পর্কে এমন কতকগুলি বিশ্বাস যাতে বহু প্রার্থনা, অনুষ্ঠান ও যাগযজ্ঞাদি সহকারে অতীন্দ্রিয় সেই শক্তির উপরে নির্ভর করতে শেখানো হয়েছে। পুরাণ কাহিনীর মধ্যে রয়েছে দেবদেবী, প্রাচীন মহাপুরুষ প্রভৃতির উৎপত্তি, পরিবেশ ও কার্যকলাপের কাহিনী। সেই জন্য পুরাণ কাহিনী ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়ে বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে আসছে। ম্যাজিক বা জাদু অর্থও অতীন্দ্রিয় শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা। মানুষের ভুলে তা অধঃপতিত হয়েছে। নইলে আদিতে অতীন্দ্রিয়ের সম্পর্কই ছিল তার কাম্য। এই স্পর্শ লাভের জন্য সে কতকগুলি আনুষ্ঠানিকতার সৃষ্টি করেছে। মূলত তার চেষ্টা হয়েছে অদৃশ্য ক্ষতিকর শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করা যাতে মানুষ সুস্থজীবন যাপন করতে পারে। অনুষ্ঠানের দ্বারা প্রাচীন মানুষ ঘটনাপ্রবাহের গতি নিজেদের আয়ত্তে আনার চেষ্টা করেছে। ফলে পরে অধঃপতিত হলেও আদি বিশ্বাসে সে অনেক অংশেই অধ্যাত্মতার সঙ্গে যুক্ত ছিল। তবে ঋগ্বেদে জাদুক্রিয়ার প্রভাব ততটা লক্ষ্য করা যায় না যতটা এটা প্রকট হয়ে ফুটে উঠেছে অথর্ববেদের ক্ষেত্রে। তবে সামগ্রিকভাবে বৈদিক ধর্মে জাদুর ব্যাপার আছেই।

সংহিতা পর্বের যে চারিটি বেদ আছে তাতে যে দেবদেবীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তাঁরা মূলতঃ প্রকৃতির বিভিন্ন দিকের ব্যক্তিরূপ মাত্র। অপশক্তিকে শান্ত করার প্রচেষ্টা এখানে কমই আছে। ঋগ্বেদ হল সংহিতা পর্বে মূল সূত্র। অন্যান্য সংহিতাতে ঋগ্বেদ থেকেই বিপুল পরিমাণে নেওয়া হয়েছে।

আর এই ঋগ্বৈদিক সূক্তগুলির মধ্যেই পুরাণ কাহিনীর উপাদান প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। এই সব দেবদেবীকে সোমরস ও যজ্ঞে ঘৃতাহুতি দিয়ে আহ্বান করার ব্যাপার আছে।

বৈদিক সাহিত্যে এবং ঋগ্বেদে বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কে সর্বকালীন মানসিকতার উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদে জগৎ সৃষ্টির ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে কিছুটা যান্ত্রিক ভাবে। যেমন ঘরবাড়ি তৈরি হয়, তেমনই যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তৈরি হয়েছে। যাঁরা এটা তৈরি করেছেন হয় তাঁদের মধ্যে রয়েছে সমবেত দেববৃন্দ নয়তো নানা স্বতন্ত্র দেবতা। ঋগ্বেদের শেষ মণ্ডলে বিশ্বসৃষ্টির উপর কয়েকটি সূক্ত আছে। এর মধ্যে দশম মণ্ডলের ৯০তম সূক্তে যে বিশ্বাস ব্যক্ত হয়েছে তা অত্যন্তই প্রাচীন বিশ্বাস। বিশ্বাস এই যে, আদি এক বিরাট দৈত্যের দেহ থেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উদয়। দেবতারা এই দৈত্যের দেহকে বলি দিয়েছিলেন বা জগৎ সৃষ্টির জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর মস্তিষ্ক থেকে হল আকাশ, নাভিদেশ থেকে বায়ুমণ্ডলী এবং চরণদ্বয় থেকে স্থূল পৃথিবী। দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে এল আর্যদের চতুর্বর্ণ। এই যে বিরাট জীব তাকে বলা হয়েছে পুরুষ। সুতরাং পুরুষ সূক্তেই এই জগৎসৃষ্টির প্রাচীনতম বর্ণনা পাওয়া যায়। অথর্ববেদ ও উপনিষদে পরে কিন্তু এই পুরুষই বিশ্বাত্মা হিসাবে স্বীকৃত। সূক্তটি এই ধরনের ঃ—

'সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্ ॥১
পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্য।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি ॥২
এতাবানস্য মহিমাতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ॥৩
ত্রিপাদূর্ধ্ব উদৈৎ পুরুষঃ পাদোঽস্যেহাভবৎ পুনঃ।
ততো বিষ্বঙ্ ব্যক্রামৎ সাশনানশনে অভি ॥৪
তস্মাদ্বিরাড়জায়ত বিরাজো অধি পুরুষঃ।
স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ভূমিমথো পুরঃ ॥৫
যৎপুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বত।
বসন্তো অস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধ্মঃ শরদ্ধবিঃ ॥৬
তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন্ পুরুষং জাতমগ্রতঃ।
তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে ॥৭
তস্মাদ্যজ্ঞাৎ সর্বহুতঃ সম্ভৃতং পৃষদাজ্যম।
পশূন্তাংশ্চক্রে বায়ব্যানারাণ্যান্ গ্রাম্যাশ্চ যে ॥৮
তস্মাদ্যজ্ঞাৎ সর্বহুতঃ ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্যজুস্তস্মাদ জায়ত ॥৯
তস্মাদশ্বা অজায়ন্ত যে কে চোভয়াদতঃ।
গাবোহ জজ্ঞিরে তস্মাত্তস্মাজ্জাতা অজাবয়ঃ ॥১০

যৎপুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্ ।
মুখং কিমস্য কৌ বাহূ কা ঊরূ পাদা উচ্যেতে ।।১১
ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ ।
ঊরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত ।।১২
চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্যো অজায়ত ।
মুখাদিন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাদ্বায়ুরজায়ত ।।১৩
নাভ্যা আসীদন্তরিক্ষং শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্তত ।
পদ্ভ্যাং ভূমির্দিশঃ শ্রোত্রাওথা লোকী অকল্পয়ন্ ।।১৪
সপ্তাস্যাসন্ পরিধিয়স্ত্রিঃ সপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ ।
দেবা যদ্যজ্ঞং তন্বানা অবধ্নন্ পুরুষং পশুম্ ।।১৫
যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাস্তানি ধর্মাণি প্রথমান্যাসন্ ।
তেহ নাকং মহিমানঃ সচন্ত যত্র পূর্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ ।।১৬

অর্থাৎ—(১) পুরুষের সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু ও সহস্র চরণ। তিনি পৃথিবীকে সর্বব্যাপ্ত করে দশঅঙ্গুলি পরিমাণ অতিরিক্ত হয়ে অবস্থিত থাকেন। [বাক্যটির মধ্যে রূপ আরোপ করা হলেও সূক্ষ্ম একটা ইঙ্গিত বেশ স্পষ্ট। বিশেষতঃ 'দশ অঙ্গুলি পরিমাণ' কথাটির উল্লেখ বিশেষভাবে ভাববার মত। এই দশ অঙ্গুলি আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের দশ মাত্রা কিনা তা ভাববার মত। দশমাত্রার একত্র সমাবেশ ঘটলে যে অবস্থা সৃষ্টি হয় তার নাম false vacuum. এই false vacuum বা শূন্য থেকেই জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। বিজ্ঞান একথা স্বীকাব করেছে যে জগতের সকল তেজ উদ্ভবের পূর্বমুহূর্তে ছিল শূন্যতার পর্যায়ে।[১৩] এই দশ অঙ্গুলি পরিমাণ অবস্থা অস্থির অবস্থা। এ থেকে বিস্ফোরণ ঘটে জগতের সৃষ্টি। জগতের সকল কিছুর উৎস ছিল এই শূন্য পর্যায়ের মধ্যেই। এই জন্যই বলা হয়েছে পুরুষ ছিল সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু ও সহস্র চরণ। অর্থাৎ অসংখ্য কিছুর উৎস। পুরুষের যজ্ঞ হল Big Bang, যা থেকে অধুনা মনে হয় জগতের সৃষ্টি হয়েছিল।]

(২) যা হয়েছে বা হবে সকলই সেই পুরুষ। তিনি অমরত্বলাভে অধিকারী হন, কেন না তিনি অন্ন দ্বারা অতিরোহন করেন। [এই বাক্য-দুটির মধ্যেও সুদূরপ্রসারি ইঙ্গিত রয়েছে। কারণ জগতের ভবিষ্যৎ রূপ কি

১৩ ……The Superstring theory predicts that our universe started as a ten dimensional universe, which was ultimately unstable and collapsed violently down to four dimensions. This cataclysmic event, in turn, created the original Big Bang. However, if the "every thing from nothing" theory proves to be correct, this means that perhaps the ten dimensional universe started out with zero energy.—Beyond Einstein, Dr. Michio Kaku and Jennifer Trainer. p, 191.

হবে সেই আদি অবস্থার মধ্যেই নিহিত আছে। Big Bang-এর তরঙ্গে তরঙ্গে জগৎ ক্রমবর্ধমান। যা হয়েছে বা ভবিষ্যতে গতির তারতম্যে হবে তাও এই Big Bang-এর চরিত্রের মধ্যে নিহিত আছে। ভবিষ্যতে জগৎ যে ভিন্ন আকৃতি গ্রহণ করবে না তা বলা যায় না। দেশ (space) ও কাল (time) থেকেই সব কিছুর সৃষ্টি। দেশ ও কালের উপর সৃষ্টির চরিত্র নির্ভর করে। কালের চরিত্র তার গতির উপর নির্ভরশীল। যদি কোন আলোর কাছাকাছি গতি-সম্পন্ন বেগে আমাদের ঘড়ি স্থাপন করা যায়, তাহলে আমাদের দশবছর সময় সেখানে একবছর হবে। সেখানে জীবের গতিবৃদ্ধিও কাল অনুযায়ী হবে। এখানে মানুষের পরমায়ু ১০০ বছর হলে সেই তীব্রগতিতে তার পরমায়ু হবে ১000 বছর। আবার এর অপেক্ষা কম গতিসম্পন্ন কোন ক্ষেত্রে যদি জীবের বিকাশ ঘটে সেখানে তার আয়ুর পরিমাণ হবে ১০ বৎসর। তীব্রগতি কালে ও ধীরগতি কালে জীবের বুদ্ধিবৃদ্ধিরও হেরফের ঘটবে। যে false vacuum থেকে জগৎ সৃষ্টি হয়েছে তার শেষ নেই। এই স্থূল জগৎ থেকে সে আবার মিথ্যে শূন্যতায় গিয়ে মিশবে। অর্থাৎ পুরুষ সূক্তের বক্তব্যমত তিনি অন্নদ্বারা অর্থাৎ স্থূল জগতের সাহায্যেই স্থূলতামুক্ত হবেন, অর্থাৎ অতিরোহণ করবেন। এই ঘটনাটি ঘটবে Big Crunch অর্থাৎ প্রলয় হলে। এর শেষ নেই। বৃত্তায়িত ভঙ্গীতে ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে। এই জন্য বলা হয়েছে 'তিনি অমরত্ব লাভে অধিকারী হন।']

(৩) তাঁর এরূপ মহিমা। কিন্তু তিনি এ অপেক্ষাও বৃহত্তর। [বস্তুতঃ false vacuum বা মিথ্যা শূন্যতাই শেষ কথা নয়, তারও উপর আছে। তার নাম মহাশূন্যতা, একেই Singularity বলে ভাববার চেষ্টা করা হয়েছে। সেই মহাশূন্যতায়—দেশ ও কাল বলে কিছু থাকবে না। ২৬টি মাত্রা হলে এরকম হতে পারে বলে মনে করা হয়েছে। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে সাংখ্যে এই মাত্রাকে ২৫টি বলে গণ্য করা হয়েছে। এই মাত্রাকে সেখানে বলা হয়েছে তত্ত্ব।] বিশ্বজীবসমূহ তার এক পাদ (অংশ) মাত্র। আকাশে অমর অংশ তার তিনপাদ। [এখানে স্থূল জগৎ ও সূক্ষ্ম জগতের কথা বলা হয়েছে। সমুদ্রে ভাসমান বরফখণ্ডের উপরিভাগের মত এই জগৎ। সেই বরফখণ্ডের তিনভাগ যেমন জলের নিচে থাকে এই দৃশ্য জগতেরও তেমনই একভাগ মাত্র দৃষ্টিগোচর। বাকী তিন ভাগ অদৃশ্য। শক্তির কথা বাদ দেওয়া যাক। অণুপরমাণুই তো আমাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। তবে অণুপরমাণু আর শক্তিতে ভেদ নেই। শক্তি তরঙ্গের এক একটি তরঙ্গই অনুপরমাণু। তথাপি পরমাণু জগৎ ও নির্ভেজাল শক্তির জগৎ একটু ভিন্ন ভিন্ন। এর উপরে রয়েছে শক্তির আর একটি স্তর যাকে বলা যায় মহাশূন্যতার স্তর। সেখানে শক্তিও নেই। মহাশূন্যতা, শক্তি ও অণুপরমাণু তার তিনপাদ বা আর তিনটি স্তর।]

(৪) পুরুষ আপনার তিনপাদ নিয়ে উপরে উঠলেন। [একথার অর্থ জগতের তিনপাদ অংশ অদৃশ্যই থাকল। সূক্ষ্ম হয়ে থাকল]। চতুর্থ অংশ এ স্থানে রইল [অর্থাৎ স্থূল জগতরূপে প্রকাশ পেল]। তিনি এরপর ভোজন-

কারী ও ভোজনরহিত অর্থাৎ চেতন ও অচেতন সকল বস্তুতে ব্যাপ্ত হলেন। [এ কথারও ব্যাপক অর্থ রয়েছে। হওয়া উচিত চেতন ও অচেতন বস্তু হলেন। আসলে চেতন ও অচেতন বস্তু রূপ ধারণ করে তাতেই অনুপ্রবেশ করলেন। বস্তুত জড় ও জীবে সর্বত্রই শক্তি ও চেতনা দুইই আছে। জড়বস্তু হল আবদ্ধ শক্তি। জীবন হল পরিস্ফুট শক্তি। জড়বস্তু যে আবদ্ধ শক্তি আইনস্টাইনের বিশেষ কোড ল্যাঙ্গুয়েজ, সে কথাই বলেছে—$E = mc^2$. অপর পক্ষে অধুনা উদ্ভিদ জগতের গূঢ় রহস্য আবিষ্কার করতে গিয়ে বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে তার মধ্যে এমনকি জড়বস্তুর মধ্যেও চেতনা রয়েছে। সুতরাং পুরুষ সূক্তের এ বক্তব্যে যে বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে তা অবশ্যই গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে হবে।

(৫) তাঁর থেকে বিরাট জন্মালেন এবং বিরাট থেকে পুরুষ জন্ম নিলেন। [এ প্রসঙ্গে বর্তমান রচনার নবম পৃষ্ঠাতে বলেছি। ধাঁধা সম্পর্কে **James Wallace Brahmam** $E=mc^2$ গ্রন্থে যে কথা বলেছেন তা **footnote** দিচ্ছি।[১৪]] তিনি জন্মগ্রহণ পূর্বক পশ্চাৎভাগে পৃথিবীকে অতিক্রম করলেন। [পশ্চাৎভাগ ও পুরোভাগকে **Big Bang** রূপী বিস্ফোরণের পর জগতের আভ্যন্তরীণ অবস্থা ও জগতের বাইরে শূন্যাবস্থা বুঝতে হবে।]

(৬) যখন পুরুষকে হব্যরূপে গ্রহণ করে দেবতারা যজ্ঞ আরম্ভ করলেন, তখন বসন্ত ঘৃত হল, গ্রীষ্ম কাষ্ঠ হল এবং শরৎ হব্য হল। [এখানে বসন্তকে কামরূপ ইচ্ছাতেজ, গ্রীষ্মকে দহনযোগ্য অবস্হা এবং শরৎকে দাহ্য পদার্থরূপে গণ্য করতে হবে।]

---

[১৪] The first Purusha repiesents energy, the second purusha coarse matter while viraj (virat) links the two. In this context it is interesting to note that according to Manu, after Brahma the more substantial manifestation of the primal essence Brahman had split into his male and female forms (positive and negative electric charges ?) Viraj (virat) was implanted in the latter. This was equivalent to claiming that viraj (virat) was born from the union, though not the fusion of Brahma's, male and female halves, which is conceptually no different from the scientists contention that the hydrogen atom the link between subatomic parctices and grosser matter formed after the neutron (a subatomic particle with no electrtc charge) split into positively charged proton and negatively charged electron forcing the latter to circumbulate the former because of its opposite charge—Braham, $E=mc^2$—James Wallace, p. 6.

(৭) যিনি সকলের আগে জন্মেছিলেন সেই পুরুষকে (first energy = false vacuum) পশুরূপে সেই বহ্নিতে (ঈশ্বরের কাম-এ, ইচ্ছাতে) পূজা দেওয়া হল, মানে বলি দেওয়া হল। দেবতাগণ, সাধ্যবর্গ[১৫] ও ঋষিগণ তা দ্বারা যজ্ঞ করলেন। [এরা হয়তো তিন ধরনের মৌল পদার্থ যাঁরা সৃষ্টির মূলে কাজ করলেন।[১৬]]

(৮) সেই সর্ব হোমযুক্ত যজ্ঞ হতে দধি ও ঘৃত উৎপন্ন হল। তিনি যে বায়ব্য পশু নির্মাণ করলেন তারা বন্য ও গ্রাম্য। [এই বায়ব্য পশু হল Kinetic energy. Big Bang-এর পর যে শক্তি আজও জগৎকে স্ফীতমান করে রেখেছে।]

(৯) সেই সর্ব হোম সম্বলিত যজ্ঞ থেকে ঋক ও সামসমূহ উৎপন্ন হল, ছন্দ আবির্ভূত হল, তা থেকে যজু জন্ম নিল। [এ সবই হল Cosmic dance ও interpenetration of atoms-এর কথা। ঋক্ সাম ছন্দ ইত্যাদি শব্দ cosmic dance-এর পরিচায়ক। অপর পক্ষে 'যজু' হল interpenetration of atoms পর্যায়, কারণ যজুর্বেদ হল পশুচারণ ও কৃষি যুগের সূচক। cultivation = Interpenetration.]।

(১০) ঘোটকগণ ও অন্যান্য দন্তপঙ্‌ক্তিদ্বয়ধারী পশুগণ জন্ম নিল। তা থেকে জন্ম নিল গাভী, ছাগ ও মেষগণ। [এখানে রয়েছে জীবনের ক্রম-

১৫ The castes were there engenderd from the sacrifice of the primordial man (Purusa) by the ancient Sadhya gods who seemed to be pre-Aryan, being very rarely mentioned.— An Introduction to the Study of Indian History—D. D. Kosambi, p. 108.

১৬ (a) There are only three families or 'generations' of fundamental particles that make up matter.—Michael Riordon.
(b) The universe contains more matter and antimatter. If there were fewer than three families of basic particees, the universe would contain equal amounts of matter and antimatter.—David Schramn (Astrophysicist—University of Chicago)
(c) Because matter and antimatter destroy each other, existence of fewer than three families means 'we would'nt be here. The whole universe would be filled with radiation and very little else. On the other hand if the building blocks of matter belonged to more than three families, the universe would contain more helium gas than it does.—David Sehramn.

বিকাশের কথা। আরম্ভ ঘোটক বা ঘোড়া দিয়ে। ঘোড়া বা অশ্ব গতির প্রতীক। এই সৃষ্টির গতি ক্রমশ ধীর হয়ে প্রাণীদের জন্ম দিতে লাগল।]

(১১) পুরুষকে খণ্ড খণ্ড করা হল। ক'খণ্ড হল? এর মুখ, দুই হাত, দুই উরু, দুই পাদ কি হল?

(১২) এর মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, দুবাহু থেকে রাজন্য, উরু থেকে বৈশ্য ও দু'চরণ থেকে শূদ্র হল। [একে ভারতীয় শাস্ত্রে চতুর্বর্ণ বলা হয়। বর্ণ মানে vibration. ভারতীয় অক্ষরগুলিকেও এই জন্য বর্ণ বসে। বিশ্ব-তরঙ্গের এক একটি বিশেষ তরঙ্গ আছে। তন্ত্রমতে এই তরঙ্গ ৫১টি। সেই জন্য ভারতীয় অক্ষর বা বর্ণ একান্নটি। আদি অক্ষর বাদ দিয়ে পঞ্চাশটি প্রচলিত। এক একটি বর্ণ এক একটি গুণের প্রকাশক। তাদের পারস্পরিক সংমিশ্রণেই জগতের সৃষ্টি। যদি superstring model অনুযায়ী ধরা যায় তাহলে অণুপরমাণুগুলিও বর্ণ ছাড়া আর কিছুই নয়। বিশ্ব-তরঙ্গেব এই বর্ণগুলির মধ্যে সূক্ষ্মতম, সূক্ষ্মতর থেকে স্থূল অবস্থা আছে। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মণ থেকে। বৃহ+মন=ব্রহ্মণ যা স্ফীতমান। 'বৃ' ধাতু থেকে ব্রহ্মণ অর্থাৎ বৃ=to grow. ব্রহ্মণের পর্যায় অতি সূক্ষ্ম শক্তির গতির পর্যায়। রাজন অর্থ 'জন' বা রাজ্যশাসনকর্তা। সেই অর্থে অনেক স্থূলতার দিকে অগ্রসর-মান শক্তি যা বিশ্বগঠন করতে যাচ্ছে। শক্তি এই পর্যায়ে পরিস্ফুট। এই জন্য এই রাজনই ক্ষত্রীয় হিসাবে পরিচিত। এই ক্ষত্রীয় শব্দের উৎপত্তি হিত্তি শব্দ থেকে। খত্তি শব্দ দ্বারা হিত্তি শব্দ বোঝায়। এই খত্তি শব্দ থেকেই সংস্কৃত ক্ষত্রীয় ও পালি খত্তিও শব্দের উৎপত্তি। এরা বলবীর্যের জন্য বিখ্যাত। এরা লোহা আবিষ্কার ও প্রথম ব্যবহার করে অত্যন্ত শক্তিশালী হয়েছিল। সুতরাং গুণের বিচারে রাজন ব্রাহ্মণের পরে। বৈশ্য সম্প্রদায় চাষবাস ও ব্যবসায়ের জন্য বিখ্যাত। এরা আরো পরবর্তী ধাপের। সব শেষে শূদ্র—যারা শুধু কায়িক পরিশ্রম করত অর্থাৎ একেবারেই স্থূল জগতের vibration. এর দ্বারা বিশেষ কোন শ্রেণী বোঝাচ্ছে তা নয়। এই কারণেই এদের রঙ দ্বারা চিহ্নিত করা হত। শ্যাম শাস্ত্রী এই জন্য মনে করেন ভারতের চারিটি মানব শ্রেণী তাদের গুণ অনুসারে বিভিন্ন বর্ণের বস্ত্র পরত বলে মানুষের এই বিভাগকে বর্ণ বলা হয়েছে। এই বর্ণগুলি বর্ণ ফ্রিকোয়েন্সি হিসাবেই এসেছিল। যেমন, ব্রাহ্মণেরা পরত শ্বেত বস্ত্র। এই শ্বেতবর্ণ জ্যোতিস্বরূপ। ক্ষত্রিয়েরা পরিধান করত রক্তবস্ত্র। লাল রঙ বিশেষ এক ধরনের ভীতিসঞ্চারক ভাব উৎপাদন করে বলেই সম্ভবতঃ শক্তির প্রতীক হিসেবে একে ব্যবহার করা হয়েছে। ভারতীয় তান্ত্রিক কৌলেরা (শক্তি উপাসকেরা। কুল (শক্তি) এই শব্দ থেকে কৌল শব্দের উৎপত্তি) এই জন্যই অদ্যাবধি রক্তাম্বর পরিধান করে। তবে যদি vibration হিসাবে বিচার করা যায় তবে লাল রঙের তেজের মাত্রা কম, কারণ এর wavelength বেশি। এই ক্ষেত্রে ভুল হয়ে থাকবে। অপর পক্ষে বৈশ্যারা পরত হলুদ বস্ত্র। তন্ত্রে হলুদ রঙ পৃথিবীদ্যোতক। সেই অর্থে বৈশ্য শব্দ স্থূলতার প্রতীক। শূদ্রেরা

পরত কৃষ্ণবস্ত্র। এর দ্বারা তামসিকতা বোঝাবার চেষ্টা হত—অর্থাৎ স্থূল জগৎ বা জড় জগৎ। যে কালে এই পুরুষকে ভাগ করে চার বর্ণ সৃষ্টি করা হয়েছে বলে মনে করা হয়, ঋগ্বেদের আমলে সেই বর্ণভেদ তেমন কঠোর ছিল না। সেই জন্য মনে হয় পুরুষ সূক্তে এই ব্রাহ্মণ, রাজন্য, বৈশ্য ও শূদ্র দ্বারা গুণ বিচার করা হয়েছে, কোন শ্রেণী বা caste নয়। Caste কথার উৎস পর্তুগীজ। যা দ্বারা বোঝায় পবিত্রতা। পরবর্তীকালে কৃষ্ণবর্ণ ভারতীয়দের সঙ্গে নিজেদের সংমিশ্রণ যাতে না ঘটে, বর্ণের পবিত্রতা যাতে না নষ্ট হয় সেই জন্য অনেকে মনে করেন সমাজে বর্ণভেদ এসেছিল। যদি তা এসেও থাকে তবে তা অনেক পরবর্তীকালের—ঋগ্বেদের সময়ের নয়। ঋগ্বেদের যথার্থ মানসিকতা বোধ হয় পরবর্তীকালে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে ধরা পড়েছিল। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন ঃ—

চাতুর্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।

[অর্থাৎ সত্ত্বাদিগুণ ও শমাদি কর্মের বিভাগ অনুসারে আমি গুণের সৃষ্টি করেছি। অর্থাৎ বর্ণ যে গুণ, তিনি সে কথাই বলেছেন।]

(১৩) মন থেকে চন্দ্র, চক্ষু থেকে সূর্য, মুখ থেকে ইন্দ্র ও অগ্নি এবং প্রাণ থেকে বায়ু এল। [এর দ্বারা জ্যোতি পর্যায়, আলো পর্যায় ও আবহাওয়া পর্যায় বোঝায়। ইন্দ্র ও অগ্নি এখানে বজ্রগর্জন ও বিদ্যুৎচমক সম্পন্ন আবহাওয়া মণ্ডল বোঝাচ্ছে।

(১৪) নাভি থেকে আকাশ, মস্তক থেকে স্বর্গ, দুচরণ থেকে ভূমি, কর্ণ থেকে দিক ও ভুবন সকল নির্মিত হয়েছে। [এই অংশটি রচনা করার সময় ভারতীয় যোগের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। মনে রাখতে হবে, যোগ যে ষড়-দর্শনের থেকে আগে ছিল না তা নয়। পতঞ্জলি নিশ্চিতরূপেই অপরের কাছ থেকে যোগবিদ্যালাভের কথা স্বীকার করেছেন। পতঞ্জলির আগে এই বিদ্যা প্রতর্দন বিদ্যা নামে পরিচিত ছিল। সিন্ধু সভ্যতাকে যোগাসনে (কুর্মাসনে ও অন্যান্য আসনে) বসা মূর্তি পাওয়া গেছে। সুতরাং ঋগ্বেদ রচিত হবার সময় যোগজ্ঞান আর্যদেরও ছিল। বিশেষ করে যোগের ষটচক্রীয় ধারণা এখানে প্রবল। নাভি+মস্তক+দুচরণ+দুকর্ণ=৬টি ধাপ রয়েছে। যোগের এই ষট্‌চক্র ভেদের অভিজ্ঞতা এখানে রয়েছে।]

(১৫) দেবতারা যজ্ঞ সম্পাদন কালে পুরুষ স্বরূপ পশুকে যখন বন্ধন করলেন, তখন সাতটি পরিধি ও বেদী নির্মাণ করা হল এবং একুশটি যজ্ঞ-কাষ্ঠ হল। [এই সপ্তবেদী সপ্ততল ও একুশটি যজ্ঞকাষ্ঠ একুশ দিনের প্রতীক। একুশ দিন সমাধিস্থ থাকলে সৃষ্টির উৎসে যাওয়া যায়। সুতরাং জগৎ সৃষ্টি হতেও নিশ্চয়ই একুশ দিন লেগেছিল। অবশ্য এই একুশ দিন বর্তমান ঘড়ির বিচারে নয়। আপেক্ষিক তত্ত্বের ভিত্তিতে একুশ দিনের সময়ের হিসাব ভিন্ন রকম হবে।]

(১৬) দেবতারা যজ্ঞ দ্বারা (অর্থাৎ বলি দ্বারা) যজ্ঞ সম্পাদন করলেন (যজ্ঞ ক্রিয়া শেষ করলেন)। এই অনুষ্ঠানই প্রথম ধর্মানুষ্ঠান। যে স্বর্গলোকে

প্রধান প্রধান দেবতারা ও সাধ্যেরা আছেন মহিমান্বিত দেবতাবর্গ সেই স্বর্গ প্রতিষ্ঠা করলেন। [এখানে দেবতা ও সাধ্য ঋষিরা সৃষ্টির কারণ মাত্র। সেই মূল কারণ অদ্যাবধি অবর্ণনীয়। বিজ্ঞানীরা আজ পর্যন্ত তার সুনির্দিষ্ট কোন কারণ খুঁজে না পেয়ে জগৎ সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিশ্বাসে আত্মসমর্পণ করেছেন এবং মরমিয়ারা একে অবর্ণনীয় বলে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং এখানে ঋগ্বৈদিক ঋষির মরমিয়া অভিজ্ঞতা আমাদের কাছে স্পষ্ট ব্যক্ত নয়। স্বর্গ যদি প্রশান্তির স্থান হয় তবে দেশকালহীন Singularity-ই সেই স্থান। মহাশূন্যতার সৃষ্টি হলেই সর্বোত্তম স্বর্গ হয়। False vacuum-এ বিস্ফোরণে তার কেন্দ্রস্থলে সেই মহাশূন্যতারই সৃষ্টি হয়েছিল, সেটাই স্বর্গ। এখান থেকেই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি অর্থাৎ দান করা হয়েছিল বলেই ঈশ্বরের 'কাম' মিশরের 'কমঅটেফ'-ই দেবতা। কারণ 'দিব্' ধাতু থেকে দেবতা, অর্থাৎ যাঁরা দান করেন। আর যজ্ঞ মানে sacrifice—ত্যাগ। ঈশ্বরের ইচ্ছাজাত আন্তর কামনা ত্যাগ থেকেই জগতের সৃষ্টি। সুতরাং জগৎ সৃষ্টির প্রারম্ভ পর্যায়ই প্রথম যজ্ঞ। স্থূল যজ্ঞে যদিও প্রার্থনাই করা হয়, মূল যজ্ঞে ত্যাগ করাটাই বড়। ব্যক্তির কামনা-বাসনা ত্যাগ করাই বড় যজ্ঞ, যে ত্যাগ হলে ঈশ্বর-মানসে স্থান লাভ করা যায়। সেই জন্য খ্রীষ্টানদের ক্রুশ বা ক্রুশচিহ্ন বড় প্রতীক—যাতে বলা হচ্ছে ঈশ্বর তাঁর অন্তর্নিহিত ইচ্ছাকে ত্যাগ করে জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন। মানুষ তার সীমিত ইচ্ছাকে ত্যাগ করলে সেই স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটবে। এই জন্যই যিশু একদিকে অবরোহ পর্যায়ে ঈশ্বরপুত্র। অপর দিকে মানুষের মুক্তির জন্য ব্যক্তি অহংকার ত্যাগ করতে শিখিয়ে মানবপুত্র।]

আরো দুটি বিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কিত সূক্তও ঋগ্বেদে আছে—যেগুলিতে পুরাণ কাহিনীর উপাদান বাদ দিয়ে কিছুটা দার্শনিক ভাবে বিশ্বসৃষ্টি রহস্য উন্মোচন করার চেষ্টা হয়েছে, একটিতে অনস্তি—অসৎ থেকে অস্তি—অর্থাৎ সৎ-এর উদ্ভবের কথা বলা হয়েছে। আর একটি অর্থাৎ দশম মণ্ডলের ১২১তম সূক্তে স্বর্গ, মর্ত্য ও জল হিরণ্যগর্ভ সৃষ্টি করেছেন এমন বলা হচ্ছে।

> "হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূবস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।
> সদাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈদেবায় হবিষা বিধেম ॥১
> য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিসং যস্য দেবাঃ।
> যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃতুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥২
> যঃ প্রাণতো নিমিবতো মহিত্বৈক ইদ্রাজা জগতোবভূব।
> য ঈশে অস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ কস্মৈদেবায় হবিষা বিধেম ॥৩
> যস্যেমাঃ প্রদিশো যস্য বাহু কস্মৈদেবায় হবিযা বিধেম ।৪
> যেন দ্যোরুগ্রা পৃথিবী চ দৃড়হা যেন স্বঃ স্তভিতং যেন নাকঃ।
> যো অন্তরিক্ষে রজসো বিমানঃ কস্মৈদেবায় হবিষা বিধেম ॥৫
> যং ক্রন্দসী অবসা তস্তভানে অভ্যৈক্ষেতাং মনসা রেজমানে।
> যত্রাধি সূর উদিতো বি ভাতি কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥৬

আপোহ যদ্ব্হতীর্বিশ্বমায়ন্ গর্ভং দধানা জনয়ন্তীরগ্নিম।
ততো দেবানাং সমবর্ততাসুরেকঃ কস্মৈদেবায় হবিষা বিধেম ॥৭
যশ্চিদাপো মহিনা পর্যপশ্যদ্দক্ষং দধানা জনয়ন্তীর্যজ্ঞম।
যো দেবেষ্বধি দেব এক আসীৎ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥৮
মা নো হিংসীজ্জনিতা যঃ পৃথিব্যা যো বা দিবং সত্যধর্মা জজান।
যশ্চাপশ্চন্দ্রা বৃহতীর্জজান কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥৯
প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বা জাতানি পরিতা বভূব।
যৎকামাস্তে জুহুমস্তন্নো অস্তু বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাম্ ॥১০

১। সর্বপ্রথম কেবল হিরণ্যগর্ভই ছিলেন। তিনি জন্মমাত্রই সর্বভূতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর হলেন। তিনি এ পৃথিবী ও আকাশকে স্বস্থানে স্থাপিত করলেন। কোন্ দেবতাকে হব্যদ্বারা পূজা করব?

২। যিনি জীবাত্মা দিয়েছেন, বল দিয়েছেন, যাঁর আজ্ঞা সকল দেবতা মান্য করেন, যাঁর ছায়া অমৃতস্বরূপ, মৃত্যু যার বশ। কোন্ দেবতাকে হব্য দ্বারা পূজা করব?

৩। যিনি স্বীয় মহিমাদ্বারা যাবতীয় দর্শনেন্দ্রিয়সম্পন্ন গতিশক্তিযুক্ত জীবদের অদ্বিতীয় রাজা হয়েছেন, যিনি এইসব দ্বিপদ চতুষ্পদের প্রভু। কোন্ দেবতাকে হব্য দ্বারা পূজা করব?

৪। যাঁর মহিমা দ্বারা এই সকল হিমাচ্ছন্ন পর্বত উৎপন্ন হয়েছে, সসাগরা ধরা যাঁরই সৃষ্টি বলে উল্লেখিত, এই সকল দিক ও বিদিক যার বাহুস্বরূপ। কোন্ দেবতাকে হব্য দ্বারা পূজা করব?

৫। এই সমুন্নত আকাশ ও পৃথিবীকে যিনি সৃষ্টি করে স্বস্থানে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করেছেন, যিনি স্বর্গলোক ও নাগলোককে স্তম্ভিত করে রেখেছেন, যিনি অন্তরিক্ষলোক করেছেন। কোন্ দেবতাকে হব্য দ্বারা পূজা করব?

৬। দ্যো ও পৃথিবী সশব্দে যার দ্বারা স্তম্ভিত ও উল্লসিত হয়েছিল, এবং সেই দীপ্তিশীল দ্যো পৃথিবী যাকে মনে মনে মহিমান্বিত বলে বুঝতে পেরেছিল, যাকে আশ্রয় করে সূর্য উদিত ও দীপ্তিযুক্ত হন। কোন্ দেবতাকে হব্য দ্বারা পূজা করব?

৭। ভূরি পরিমাণ জল সমগ্র বিশ্বভুবন আচ্ছন্ন করল, তারা গর্ভধারণ-পূর্বক অগ্নিকে উৎপন্ন করল, তা থেকে দেবতাদের একমাত্র যিনি প্রাণস্বরূপ তিনি আবির্ভূত হলেন। কোন্ দেবতাকে হব্য দ্বারা পূজা করব?

৮। যখন জলরাশি তেজ ধারণপূর্বক অগ্নিকে উৎপাদন করল, তিনি যখন নিজ মহিমা দ্বারা সেই জলের উপর সর্বদিক্ নিরীক্ষণ করলেন, তিনি দেবতাদের উপর অদ্বিতীয় দেবতা হলেন। কোন্ দেবতাকে হব্য দ্বারা পূজা করব?

৯। যিনি পৃথিবীর জন্মদাতা, যাঁর ধারণ ক্ষমতা অপ্রতিহত, যিনি আকাশকে জন্ম দিলেন, যিনি আনন্দবর্ধনকারী জল সৃষ্টি করেছেন

তিনি যেন আমাদের হিংসা না করেন। কোন্ দেবতাকে হব্য দ্বারা পূজা করব ?

১০। হে প্রজাপতি ! তুমি ছাড়া অন্য আর কেউ এ সকল উৎপন্ন বস্তুকে আয়ত্ত করে রাখতে পারেনি। যে বাসনা নিয়ে আমরা তোমার হোম করছি, তা যেন আমাদের সিদ্ধ হয়। আমরা যেন ধনের অধীশ্বর হই।

উপরোক্ত সূক্তে হিরণ্যগর্ভ বলতে ঋগ্বৈদিক ঋষি কি বুঝেছেন স্পষ্ট নয়। যোগ সাধনার মরমিয়া অভিজ্ঞতায় স্বর্ণদীপ্তি সদৃশ একটি যে দেশ লক্ষ্য করা যায়—তা অনেক নিম্ন পর্যায়ের। সেখানে দেশের মধ্যে বস্তুসত্তা ঘনীভূত হয়েছে। যোগসাধনায় বিশ্বজগতের উৎপত্তির প্রাথমিক কোন স্তরে জ্যোতি-ব্যতীত অন্য কিছু দর্শন করা যায় না। সম্ভবতঃ হিরণ্য অর্থ এখানে 'মূল্যবান'। কিংবা পরবর্তী যে হিরণ্য পর্যায়ের দেশ (space) থেকে বস্তু-জগৎ সৃষ্টি হয়েছে—তার ধারক হিসেবে একে ঈশ্বরের কামজাত ইচ্ছাশক্তির প্রথম বিস্ফোরণের পরের অবস্থা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই বিস্ফোরণের মধ্যেই হিরণ্যদ্যুতির আকাশ বীজ আকারে ছিল বলেই হয়তো একে হিরণ্য-গর্ভ বলা যেতে পারে। কিংবা এই হিরণ্যগর্ভ বিশ্বডিম্ব বা cosmic egg. Cosmic egg সেই অবস্থা, সৃষ্টির পূর্বে যখন সকল বস্তুসত্তা একত্রে সন্নিবেশিত ছিল। বিজ্ঞানের কথা মত—'All the matter and energy now in the universe was concentrated at extremely high density —a kind of cosmic egg, reminiscent of the creation myths of many cultures perhaps into a mathematical point with no dimensions at all (Cosmos, Carl Sagan, p. 200)।

এই হিসেবে যদি লক্ষ্য করা যায়—তাহলে সেই ঘনীভূত দৈশিক ক্ষেত্রই হিরণ্যগর্ভ। সেই ক্ষেত্রের বিস্ফোরণেই পর্যায়ক্রমে দেশ (spaee) থেকে দেশ ও সময়জাত সবকিছু সৃষ্টি হয়েছে। হিরণ্যগর্ভের সৃষ্টির ধাপগুলি বিজ্ঞানের সৃষ্টির ধাপের সঙ্গে মিলেও যায়। 'ভূরি পরিমাণ যে জলে'র কথা বলা হয়েছে তা শূন্য ব্যোম। যে-কোন ভাবেই হোক সেই ব্যোমস্থ ঘনসন্নিবিষ্ট বস্তুসত্তার পেষণ থেকেই দেশে অগ্নির প্রকাশ। তারপরই স্থূল জগতের স্তরে স্তরে আবির্ভাব। সৃষ্টির ইতিহাস বিশ্লেষণ করে দেখতে গেলে সেই দিক থেকে হিরণ্যগর্ভ ঋষির এই সূক্তটি নিতান্তই ভ্রান্তধারণাপ্রসূত সেরকম মনে হয় না।

সৃষ্টির সে ইতিহাস এখানে ব্যক্ত হয়েছে তার পাশে আধুনিক বিজ্ঞানীদের বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কে সর্বশেষ ধারণার কথা উল্লেখ করা যাক। হয়তো সর্বাংশে উপরোক্ত সূক্তিটির সঙ্গে মিলবে না—কিন্তু ভাবগত ভাবে যে মিল প্রচুর তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

প্রথমে কিছুই ছিল না। না ছিল কাল, না দেশ। শূন্যতা বলতে যা বোঝায় (false vacuum) তাও ছিল না। ছিল মহাশূন্যতা, 'স্থানহীন এক' অবস্থা। বর্ণ ছিল না, আকৃতি ছিল না, বস্তুসত্তা ছিল না. মুহূর্ত ছিল না, অনন্তও ছিল না (অনন্তর ধারণা সময় ছাড়া হয় না বলেই ছিল না)।

এই নির্ভেজাল শূন্যতা থেকে এক বিন্দু বিশৃঙ্খলা ফুটে উঠল। এরই মধ্যে ছিল কাঁচা তেজপূর্ণ এমনই এক বীজ যা কল্পনা করার মত মস্তিষ্ক আজও জন্মগ্রহণ করেনি। এই স্পন্দমান তেজ-বিশৃঙ্খলার মধ্যে অণুপরমাণু অপেক্ষাও ক্ষুদ্র পরিধিতে ছিল দেশ ও কাল। যদিও দেশ ও কালের চিন্তা তখন ছিল অবান্তর। **এখন, তখন, হবে**—এসব কিছুই ছিল না। ছিল না **এখানে** বা **সেখানে** বলতে কিছু।

সেই অতি ক্ষুদ্র বিশ্ব ছড়াতে আরম্ভ করল। যতই এটি বাড়তে লাগল ততই শীতল হতে লাগল। ছড়িয়ে পড়তে লাগল এর তেজ। একটি শক্তি সঙ্গে সঙ্গে এ থেকে অন্যান্য শক্তি হতে পৃথক হয়ে বেরিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গেই এ অবস্থাতে যারা থাকতে পারে সেই ধরনের অণুপরমাণু জোড়ায় জোড়ায় বেরিয়ে এসে কেউ বা ফুলকি দিয়ে উঠল কেউ গেল নিভে। পরস্পর ধ্বংসাত্মক সংঘর্ষের শ্রাবণধারা নামল যেন।

সঙ্গে সঙ্গে শিশুবিশ্ব অব অণু পর্যায় থেকে তরমুজের মত ফুটে উঠল। সেকেণ্ডের মধ্যে তার আকৃতি হল আমাদের সৌর বিশ্বের মত। একটি নক্ষত্র অপেক্ষাও ঘনবস্তুসত্তা দিয়ে তৈরি একটি বস্তু ও শক্তির কটাহ তৈরি হয়ে গেল। নির্ভেজাল তেজোপূর্ণ সেই তরুণ বিশ্বের সর্বত্র জ্বলে উঠল। এর আকৃতি বাড়ল ও শীতল হল ; ছুটন্ত অণুপরমাণুগুলি পরস্পর মিশে গিয়ে বৃহত্তর হাইড্রোজেন অণু তৈরি করল। সেই অণুপুঞ্জ তৈরি করল স্ফীত গ্যাসের প্রকাণ্ড ঘূর্ণাবর্ত। যুগের পর যুগ কেটে গেল। বিশ্ব বৃহত্তর হল। এর দীপ্ত অগ্নি অন্ধকারে ডুবে গেল। কোটী কোটী বছর এল গেল। সেই ঘূর্ণায়মান মেঘ থেকে কোটী কোটী নক্ষত্র বেরিয়ে এল। দেখা দিল ছায়াপথ। এল আরও নক্ষত্র, অন্যান্য বিশ্ব, পৃথিবী, জীবন, মানুষ।[১৭]

ঋগ্বেদের ১২১তম সূক্ত থেকে এর পার্থক্য এই যে, এখানে কোন দেবতা

---

১৭ …at first there was nothing—no time, no space, not even emptiness, only a void beyond voids, a place that was no place, without colour, without shape or substance, without the passing of a single moment or the prospect of eternity.

From this pure nothingness sprang a speck of chaos, a seed seething with such raw energy that the thought capable of contemplating it has not yet been formed. Within this speck of vibrating energy, still many times tinier than an atom, were the dimensions of time and space, although these concepts were then meaningless. There was no *now*, *then* or *will be* ; no *here* or *there*. .

The infinitesimal cosmos began to expand. As it grew, it cooled and its energy dissipated. Almost at once one of the

বা সচেতন মানসসত্তার কথা বলা হয়নি। বলা হয়েছে শুধু ধাপে ধাপে বিশ্বসৃষ্টির কথা। আর সেই বর্ণনার সঙ্গে, অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করলেই বোঝা যাবে—আধুনিক বিজ্ঞানের বিশ্বসৃষ্টি বর্ণনার মিল রয়েছে বহু ক্ষেত্রেই।

একটি জিনিস লক্ষ্য করার ব্যাপার এই যে, ঋগ্বৈদিক ঋষিরা বিশ্বসৃষ্টির ক্ষেত্রে সবাই প্রায় প্রথম জলের অস্তিত্বের কথা বলছেন। তবে এই জল আমাদের সাধারণ ধারণার জল নয়। এ জল হচ্ছে শূন্যতারূপী দেশ—যাকেই বলে ব্রহ্মাণ। এই শূন্যতা নির্ভেজাল শূন্যতা নয়, একে false vacuum বা ব্যোম বলা যেতে পারে।

এই আকাশ আর পৃথিবীকে ঋগ্বেদে সাধারণতঃ সকল দেবদেবীর পিতা-মাতা হিসেবে বর্ণিত দেখা যায়। এই পৃথিবী যে আমাদের মৃত্তিকা তা নয়। এই পৃথিবী শুধুমাত্র বস্তুসত্তা। বস্তুসত্তার সূক্ষ্মবীজ রয়েছে দেশ ও কালের মধ্যে। দেশ যদি আকাশ, কালকে এখানে পৃথিবী বলা যেতে পারে। আর বিজ্ঞানের মতে এই দেশ ও কাল থেকেই সৃষ্টি—'Physicists for years have been intrigued by the possibility that the entire universe came from a quantum transition from nothing (i. e. pure space-time, without matter and energy)। তবে আরও যদি স্থূল অর্থে নেওয়া যায় তবে পরবর্তীকালে সাংখ্যের তত্ত্বের প্রাক্তন অনুমান

forces raging within it separated from the rest. Soon pairs of particles capable existing only in such extreme conditions flashed in and out of existence, colliding with each other in a shower of annihilation.

Suddenly the infant cosmos erupted from subatomic proportions to the size of a cantaloupe. Within a second it was as big as the solar system, a crucible of matter and energy denser than a star. Pure, energized light blazed throughout the young universe. As it grew and cooled, flying particles began coalescing into larger structures of hydrogen atoms, which eventually swirled into immense clouds of billowing gas.

Epochs passed. The universe expanded. Its blazing light faded into darkness. A million years, then a billion, came and went. All at once millions of stars began emerging from swirling clouds of hydrogen gas. Galaxies appeared, then move stars, other world perhaps, Earth, life, people.

Masters of Time, John Boslough, p. 54-55

এখানে পাওয়া যেতে পারে। সাংখ্য মতে সৃষ্টির পেছনে দুটি চিরন্তন সত্তা রয়েছে—পুরুষ অর্থাৎ নির্ভেজাল সৎ ও প্রকৃতি বস্তুসত্তার দৈশিক গর্ভাবস্থা। কিন্তু বেদান্ত যেমন সৃষ্টির উৎসে দুইয়ের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন—অধুনা বিজ্ঞানও তাই। তাই এই আকাশ ও পৃথিবী অর্থে দেশ ও কাল বা Space ও Time হওয়াই উচিত।

ঋগ্বেদে দ্যৌ ও পৃথিবী ব্যতীত কদাচিৎ অন্য কোন দেবতাকে অন্যান্য দেবদেবীর মাতা পিতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। একবার মাত্র দেখা যায় ঊষাকে দেবদেবীদের মাতা ও ব্রহ্মণস্পতি বা সোমকে তাদের পিতা রূপে কল্পনা করা হয়েছে। ঋগ্বেদের বিশ্বসৃষ্টিমূলক সূক্তে আরও একটি জিনিস লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, জলের উপাদান থেকেই দেবতাদের সৃষ্টি হচ্ছে। এতেই আছে, জগৎ সৃষ্টি হবার পর দেবতাদের জন্ম এমন কথা।

তবে সৃষ্টি সম্পর্কে যে ধরনের অভিমতই বৈদিক ঋষিদের থাকুক না কেন—মানুষের উৎপত্তি সম্পর্কে নির্দ্বিধ কোন সিদ্ধান্ত নেই। এ ক্ষেত্রে তাঁদের চিন্তা দোদুল্যমান। তবে মূলতঃ তাদের উৎপত্তি যে দিব্য কোন ক্ষেত্র থেকে সেরকমই ভাবা হয়েছে। একবার অগ্নিকেও মানুষের প্রজনক বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিছু কিছু বৈদিক ঋষিকে দেখা যাচ্ছে তাঁদের পিতৃপুরুষের সূত্রে তাঁরা দেবতাদের থেকেই আসছেন। তবে সাধারণ বিশ্বাস এই যে, প্রথম মানব মনু বা যম থেকেই মনুষ্যজাতির আবির্ভাব। এরা দু'জন আবার এক ধরনের সূর্য দেবতা—বিবস্বতের পুত্র।

বৈদিক ভারতীয়রা অতিপ্রাকৃত অনেক সত্তায় বিশ্বাস করতেন যাদের চরিত্র ও ক্ষমতা ছিল নানা ধরনের। এই অতি অপ্রাকৃত সত্তার দুটো দিক আছে—ভাল ও মন্দ। একদল আছেন শুধুই ভাল। আর একদল খারাপ, মানুষের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ। প্রথম শ্রেণীর দেবতারা নির্ভেজাল পুজো পেতেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর শক্তিগুলোকে দূরে রাখার জন্য নানা অনুষ্ঠান করা হত বা দেবদেবীদের সাহায্য ভিক্ষা করতেন বৈদিক আর্যেরা। দেবদেবীদের মধ্যেই দু'শ্রেণী ছিলেন উচ্চ ও অব্যবহিত নিম্নশ্রেণীর দেবদেবী। যাঁরা উচ্চ-শ্রেণীর দেবদেবী তাঁদের ক্ষমতা সমগ্র বিশ্ব পরিব্যাপ্ত ছিল। পার্থিব পরিমণ্ডলের উপরও তাঁদের নিয়ন্ত্রণ স্বীকৃত হত। অব্যবহিত নিম্নশ্রেণীর দেবদেবীদের ক্ষমতা নির্দিষ্ট বৃত্তের মধ্যেই সীমিত ছিল। ছোট ছোট এক্তিয়ারের মধ্যে তাঁরা কাজ করতেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন গৃহদেবতা, জিনপরী ইত্যাদি। প্রাচীন মানুষের অনেকের উপরও দৈবীসত্তা আরোপ করা হত। প্রাচীন মনীষী ব্যক্তি যাঁরা দেবতাদের কার্যাবলীর সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেছিলেন, বা যাঁরা মৃত্যুর পর দেবলোকে স্থান পেয়েছিলেন তাঁরাও পুজো পেতেন দেবতাদের মত। শেষ পর্যন্ত সর্বনিম্নে অনেক জড় বস্তুকেও পূজা করার ব্যবস্থা ছিল। এমন কি কাজের যন্ত্রপাতিও দেবতারূপে মর্যাদা পেত। কাজের সময় তাদেরও শ্রদ্ধা সহকারে স্মরণ করা হত।

একদা জড় বস্তুকে পূজা করার ব্যাপারটা হাস্যাস্পদ ঠেকলেও বর্তমানে

তাদের মধ্যে মানস-সত্তার উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়ায় মানুষের বিশ্বাসের পরিধির ব্যাপ্তি আরও অনেকটাই বেড়ে গেছে। তাই সেই ধরনের বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আধুনিক বিজ্ঞানের পুরোভাগে যাঁরা আছেন তাঁরাও বলেছেন যে উদ্ভিদের চেতনা আসতে পারে মহাবৈশ্বিক দিব্যজীবদের জগৎ থেকে। হিন্দু ঋষিরা এই জন্যই তাঁদের বলতেন—'দেবস'।[১৮]

১৮ What shocked them most was his suggestion that the awarness of plants might originate in a supramaterial world of cosmic beings to which long before the birth of Christ the Hindu sages referred as "devas" and which as fairies. elves, gnomes, sylphs and a host of other creatures were a matter of direct vision and experience to clairvoyants among the Celts and other sensitives. Introduction to the Secret Life of Plants—Peter Tompkins and C. Bird, p. XV.

দ্বিতীয় অধ্যায়

যোগ ও ঋগ্বৈদিক ধর্ম

ঋগ্বেদের দেবদেবীদের স্পষ্ট বুঝতে গেলে এদের একটা মরমিয়া ভিত্তি আছে—সেটাও জেনে নেওয়া প্রয়োজন। সেই মরমিয়া ভিত্তির উৎস ভারতীয় যোগ। অনেকে মনে করেন বৈদিক ধর্মের উৎসই হল যোগ।

ঋগ্বেদে যে ভৌগোলিক পরিবেশ ব্যক্ত হয়েছে তা পবিত্র ভৌগোলিক পরিবেশ। বৈদিক অনুষ্ঠানের জন্য যে সময় নির্বাচন করা হয়েছে তা-ও বিশেষ শুভ মুহূর্তে। তৃতীয় যে ভিত্তি ঋগ্বেদের আছে তাকে যৌগিক বলা যেতে পারে। ভারতের পবিত্র ভৌগোলিক পরিবেশ যোগের আন্তর পটভূমি হয়ে দেখা দিয়েছে। এই পটভূমি সূক্ষ্মদেহের ষট্‌চক্রকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। শুভ মুহূর্তে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগের মাধ্যমে অধ্যাত্ম সত্যের স্বাদ পেয়েছে। ঋগ্বেদের দেবতারা জ্ঞান ও অধ্যাত্ম দীপ্তিতে বিভিন্ন প্রতীক হয়ে দেখা দিয়েছেন।

সাধারণ লোকে ভাবে প্রাচীনদের প্রাকৃত ঘটনা সম্পর্কে সম্যক ধারণা ছিল না। সেই জন্যই সময়-জ্ঞান ও ইতিহাস-চেতনা পুরাণ কাহিনীর চাদরে জড়িয়ে গেছে। কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে যে, ধর্ম সম্পর্কে তাঁদের মানসিকতা বর্তমান মানুষের মানসিকতা থেকে অনেক বেশি সততায় উজ্জ্বল ছিল। জীবনকে দেবতাবিচ্যুত করে তাঁরা কখনও দেখেন নি। তাঁদের নিত্যকর্ম সেই জন্য পবিত্র আনুষ্ঠানিকতায় ভরে থাকত। তথাপি আমাদের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী অনেক বেশি উন্নত বলে আমরা মনে করি। এখনও আমাদের বিশ্বাস একেশ্বরবাদের ধারণা হিব্রুদের আগে প্রাচীন লোকদের কাছে জ্ঞাত ছিল না। আধুনিক বিশ্বাস এক ঈশ্বরেই নোঙর করা। সেই জন্য বহু দেববাদীয় অনুষ্ঠানকে অবজ্ঞার চোখে দেখি। কিন্তু অধুনা যোগের আন্তর রহস্য সামান্য পরিমাণেও মানুষের কাছে যা উদ্ঘাটিত হয়েছে তাকে এমন ধারণা করতে অসুবিধা হচ্ছে না যে, প্রাচীন বিশ্বাসের অনেকগুলিই ছিল উচ্চতর চিন্তার প্রতিফলন। সেই উচ্চতর চিন্তার প্রতিফলন প্রাচীন ভারতের ঋগ্বেদ ও প্রাচীন মিশরের মৃতের পুস্তকে লক্ষ্য করা যায়। সেই চিন্তার আলোকে বিচার করে দেখলে আধুনিক একেশ্বরবাদীয় ধারণা খুব বেশী যে উন্নত নয় এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

দিব্য জগৎ সম্পর্কে আমাদের বর্তমান ধারণা অনেকটাই নৈর্ব্যক্তিক দর্শন জাতীয়। কিন্তু প্রাচীনদের কাছে তাঁদের অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতা ছিল রীতিমত জীবন্ত। আজকের মত ভাষার এত মারপ্যাঁচ প্রাচীনদের ছিল না। কিন্তু

তাঁদের সেই কাঁচা ভাষাতে অন্ততঃ একটা জিনিস জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে যাকে বলে দিব্য সত্তার সঙ্গে প্রত্যক্ষসংযোগ—যেটি বর্তমানে নেই। আধুনিক দার্শনিক চেতনা দিব্যজগৎ থেকে সহস্র যোজন দূরে। প্রাচীন ভারত বহু দেবতার উপাসনা করলেও—তার মধ্যে একটি জিনিস অত্যন্ত স্পষ্ট যে, আমাদের আন্তরসত্তার সঙ্গে ঈশ্বরের মূলত কোন ভেদ নেই। এই বোধই ভারতবর্ষে সৃষ্টি করেছেন বড় বড় যোগী, গুরু, অবতার প্রভৃতি। তার অন্তরালোক থেকে যে বাণী নির্গত হয়েছে পশ্চিমে আজও তা অজ্ঞাত। এক্ষেত্রে যাঁরা অধ্যাত্ম চেতনায় আকাশের বুকে নক্ষত্রের মত জ্বলজ্বল করে জ্বলছেন তাঁরা হলেন ঋগ্বৈদিক ঋষিগণ। বহুদেবতা মানেই যে বহুদেববাদ তা নয়। ঈশ্বর-বোধের এ হল বিভিন্ন পথ মাত্র, বিরাট এক জাগ্রত অধ্যাত্ম চেতনা। আমাদের আধুনিক বহু প্রাণহীন বিশ্বাস অপেক্ষা এ অনেক ভাল। নিজের ভেতরে অসীমের সর্বব্যাপ্ত প্রসার লক্ষ্য করে এই জাগ্রতবোধ থেকেই ঋগ্বেদের চতুর্থ মণ্ডলের ২৬ নং সূক্তের প্রথম পংক্তিতে ঋষি বামদেব বলতে পেরেছিলেন—

"অহং মনুরভবং সূর্যশ্চাহং কক্ষীবাঁ ঋষিরস্মি বিপ্রঃ।
অহং কুৎসমার্জুনেয়ং ন্যৃংজেঽহং কবিরুশনা পশ্যতা মা॥"১

অর্থাৎ আমি মনু, আমি সূর্য, আমি মেধাবী কক্ষীবান ঋষি, আমি অর্জুনীর পুত্র কুৎস ঋষিকে অলংকৃত করেছি। আমি কবি উশন। আমাকে দর্শন কর।

এই যে অভিজ্ঞতা প্রাচীনকালে ইহুদীদের মোজেশও জ্বলন্ত ঝোপের কাছে এই অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিলেন, ঈশ্বরের কণ্ঠে তিনি শুনতে পেয়েছিলেন—'আমি যা আমি তাইই।' এই বোধ; মোজেসের যা ব্যক্তিগত ছিল প্রাচীন ভারতে তা ছিল ভারতীয় উত্তরাধিকার, প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র আত্মার অভীপ্সা।

ঋগ্বেদে যোগের খুব প্রত্যক্ষ উল্লেখ নেই। বরং পরবর্তী উপনিষদসমূহে এর উল্লেখ স্পষ্ট। কিন্তু ঋগ্বেদেও যৌগিক উপলব্ধির সুর যে ধ্বনিত হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। আর এটা যে অসম্ভব কিছু তা নয়। কারণ ঋগ্বৈদিক যুগের আগের ভারতেও সিন্ধু সভ্যতায় এমন অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, তৎকালে হরপ্পা সংস্কৃতিতে যে যোগ করার অভ্যাস ছিল তা প্রায় স্বীকৃত। হরপ্পা সংস্কৃতি যদি ঋগ্বৈদিক পর্বের আগের হয় তাহলে ঋগ্বেদে তার প্রভাব না পড়ার কারণ নেই। যৌগিক অভিজ্ঞতার মরমিয়া সুর ঋগ্বেদে ধ্বনিত হওয়া সত্ত্বেও আজও তথাকথিত পণ্ডিতজনের বিশ্বাস ঋগ্বৈদিক সাহিত্য মূলত অনুষ্ঠানভিত্তিক; দার্শনিকও নয় ও তেমন করে মরমিয়াও নয়। মরমিয়া ভাব যতটা এসেছে—তা এসেছে নির্ভেজাল কাব্যিক চেতনা থেকে। যৌগিক অভিজ্ঞার উৎকর্ষ বা মাত্রা ক্বচিৎ কদাচিৎ এখানে আছে। বরং তাঁরা বৈদিক ঋষিদের সাহিত্যকৃতিকে প্রাচীন প্রকৃতিবাদজাত বলে মনে করেন। উপনিষদের বিবেকবাদী মানসিকতার মধ্যে বরং এর প্রভাব রয়েছে। হিন্দু

ঐতিহ্যে যথার্থই যদি মহৎ কোন অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে তা এসেছিল শেষ প্রাচীন যুগে উপনিষদে। কিন্তু ঋগ্বেদকে যে স্বয়ং প্রকাশিত ভাব বা শ্রুতি (অন্তরে শ্রুত) বলে দাবি করা হয়েছে—সেই দাবিকে উপেক্ষা করার ফলেই উপরোক্ত ধারণা। ওঁরা ভুলে গেছেন যে উপনিষদের ঋষিরা পর্যন্ত বহুক্ষেত্রে ঋগ্বেদকে মৌলগ্রন্থ হিসাবে ধরে নিয়ে তা থেকে উদ্ধৃতি পর্যন্ত দিয়েছেন। ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্যই এই যে—প্রাচীনকে কখনও ভারতীয়েরা অবজ্ঞা করেননি। সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে বরাবরই অতীতের দিকে তাকিয়েছেন।

যেমন বাস্তবতায় আচ্ছন্ন কিছু সমালোচক আছেন তেমনই অতীত ভারতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল মরমিয়া কিছু সমালোচকও রয়েছেন যাঁরা মনে করেন যে, যোগ ও উপনিষদের বোধ সুপ্তভাবে প্রতীকের মধ্য দিয়ে ঋগ্বেদেও কাজ করেছে। ঋগ্বেদকে শুধুমাত্র প্রকৃতি-চেতনার দ্বিত্ব থেকে বিচার না করে অধ্যাত্ম অনুভূতির দিক থেকেও চিন্তা করা যেতে পারে। ঋষি অরবিন্দ, গণপতি মুনি, রমন মহর্ষি—এঁরা সব অধ্যাত্ম দৃষ্টিতেই ঋগ্বেদকে বিচার করেছেন। প্রাচীন ভাষ্যকার যাস্ক ও সায়নের বক্তব্যেও স্বীকৃত যে, ঋগ্বেদে অধ্যাত্ম চেতনা ছিল। এই আত্মজ্ঞান সমগ্র বৈদিক ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মধ্য দিয়েই প্রবাহিত। অদ্বৈতবাদ বেদান্তের একান্তই নিজস্ব নয়। এর ধারা প্রবাহিত হয়ে এসেছে বৈদিক সাহিত্যের উৎস থেকেই। মানুষের জীবনে অধ্যাত্ম সাধনার শুরু সেই প্রাচীনকাল থেকেই, প্রাগ্বৈদিক যুগ থেকেই, যথার্থ ঐতিহাসিক যুগ আরম্ভ হবার বহু আগে। সত্য যুগই এর যথার্থ উৎস। আজ সেই সত্যটা আমরা ধরতে পারছি না এই কারণে যে, সত্য যুগের মানস-চেতনা থেকে আমাদের পতন হয়েছে। উপনিষদের অত্যুচ্চ দার্শনিক চিন্তা একান্তই উপনিষদকারদের নিজস্ব নয়—বরং বলা যেতে পারে মহান অধ্যাত্মতার পতনের সূত্রপাত সেখান থেকেই। আন্তরিক অনুভূতি ক্রমশই সরে গিয়ে মানুষের চিন্তাধারা সেখান থেকেই দার্শনিকতার দিক ঝুঁকে পড়েছিল। অনুভব বাদ দিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ শুরু হয়েছিল। অন্তরের স্পর্শশূন্য সেই শুধুমাত্র তার্কিক বিশ্লেষণের মানসিকতা মধ্যযুগে একটি কৃত্রিমতার স্তরে এসে ঠেকেছিল।

অতি প্রাচীন কাল থেকেই যোগের উদ্ভব হয়েছিল চেতনার ক্রমবিকাশকে সুস্থ ও সবল করে তোলার প্রয়োজনে। অনেকে যদিও উপনিষদের যুগ থেকেই যৌগিক পদ্ধতির উদ্ভব বলে মনে করতে চান। বস্তুতঃ সিন্ধু সভ্যতার ভাস্কর্যশৈলির দিকে নজর গেলে তারা অবশ্যই ভাবতে বাধ্য হবেন যে, উপনিষদের বহু পূর্বেই এর উদ্ভব। যোগের প্রয়োজন বিক্ষিপ্ত চিত্তবৃত্তিকে নিরোধ করার জন্য। বিস্তৃত উদার প্রাকৃতিক পরিবেশ, যেখানে আর্যরা তাদের জীবন শুরু করেছিলেন সেখানে চিত্তবৃত্তিকে শাসন করার তেমন প্রয়োজন ছিল না যতটা এর প্রয়োজন অনুভূত হবার কথা শহরজীবনে। হরপ্পার নগরকেন্দ্রিক সভ্যতায় মানুষকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে নিয়ে বসার যে প্রয়োজন ছিল—বেদের প্রাকৃতিক জীবনে তার তেমন প্রয়োজন ছিল না।

প্রকৃতির নিবিড় ছায়াপাত সেখানে মানুষকে স্বতই আত্মস্থ করে দিতে পারত। সেইজন্য ক্ষিপ্ত চিত্তবৃত্তিকে রুদ্ধ করার জন্য সিন্ধুর নাগরিক জীবনেই যোগের প্রয়োজন বেশি ছিল বলে সেখানেই যৌগিক পদ্ধতির উদ্ভব ঘটেছিল। বহু পরিচিত পশুপতির কূর্মাসনে বসার ভঙ্গীই তা প্রমাণ করে দেয়। কূর্মাসনে যৌনবৃত্তি দমনের জন্য যেখানে পায়ের গোড়ালি রাখার ব্যবস্থা আছে তা রীতিমত নাড়িজ্ঞানের পরিচয়জ্ঞাপক। আর তার গভীরতর অর্থ এই যে, অন্তরের ভিতর অসীমের সাক্ষাৎ পেতে হলে কূর্মেরই মত প্রবৃত্তির হাতপাগুলি গুটিয়ে নিয়ে তবে বসতে হবে। কূর্মাসনের তৃতীয় বোধ এই যে, কুলকুণ্ডলিনী জাগরণে প্রথম দিকে দেহ যে ভাবে দোলে কূর্মপৃষ্ঠে আরোহণকারি ব্যক্তিরই শুধু সেই ভাবে দোলা সম্ভব। এ বোধ তো যোগ যিনি করেননি তার আসবে না। বিহঙ্গম যোগ বলতে যে যোগের কথা বলা হয়—তার অর্থ সাধারণ মানুষের কাছে কখনই স্পষ্ট হবে না, যদি না তাঁরা অন্তরে ডুব দিয়ে মানস-চেতনা উড্ডীয়মান পাখিরই মত ঘুরে ঘুরে উপরে উঠছে এমন বোধ করেন। সুতরাং পশুপতির সীলমোহরের গুরুত্বকে কখনই বাস্তব চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে সমালোচকরা উপলব্ধি করতে পারবেন না।

সিন্ধু অঞ্চলে শুধু যে কূর্মাসনে উপবিষ্ট ব্যক্তিরই সন্ধান পাওয়া যায়, তাই নয়। সিদ্ধাসনে বসার মূর্তিও লক্ষণীয়। এবং যে ত্রিপত্রবৃক্ষের নিচে পশুপতির আসন লক্ষ্য করা যায় তা আরও অধ্যাত্মচেতনার ইঙ্গিতবহ। ঋগ্বৈদিক ঋষি, ঔপনিষদিক ঋষি, যোগী, মায় গৌতমবুদ্ধকে পর্যন্ত দেখা যায়—অশ্বত্থবৃক্ষনিম্নে ধ্যানমগ্ন। এটাও প্রমাণ করে যে ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনা কখনও প্রাগৈতিহাসিক হরপ্পা সভ্যতার সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত নয়। সিন্ধুর ধারা হপ্তহিন্দু বা সপ্ত সিন্ধুতে নিশ্চয়ই এসেছিল একথা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে। বলা যেতে পারে যোগ ঋগ্বেদে অঙ্কুরাবস্থায় নয় প্রাগবৈদিক ভারত থেকে উত্তরাধিকারের মধ্য দিয়েই এসেছিল। ঋগ্বৈদিক ঋষিদের যোগজ্ঞান পূর্ণমাত্রায় ছিল।

যোগ কিছুসংখ্যক বর্বর বাস্তববাদীদের কাছে হেঁয়ালি হলেও আধুনিক বিশ্ব স্নায়বিক স্বাস্থ্য ও মানস স্বাস্থ্য নিয়ন্ত্রণে এর অপরিসীম গুরুত্বের কথা নির্দ্বিধায় স্বীকার করে।

যোগের মূল উৎস প্রকৃতি, প্রাকৃত জীব। পশুপাখির জীবনযাপনের ভঙ্গী দেখেই নানা যোগের সূত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। আত্মস্থ হয়ে মানুষ আরো বহুবিধ যৌগিক গোপন তথ্য আবিষ্কার করেছে। আধুনিক সভ্যতা যদি না সম্পূর্ণভাবে অন্তরদেবতার পায়ে নিজেকে উৎসর্গ করে, যোগের গূঢ় তাৎপর্য বুঝতে পারবে না। আধুনিক সভ্যতা যোগের দান নয়। আন্তর সমন্বয়ের প্রভাব তার উপর নেই, বরং আছে অভ্যন্তরে মানুষের যে শতধা বিভক্ত অবস্থা তারই বহিঃপ্রকাশ। সেই জন্যই আধুনিক মানুষ যোগের তাৎপর্য তেমন করে বুঝতে পারে না।

যোগ ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে মানুষের যে আত্মিক উন্নতি হয়েছিল আধুনিক

মানুষ তা থেকে বহু দূরে। যান্ত্রিকতা ও বস্তুবিজ্ঞানের মধ্য দিয়ে যে মনুষ্য সভ্যতার বিকাশ, সে সভ্যতায় যোগলব্ধ মানসিক উপলব্ধি অনুভব করার মত অবস্থা নেই। যোগীরা বলেন যোগপদ্ধতির প্রচারক ঈশ্বর স্বয়ং। তিনিই হলেন মহাবৈশ্বিক গুরু। 'ওঁ' শব্দের মধ্য দিয়েই তার প্রকাশ। এই ওঁ বা অ-উ-ম-এর মধ্য দিয়ে বিশ্বজগতের আবির্ভাব। খ্রীষ্টানদের কথা মত—'word made flesh. বস্তুজগতের উদ্ভব শব্দ থেকেই। শব্দ ব্রহ্মণ। Big Bang-এর সময় যে প্রচণ্ড শব্দ হয়েছিল তাই 'ওঁ'—অ-উ-ম। সেই শব্দতরঙ্গ থেকেই অণুপরমাণুর সৃষ্টি। এই অণুপরমাণু আর কিছুই নয় শব্দের নানা তরঙ্গ মাত্র। একমাত্রীয় এক তারের মধ্যে ছোটবড় ঢেউ। সাধারণের যে ধারণা আছে অণু বিলিয়ার্ড বলের স্বতন্ত্র অস্তিত্বিক চরিত্রে বিরাজমান, তা নয়। বস্তুত একমাত্রীয় এই তারের ঢেউয়ে কোন বস্তুর অস্তিত্বই নেই। এই জন্যই বৈজ্ঞানিকেরা বলেছেন অণু হোল শূন্যদেশ মাত্র। বস্তু 'কিছু-না' দিয়ে তৈরি।[১] মহাশূন্যতায় একমাত্রীয় কোন কিছু যদি থেকে থাকে—তাহলে তাতে এগুলি ফুটে ওঠা ঢেউয়ের মত। এই ঢেউও শুধু চিন্তার মধ্যেই আছে, বাস্তবে তার অস্তিত্ব ধরা যায় না। সেই জন্য অণু হল একটি সম্ভাব্যতা মাত্র।[২] কোয়াণ্টাম ফিজিক্স-এ এই শব্দজাত ঢেউকেই অণুপরমাণুর সঙ্গে যোগ করে বস্তুসত্তা উদয়ের কল্পনা করা হয়েছে।[৩] এই তরঙ্গ থেকেই জগতের সৃষ্টি। বিজ্ঞানের ভাষায় সমুদ্রের বুকে ঢেউয়ের মত কোয়াণ্টাম ফ্লাকচুয়েশনের ঢেউয়ের চূড়া ও অবতল আছে। ঢেউয়ের কোয়াণ্টাম প্রভাবে ঘনাবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। ঠিক পরমুহূর্তেই জগতের স্ফীতি এই ফ্লাকচুয়েশনকে বাইরে নিয়ে এসে ছায়াপন্থীয় কাঠামো তৈরি করে।[৪] সেই জন্য নিখিল মহাদেশের কেন্দ্র থেকে যে বিস্ফোরণের শব্দ হয়—'ওঁ'—তা থেকেই জগৎ এসেছে বলে যোগে 'ওঁ' ঈশ্বরতুল্য। 'ওঁ'-এর মধ্যে নাস্তি থেকে অস্তি সবই রয়েছে।

১ Atoms are mainly empty space. Matter is composed chiefly of nothing.—Cosmos, Carl Sagan p. 180.

২ …atomic phenomenon can only be described in terms of probabilities.—Tao of Physics—Fritjof Capra, p. 138.

৩ In quantum theory these forms are used again to describe the waves associated with particles—Tao of physics—Fritjof Capra, p. 138.

৪ Like waves bounding upon the surface of the sea, these quantum fluctuations would have peaks and troughs. The peaks created by the quantum effects could easily produce density variations ; an instant later inflation would stretch these fluctuations out enough to sow galactic structures—Masters of Time John Boslough, p. 69.

আদিতে ওঁ-এর শব্দ পরা শব্দ, যা সর্বব্যাপ্তির সঙ্গে একাত্ম। বিস্ফোরণে ফুটে উঠে তা তৈরি করে জ্যোতি। তার পর তরঙ্গ। তারপর তরঙ্গাকারে অণু-পরমাণুর সংমিশ্রণে স্থূল জগৎ। যোগে এই জন্য 'ওঁ'-এর এই চার পর্যায়কে বলা হয়েছে পরা, পশ্যন্তি, মধ্যমা, বৈখরি। আদি সর্বাত্মক ব্যাপ্ত শব্দ পরা শব্দ। বিস্ফোরণে এ প্রথমটা শ্রুত নয়, দৃষ্ট। সেই জন্য পশ্যন্তি শব্দ। পরে এই বিস্ফোরণের বেগ তরঙ্গাকার অদৃশ্য অণুপরমাণুরূপে সূক্ষ্মাবস্থায় অগ্রসরমান বলে মধ্যম অবস্থা প্রাপ্ত মধ্যমা। শেষে তরঙ্গের পারস্পরিক যোগে দৃষ্ট ও শ্রুত—বৈখরি।[৫] যোগে এই জন্য 'ওঁ-কে ঈশ্বরের ইঙ্গিতবহ করে দেখানো হয়েছে। অতি আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক যাঁরা তাঁরা হয়তো বর্তমানে যোগদর্শনের মূল্য বুঝতে পারবেন, কিন্তু যাঁরা ঊনবিংশ শতকের বিজ্ঞানের ত্রিমাত্রিক আদর্শ নিয়ে রয়েছেন তাঁরা বুঝবেন না।

বেদ প্রকাশকেরা বলেন—এই 'ওঁ' শব্দই বেদের উৎস, সংস্কৃত বর্ণসমূহের উৎস। 'ওঁ' ৫১টি তরঙ্গে অণুপরমাণুর সম্ভাব্য অস্তিত্ব তৈরি করেছিল। সেই অণুগুলিই জগৎ সৃষ্টির মৌল উপাদান—building blocks. এই জন্য সমগ্র জগৎকে শব্দে প্রকাশ করার জন্য বৈদিক ঋষিরা ৫১টি তরঙ্গের প্রতীক হিসেবে একান্নটি বর্ণ তৈরি করেছিলেন। বিশ্ব যতদিন আছে, স্ফীতমান হচ্ছে। এই একান্নটি (আদি অবস্থা বাদে) তরঙ্গের পারস্পরিক সম্পর্কে অসীম ভাব প্রকাশের ক্ষমতাও তার রয়ে গেছে।

ভারতে যখন দার্শনিক চিন্তার সূত্রপাত সেই ভারতীয় সভ্যতার মধ্যপর্বে এদেশে যে ষড়দর্শনের সৃষ্টি হয়, যোগ সেইজন্য সেখানে একটি দর্শন হিসেবে স্থান পায়। এই যোগ দর্শনের রচয়িতা ঋষি পতঞ্জলি। কিন্তু পতঞ্জলি এ দাবি করেননি যে, যোগের তিনিই উদ্গাতা। যোগের উদ্ভব যে তাঁর পূর্বে একথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। তিনি তাঁর পূর্বে প্রতর্দণের উল্লেখ করেছেন। এ জন্য একে প্রতর্দণ বিদ্যাও বলা হয়। সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, পূর্বমীমাংসা, উত্তরমীমাংসা—এই ছয়টি দর্শন ভারতীয় দার্শনিক মানসিকতাকে পরিস্ফুট করলেও বেদকে কেউই অস্বীকার করেননি। সুতরাং বেদের মধ্যেই যে তাঁদের তত্ত্বের রহস্য নিহিত ছিল একথা অনস্বীকার্য। যোগও এই বৈদিক পদ্ধতিই। যদিও এর শেকড় আরো অতীতে বিস্তৃত। এই যোগ সম্পর্কে জ্ঞাত হলে ঋগ্বেদের সূক্তগুলির অর্থ আরও স্পষ্ট হবে। যোগের সঙ্গে কপিলের সাংখ্য দর্শনের যোগাযোগ অত্যন্ত নিবিড়। ঋগ্বেদেও এই কপিল ঋষির উল্লেখ রয়েছে। যেমন,—

"দশানামেকং কপিলং সমানং তং হিন্বন্তি ক্রতবে পার্যায়।
গর্ভং মাতা সুধিতং বক্ষণাস্ববেনন্তং তুষয়ন্তী বিভর্তি ॥"১৬

---

৫ পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা জানার জন্য লেখকের দিব্য জগৎ ও দৈবী-ভাষা গ্রন্থের ২য় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

অর্থাৎ দশজনের মধ্যে সর্বাঙ্গে কপিল বর্ণধারী একজন রয়েছেন, যাকে ক্রতুসাধনের জন্য প্রেরণ করা হল। মাতা সন্তুষ্ট হয়ে জলের মধ্যে গর্ভাধান গ্রহণ করলেন। ১৬ (ঋক্ ১০/২৭/১৬)

ঋগ্বেদের সঙ্গে কপিলের যদি সম্পর্ক থাকতে পারে তবে যোগের থাকবে না এমন ভাবা যায় না। ভারতীয় দর্শনে সাংখ্য ও যোগের প্রভাব যে অন্য সকল দর্শনের মধ্যেই রয়েছে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

তবে বেদান্ত সাংখ্য-যোগ পদ্ধতির বিরুদ্ধতা করেছে। বেদান্তের ধারণা বেদের যথার্থ ব্যাখ্যা বেদান্ত দর্শনই করতে পেরেছে। বিশেষ করে উপনিষদ সম্পর্কে তার দাবি স্বৈরাচারী শাসকের মত। উপনিষদকেই অনেকে মনে করেন বৈদিক জ্ঞানের চূড়ান্ত সিদ্ধি। সাংখ্য ও যোগদর্শনও অবশ্য উপনিষদের যথার্থ ব্যাখ্যা দিয়েছে বলে দাবি করে। সাংখ্য-যোগ-এর সঙ্গে বেদান্তের এই মতভেদের জন্য অনেকে মনে করেন যোগ অবৈদিক। কারো কারো মতে প্রাকবৈদিক শৈব সম্প্রদায়জাত। এর উৎস সিন্ধু উপত্যকা। বেদান্ত সম্পর্কে তাঁদের ধারণা বেদান্ত পরবর্তী আর্যরা উত্তর ভারতে সৃষ্টি করেছিলেন।

মধ্য ভারতের চুলচেরা বিশ্লেষণে স্পষ্টভাবে ভারতবর্ষকে, অর্থাৎ প্রাচীন ভারতকে জানা যাবে না। শঙ্করের কথাই ধরা যাক,—যিনি বেদান্তদর্শনের কট্টর সমর্থক ছিলেন, যিনি সাংখ্য-যোগ দর্শনকে অস্বীকার করেছেন, তাঁর জন্মক্ষেত্র দক্ষিণ ভারত। তিনি শৈব ছিলেন। স্বভাবতই মনে হয় দক্ষিণ ভারতীয় দ্রাবিড় বংশোদ্ভূত। শঙ্করের মত বেদান্ত ভাষ্যকার রামানুজও দক্ষিণ-ভারত থেকে এসেছিলেন। পরবর্তীকালের এই দার্শনিক তর্কবিতর্ক থেকে প্রাচীন ভারতীয় মানসিকতা খুঁজে পাবার চেষ্টা খুব যে সফল প্রচেষ্টা তা মনে হয় না। খ্রীষ্টানরা যেমন সেণ্ট টমাস, একুইনাস ও অন্যান্য মধ্যযুগীয় খ্রীষ্টান দার্শনিকদের দর্শন থেকে আদি পর্যায়ের খ্রীষ্টধর্মকে বিচার করতে যাবেন না, ভারতবর্ষেও তেমনি পরবর্তী দর্শনশাস্ত্র ধরে আদি ভারতীয় অধ্যাত্ম চিন্তার স্বরূপ খুঁজে পাবার চেষ্টা ফলবতী হতে পারে না।

দার্শনিক মতভেদ যাই থাক না কেন বেদান্ত সাংখ্য দর্শনের বিশ্ব-বিজ্ঞান গ্রহণ না করে পারেনি। যোগকেও বেদান্ত অস্বীকার করেনি। যোগ অভ্যাস করা উচিত নয় এমন কথা বেদান্ত কখনও বলেনি। পার্থক্য যেটা সেটা শুধু চূড়ান্ত সত্যের রূপ কি তাই নিয়ে। পুরুষ এক না বহু এই নিয়ে মতদ্বৈধ। এ ছাড়া প্রায় সব ক্ষেত্রেই তো সহমত দেখা যাচ্ছে। বেদের দিকে সবাই তাকিয়েছেন। সাংখ্য ও যোগ তো স্পষ্টই বলেছে বেদান্ত তাদের উৎস। কেউ নিজেদের কখনও অবৈদিক বা তাদের উৎস প্রাগবৈদিক এমন বলেননি।

শ্রীমদ্ভগবদগীতাতে সাংখ্য, যোগ ও বেদান্ত দর্শনের উল্লেখ রয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে সাংখ্য, যোগ ও বেদান্তকে একই সত্যের বিভিন্ন দিক বলে উল্লেখ করেছেন। একটির জন্য অপরটিকে তিনি কখনও অস্বীকার করেননি। যদি এই তিনটি দর্শনের মধ্যে কোন বিরোধ দেখা দিয়ে থাকে তবে

তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরে। বিরোধ দেখা দিয়েছে দার্শনিক যুগে। মধ্যযুগে ভারতে দার্শনিক তত্ত্ব নিয়ে বিভিন্ন দলের মধ্যে তর্কবিতর্ক হত। এই বিরোধ যে শুধু হিন্দুদের মধ্যে ছিল তা নয়, বৌদ্ধদের মধ্যেও দেখা দিয়েছিল। এজন্য কেউ বৌদ্ধদের বিভিন্ন বিশ্বাসের ধারাকে ভিন্ন ভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর বলে সিদ্ধান্ত নেবেন না।

দর্শনের দিক থেকে যোগ ধ্রুপদী দর্শনের অঙ্গীভূত। ব্যবহারিক দিক থেকে অধ্যাত্ম মানসিকতা বিকাশের সহায়। যোগ ব্যবহারিক দিক থেকে যোগদর্শনের অনেক আগের ব্যাপার। ধ্রুপদী দর্শন বলতে যা বুঝি, ভারতে তা হল অতীত ঐতিহ্যের নবরূপায়ণ। বৈদিক সাহিত্যে গৌতমবুদ্ধের অনেক আগে যোগের উল্লেখ রয়েছে। গৌতমবুদ্ধ নিজেও রাজগৃহে দু'জন সাংখ্য গুরুর কাছে দর্শন শিক্ষা করেছিলেন।

যোগের উল্লেখ ভগবদ্গীতা ও কঠ, শ্বেতাশ্বতর প্রভৃতি উপনিষদেও আছে। ঋগ্বেদের বহু প্রতীকের মধ্যে যোগের উপস্থিতি অস্বীকার করা যায় না। বেদান্ত ও সাংখ্য-যোগদর্শনের পার্থক্য কলিযুগেই প্রস্ফুটিত হয়েছে। যোগ ও সাংখ্যের ভিত্তি প্রাচীন বেদান্তিক গ্রন্থসমূহ।

বৈদিক সাহিত্যে কখন যোগ এসে অনুপ্রবেশ করেছে দেখা যাক। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ এ ব্যাপারে একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। এখানে যোগ-অভ্যাস সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে বলা হয়েছে। যেমন এই উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখা যায় আরম্ভ হচ্ছে এই ভাবে ঃ

"যুঞ্জানঃ প্রথমং মনস্তত্ত্বায় সবিতা ধিয়ঃ।
অগ্নিং জ্যোতির্নিচায্য পৃথিব্যা অধ্যাভরত ॥"১

অর্থাৎ কি ভাবে ধ্যান করতে হয় এখন তাই বলা হচ্ছে। যখন ধ্যান করবে তখন ব্রহ্মতত্ত্বনির্ণয়ে বিরত থেকে একাগ্র মনে বাহ্য বিষয় থেকে চিত্তকে নিবৃত্ত করে পরমাত্মাতে মনঃসংযোগপূর্বক সূর্যদেবের উপাসনা করবে। মনে রাখতে হবে, এই সূর্য বেদ কিংবা উপনিষদ্ কোথাও আমাদের নিত্য দৃষ্টিগোচর সূর্য নয়। এই সূর্য আন্তর্জ্যোতি। যাঁরা যোগ করেন তাঁরাই এই আন্তর্জ্যোতির স্বরূপ জানেন। তাঁরা জানেন যে, আন্তর্জ্যোতি কত ভাস্বর। তন্ত্রে এই আন্তর্জ্যোতির তীব্রতাকে বলা হয়েছে 'কোটীসূর্যবিভাসিতম্'। এই জ্যোতির উৎস 'বিন্দু' ধ্যান করতে করতেই এই জ্যোতির সাক্ষাৎ মেলে। সেই জন্যই বলা হয়েছে 'এই আদিত্যদেব সেই পরাৎপর পরমাত্মার তেজরূপ বহ্নিদর্শন পূর্বক এই ব্রহ্মাণ্ডে তেজ বিতরণ করেন না। করেন সৌরমণ্ডলে। তবে এই সূর্য কে? তিনি জ্যোতিস্বরূপ বিন্দু যার উৎস পরব্রহ্মণ বা পরমাত্মন। বিজ্ঞানে একেই এখন Singularity বলবার চেষ্টা হচ্ছে। ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণাদি অধিদেবগণ সেই পরব্রহ্মের মাহাত্ম্য প্রভাবে স্ব স্ব আধিপত্য প্রকাশ করছেন। যে সকল অলৌকিক কার্যকে দেবকৃত বলে মনে হয় তা সবই সেই পরমপুরুষ পরব্রহ্মের মহিমা ছাড়া আর কারো মাহাত্ম্যের ফল নয়। (শ্বেত, ২/১)

"যুক্তেন মনসা বয়ং দেবস্য সবিতুঃ সবে।
সুবর্গেয়ায় শক্ত্যে ॥"২

অর্থাৎ যখন আমরা ব্রহ্মতত্ত্ব নির্ণয়ের জন্য মনঃসংযোগ করে সদ্‌গুরুর প্রসাদে দেহ সুস্থ করি তখন স্বর্গলাভের নিদান পরমাত্মধ্যানে যথাশক্তি প্রয়াস পাই। এইভাবে দৃঢ়সংকল্প হয়ে সেই আত্মতত্ত্ব চিন্তা করলে পরম আনন্দ লাভ হয়।

"যুক্তায় মনসা দেবান্‌ সুবর্যতো ধিয়া দিবম।
বৃহজ্জ্যোতিঃ করিষ্যতঃ সবিতা প্রসুবাতি তান্‌।"৩

অর্থাৎ যখন ধ্যান করবে তখন সূর্যদেবের কাছে এই প্রার্থনা করতে হয়ঃ হে দিনকর, আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রামকে স্ব স্ব বিষয় থেকে নিবৃত্ত করে ব্রহ্মতত্ত্বানুসন্ধানে নিযুক্ত করুন। আমাদের নয়ন সামান্য রূপ দর্শনের জন্য ব্যাগ্র না হয়ে ব্রহ্মরূপ দর্শনে নিযুক্ত হোক। কর্ণ সামান্য কথা না শুনে ব্রহ্মসঙ্গীত শ্রবণ করুক। জিহ্বা অসৎকথা পরিত্যাগ করে ব্রহ্মতত্ত্ব কীর্তন করুক। জিহ্বা চর্বচোষ্যাদি রসবোধ থেকে ক্ষান্ত হয়ে ব্রহ্মতত্ত্ব রসাস্বাদে নিযুক্ত থাকুক। এইভাবে ইন্দ্রিয়সমূহ ব্রহ্মতত্ত্বসাধনে নিরত হোক। ব্রহ্মজ্যোতিতে আলো লাভ করে আমরা যাতে অতুল আনন্দ বোধ করতে পারে আপনি তাই করুন।

"যুঞ্জতে মন উত যুঞ্জতে ধিয়ো বিপ্রা বিপ্রস্য বৃহতো বিপশ্চিতঃ।
বি হোত্রা দধে বয়না বিদেক ইন্‌ মহো দেবস্য সবিতুঃ পরিষ্টুতি ॥"৪

অর্থাৎ বিপ্রগণ নেত্র, কর্ণ, নাসিকা, রসনা ও ত্বক এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে মনঃসংযোগ করে ব্রহ্মময় সূর্যদেবের জ্যোতিঃ চিন্তা করবেন। এমন কালেই সর্বদর্শী সর্ববৃহৎ সূর্যদেবের যথেষ্ট স্তব করা হয় (এই সর্বদর্শী সর্ববৃহৎ সূর্য ব্রহ্মজ্যোতি)। যে সকল ব্রাহ্মণ ইন্দ্রিয়দিগকে বিষয় থেকে নিবৃত্ত করে হোমাদি ক্রিয়া দ্বারা সেই পরমাত্মার স্তুতি করেন তাঁরা পরিণামে প্রকৃত ফলের অধিকারী হন।

"যুজে বা ব্রহ্ম পূর্ব্বং নমোভির্বিশ্লোকা যন্তি পথ্যেব সূরাঃ।
শৃণ্বন্তি বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা-আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ ॥"৫

অর্থাৎ হে মানবগণ তোমরা কারণস্বরূপ পরব্রহ্মে আসক্ত হও—অর্থাৎ প্রাণায়ামাদি দ্বারা ব্রহ্মে মন নিযুক্ত কর। সেই পরাৎপর পরব্রহ্মে চিত্ত নিবেশ করলে আমাদের অতুল কীর্তি আবহমানকাল স্থায়ী হবে। ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ ইত্যাদি সুরবৃন্দ সেই জগৎনিয়ন্তা জগদীশ্বরের পুত্র। তাঁহারা সেই প্রভুর মাহাত্ম্য প্রসাদেই সুরপুরে নিজ নিজ আধিপত্য করছেন।

"অগ্নিযত্রাভিমথ্যতে বায়ুর্যত্রাভিযুঞ্জতে।
সোমো যত্রাতিরিচ্যতে তত্র সঞ্জায়তে মনঃ ॥"৬

অর্থাৎ সূর্যের কাছে যে ভাবে প্রার্থনা করতে হয়, যেভাবে উপাসনা করতে হয় তা এর আগে বলা হয়েছে। কামনার বশবর্তী হয়ে যারা যোগসাধনা করে তাদেরও সেই কর্মের ফলে ভোগলাভ হয়। সুতরাং বহ্নি যে কাজে মন্থন ভরণাদি করেন, পবন যাতে পবিত্রীভূত হয়ে শব্দ প্রয়োগের আনুকূল্য করেন,

এবং চন্দ্র যে কাজের পরিপূর্ণতা দান করেন সেই সেই কর্মে অর্থাৎ অগ্নিষ্টোমাদি স্বর্গসাধন কার্যে চিত্ত নিবদ্ধ করা ভাল। যজ্ঞ, দান, তপস্যা, প্রাণায়াম ইত্যাদি দ্বারা চিত্তশুদ্ধি ঘটলেই পূর্ণানন্দঃ অদ্বিতীয় ব্রহ্মজ্ঞান দেখা দেয়। কিন্তু কর্ম দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ না করলে কখনও তত্ত্বজ্ঞানের সম্ভাবনা নেই।

"সবিত্রা প্রসবেন জুষেত ব্রহ্ম পূর্ব্বম্।
তন্ত্র যোনিং কৃণবসে ন হি তে পূর্ব্বমক্ষিপৎ ॥"৭

অর্থাৎ যে ভাবে আদিত্যরূপী ব্রহ্মের আরাধনা করতে হয় তা বলা হল। ঐ পদ্ধতিতে ব্রহ্মারাধনাতে অনুরক্ত হও। তদ্রূপ উপাসনাতে ভোগ হেতু স্মৃতিবিহিত ও শ্রুতিবিবর্তি ক্রিয়াকাণ্ড বন্ধন করতে পারে না। তেজোময় ব্রহ্ম-ধ্যান দ্বারা জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে ক্রিয়াকাণ্ডকে ভস্মীভূত করে ফেলে।

"নিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরং হৃদীন্দ্রিয়াণি মনসা সন্নিবেশ্য।
ব্রহ্মোড়ুপেন প্রতরেত বিদ্বান স্রোতাংসি সর্ব্বাণি ভয়াবহানি ॥"৮

অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্বকামী মনীষীরা বক্ষপ্রদেশ, গলদেশ ও শীর্ষপ্রদেশ উন্নত করে দেহকে ঋজুভাবে রেখে বসবেন, ইন্দ্রিয় সমূহকে হৃদয়ে স্থাপন করে সৎগুরুর কাছ থেকে লাভ করা ব্রহ্মতত্ত্ব চিন্তা করবেন। এই ধরনের চিন্তার ফলে ব্রহ্মাক্ষর স্বরূপ প্রাণরূপ ভেলা দ্বারা ভীতিসঙ্কুল সংসারস্রোত লঙ্ঘন করে পার হতে পারেন। প্রাণায়ামের ফল এই যে নৈসর্গিক অবিদ্যাজনিত সংসার মায়া দূর হয় এবং ব্রহ্মজ্ঞানের বিকাশ হয়।

"প্রাপান্ প্রপীড্যেহ সংযুক্তচেষ্টঃ ক্ষীণপ্রাণে নাসিকয়োচ্ছ্বাসীতুঃ।
দুষ্টাশবযুক্তমিব বাহমেনং বিদ্বান্ মনো ধারয়েতা প্রমত্তঃ ॥"৯

অর্থাৎ প্রাণায়ামের প্রণালী কি, এখন তাই বলা হচ্ছে। সুধীব্যক্তি অপ্রমত্ত হয়ে প্রথমতঃ প্রাণবায়ু সংযম করবে। এর পর অন্যান্য চেষ্টা বাদ দিয়ে প্রাণবায়ু ক্ষীণ হলে নাসাপুট দ্বারা শনৈঃ শনৈঃ বায়ু ত্যাগ করবে। এইভাবে ক্রমে ক্রমে অভ্যাস করে বায়ু ধারণ করলে চিত্ত নিশ্চল ভাবে অবস্থান করে। চিত্ত বহির্বিষয় থেকে নিবৃত্ত হয়ে নিশ্চল ভাব ধারণ করলে তখন সেই চিত্ত একমাত্র ব্রহ্মানুসন্ধানে আসক্ত হয়।

"সমশুচৌ শর্করাবহ্নি বালুকা বিবর্জ্জিত শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ।
মনোহনুকূলে ন তু চক্ষুপীড়নে গুহানিবাতাশ্রবণে প্রযোজয়েৎ ॥"১০

অর্থাৎ কি ভাবে ব্রহ্মচিন্তা করতে হয় এখন তা বলা হচ্ছে। সাধক প্রথমতঃ একটি গুহস্থলে আশ্রয় করবেন। ঐ স্থান বিশুদ্ধ, সমতল, প্রস্তর, অগ্নি ও বালুকারহিত, নিঃশব্দ জলাদি উপভোগ দ্রব্যশূন্য ও নির্বাত হবে। সেই স্থানে আসনে বসে নিজের ইচ্ছা অনুসারে নেত্রাদি ইন্দ্রিয়সমূহকে নিজ নিজ বিষয় থেকে নিবৃত্ত করবে এবং পরব্রহ্মে চিত্ত সংযোগ করতে হবে। যেখানে ধ্যানের কোনপ্রকার বিঘ্ন হবার সম্ভাবনা নেই, সংসারমায়া উপস্থিত হয়ে ধ্যানের বিঘ্ন ঘটাতে পারবে না, ধ্যানের জন্য সে সকল স্থানই মনোনীত করা কর্তব্য।

"নীহার ধূমার্কানিলানলানাং খদ্যোতবিদ্যুৎস্ফাটিক শশিনাম।
এতানি রূপানি পুঃরসরাণি ব্রহ্মণ্যভিব্যক্তি করাণি যোগে ॥"১১

অর্থাৎ "যোগ অভ্যাস করলে সে সকল চিহ্ন প্রকাশিত হয় তা বলা হচ্ছে। যাঁরা ব্রহ্মচিন্তায় নিরত থেকে তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হন, তাঁদের চিত্তবৃত্তি নীহারবৎ বিমলতা ধারণ করে। পরে ধূম্রবৎ আভা পরিলক্ষিত হয়। এর পরে সূর্যপ্রতিবিম্ববৎ তেজপুঞ্জ লক্ষ্য করা যায়। অবশেষে অগ্নির ন্যায় দীপ্যমান, যেন অতি উষ্ণ বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে এমন বোধ হয়। কখনও কখনও বোধ হয় যেন আকাশে জোনাকি ছড়িয়ে রয়েছে। কখনও তড়িৎ ছটাবৎ আলোর মালা দেখা যায়। আবার কখনও স্ফটিকের মত আভা দেখতে পাওয়া যায়। কখনও এমন মনে হয়, যেন পুরো ভাগে পূর্ণচন্দ্র উদিত হয়ে আলো ছড়াচ্ছে। এসবই ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্বরূপ। এ সকল লক্ষণ দেখা দিলেই যোগাভ্যাস সফল হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়।"

"পৃথ্বপ্‌তেজোঽনিলখে সমুত্থিতে পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্তে।
ন তস্য রোগো, ন জরা ন দুঃখং প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরম ॥"১২

অর্থাৎ "যখন পৃথিবী, অপ্‌, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভৌতিক যোগজ্ঞান হয় অর্থাৎ পৃথিবী থেকে গন্ধ, জল থেকে রস, তেজ থেকে রূপ, বায়ু থেকে শ্রুতিশক্তি ও আকাশ থেকে শব্দ এই সকল পঞ্চভূতের গুণজ্ঞান জন্মে তখন সাধকের দেহের যাবতীয় দোষ যোগাগ্নি দ্বারা ভস্মীভূত হয়ে যায়। রোগজরাদি দুঃখপরম্পরা তাকে কষ্ট দিতে পারে না। উক্ত যোগদ্বারাই জরামরণাদিশূন্য হয়ে অনন্তকাল নিত্য সুখের অধিকার পেয়ে থাকে।"

"লঘুত্বমারোগ্যমলোলুপত্বং বর্ণপ্রসাদাঃ স্বরসৌষ্ঠবঞ্চ।
গন্ধঃ শুভো মূত্রপুরীষমল্পং যোগ প্রবৃত্তিং প্রথমাং বদন্তি ॥"১৩

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি যোগে প্রবৃত্ত হন, তাঁর দেহ নিরন্তর লঘুভাব ধারণ করে। তাঁর শরীরে অনুক্ষণ আরোগ্য বিরাজ করে। কোন বিষয়ে কোনরকম বাসনা জন্মে না। বর্ণ সমুজ্জ্বল ও কণ্ঠস্বরের গাম্ভীর্য বৃদ্ধি পায়। নিরন্তর শুভ গন্ধ নাকে আসে। ক্রমে ক্রমে মলমূত্রাদির লাঘব হয়। তত্ত্বদর্শী মনীষীরা এ সকলকে যোগ প্রবৃত্তির প্রথম চিহ্ন বলে উল্লেখ করেন। যাঁদের দেহে পূর্বোক্ত লক্ষণগুলি দেখা যায় তাঁরাই প্রকৃত নিত্য সুখ ভোগ করতে পারেন। তাঁরাই জীবনমুক্ত বলে অভিহিত হন।"

"যথৈব বিম্বং মৃদয়োপলিপ্তং তেজোময়ং ভ্রাজতে তৎ সুধান্তম্‌।
তদ্‌বাত্মতত্ত্বং প্রসমীক্ষ্য দেহী একঃ কৃতার্থো ভবতে বীতশোকঃ ॥"১৪

অর্থাৎ "যদি স্বর্ণরৌপ্যাদি মৃত্তিকাদি দ্বারা লিপ্ত হয় তবে যেমন তাদের যথার্থ দীপ্তি প্রকাশ পায় না, কিন্তু অগ্নিদ্বারা তপ্ত হলে বা জলধৌত হলে স্বাভাবিক তেজ প্রকাশিত হয়—তেমনই ব্রহ্মতত্ত্ব অনুসন্ধান প্রভাবে মানুষ আত্মাকে সমুজ্জ্বল করে মানবজন্ম সার্থক করেন এবং যাবতীয় শোকতাপ অতিক্রম করে মোক্ষে পদার্পণ করতে সমর্থ হন।"

যদাত্মতত্ত্বেন তু ব্রহ্মতত্ত্বং দীপোপমেনেহ যুক্তং প্রপশ্যেৎ।
অজং ধ্রুবং সর্ব্বতত্ত্বৈর্বিশুদ্ধং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈ॥"১৫

অর্থাৎ "যখন স্বীয় আত্মা সপ্রকাশ হয়ে ব্রহ্মতত্ত্ব পর্যবেক্ষণ করে (আমিই ব্রহ্ম এই ধরনের অভেদজ্ঞান জন্মে) তখন জীব অজ্ঞানতাজনিত সংসারমায়া বর্জিত সনাতন পরাৎপর অদ্বিতীয় পরব্রহ্মকে জেনে সংসারপাশ থেকে মুক্তিলাভ করতে সমর্থ হয়।"

"এষ হি দেবঃ প্রদিশোঽনুসর্ব্বাঃ পূর্ব্বো হি জাতঃ স উগর্ভে অন্তঃ।
স বিজাতঃ স জনিষ্যমানঃ প্রত্যঙ্‌জনাংস্তিষ্ঠতি সর্ব্বতোমুখঃ॥১৬

অর্থাৎ "সেই দেবাদিদেব পরমাত্মাকেই পূর্বাদিদিক্‌বিদিক্‌ স্বরূপ বলে জানবে। তিনিই ব্রহ্মাণ্ডের আদি, তিনিই পুনরায় শিশুরূপে জঠরে জন্ম-গ্রহণ করেন, তিনিই সকলের আদিপুরুষ, সর্বজীবেই তিনি বিরাজ করছেন এইভাবে নিজের আত্মাতে পরমাত্মা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে হয়।"

"যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধীষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ॥"১৭

অর্থাৎ "যোগসাধনার প্রয়োজনীয়তার কথা যেমন বলা হল নমস্কারাদিও তেমনই আবশ্যক। যিনি বহ্নিমধ্যে জ্যোতিরূপে, বারিগর্ভে শৈত্যরূপে এবং অখিল ব্রহ্মাণ্ডে প্রবিষ্ট হয়ে বিরাজমান আছেন, যাঁকে অবলম্বন করে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বিদ্যমান, শস্যমধ্যে যিনি সাররূপে ও তরুরাজিতে ফলরূপে বিদ্যমান সেই চরাচর কর্তা আদিনাথ পরমেশ্বরকে বার বার নমস্কার করি।"

যোগ শব্দের উৎস হল 'যুক্ত' যার অর্থ নানা ধরনের, যেমন, জোয়াল-বদ্ধ করা, বর্মদ্বারা সজ্জিত করা, কাজে লাগানো, সমন্বয়সাধন করা, সংগঠিত করা, ঐক্যতান করা ইত্যাদি। এর আরও যথার্থ উৎস হল 'যু' অর্থাৎ ঐক্যবদ্ধ করা ও পৃথক করা। এই জন্যই সমন্বয় সাধনের কথা এসেছে। 'যুজ' উৎস থেকে এসেছে বৈদিক ও সংস্কৃত সাহিত্যে এমন বহু শব্দ আছে। উপনিষদে বহু বাক্য আছে যা যোগের সঙ্গে যুক্ত। এই শব্দগুলি দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যায় ঐসব সাহিত্যের যুগে যোগ অভ্যাস রীতিমত প্রচলিত ছিল। এই শব্দ ও বাক্যগুলি এল কোথা থেকে? যোগ কি এযুগে নতুন কিছু? বাইরে থেকে বৈদিক সাহিত্যে ঢুকে পড়েছে? কিন্তু এর সঙ্গে যুক্ত করে যে-সব শব্দ ব্যবহার করা হচ্ছে তা সবই বৈদিক, যেমন—সবিতৃ, অগ্নি, বায়ু, সোম ইত্যাদি। এদের যেন আনুষ্ঠানিক কোন অর্থ নেই, বরং সবটাই যৌগিক। বাইরে থেকে ঢুকিয়ে দেওয়া এমন মনে হয়। এসব কাব্যে শব্দগুলির সঙ্গে যৌগিক ভাবনা যেন স্বতোৎসারিত।

উপরে উল্লেখিত প্রথম পাঁচটি সূক্ত যে নতুন তা নয়। যজুর্বেদের (১১. ১-৫) সমালোচনামূলক সংশোধন থেকে নেওয়া। এর সঙ্গেই উপনিষদ যুক্ত। উপরোক্ত কবিতাগুলির পঞ্চম ও চতুর্থ সূক্তদুটি সরাসরি ঋগ্বেদ থেকে এসেছে। যেমন, ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ত্রয়োদশ সূক্তির ১ম পংক্তিতে উপরোক্ত পঞ্চম সূক্তটির হুবহু উল্লেখ আছে ঃ

"যুজে বাং ব্রহ্ম পূর্ব্যং নমোভির্বি শ্লোক এতু পথ্যেব সূরেঃ।
শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ ॥"১

ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলের ৮১তম সূক্তের প্রথম শ্লোকে আছে ঃ—

"যুঞ্জতে মন উত যুঞ্জতে ধিয়ো বিপ্রা বিপ্রস্য বৃহতো বিপশ্চিতঃ।
বিহোত্রা দধে বয়ুনাবিদেক ইম্মহী দেবস্য সবিতুঃ পরিষ্টুতিঃ ॥"

একই হুবহু বর্ণনা শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ-এর দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে আছে। সুতরাং এমন ভাবনা অযৌক্তিক হবে না যে, শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ-এর পটভূমি হিসেবে ঋগ্বেদই কাজ করেছিল। এটাই সম্ভব। কারণ আমরা আগেই বলেছি যে, ঋগ্বেদের পূর্বেই সিন্ধু উপত্যকাতে যোগ ব্যবস্থা ছিল। সেখান থেকে ঋগ্বেদে যে এটা বহিরাগত তা নয়। কারণ সিন্ধু অঞ্চলের লোকেরা অনার্য এমন কোন প্রমাণ নেই। পণ্ডিতপ্রবর হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বৈদিক তত্ত্বে ভাষা বিজ্ঞান' গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, সিন্ধু অঞ্চলের জনগোষ্ঠী আর্যবহির্ভূত ছিলেন না। তিনি এই অঞ্চলের জনগোষ্ঠীকে যাজ্ঞিক আর্যদের অসূর্যগোষ্ঠীভুক্ত হিসাবে দেখিয়েছেন। তিনি আর্যজাতিকে নিম্নোক্ত ভাবে বিভক্ত করেছেন ঃ
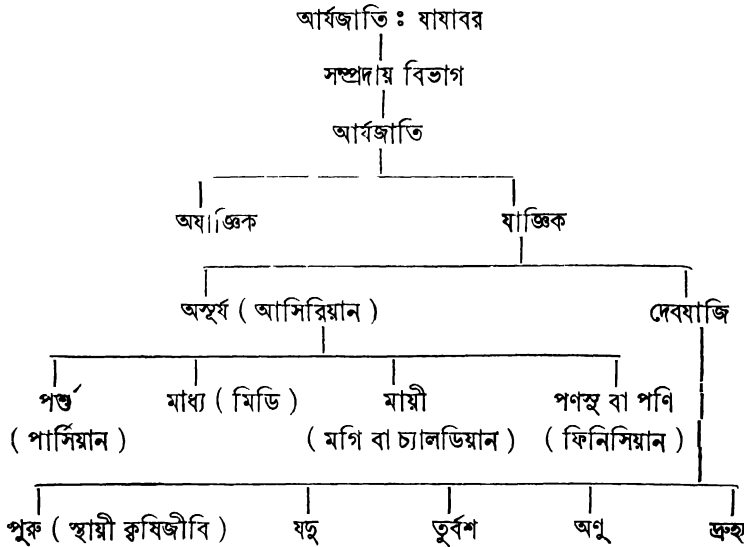
বৈদিক সাহিত্যে পণি বলতে হরপ্পা সভ্যতার জাতিগোষ্ঠীকে বোঝানো হয়েছে। সন্দেহ নেই যে, তারা ফিনিসিয়দের মত ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত ছিল। এই পণি শব্দ থেকেই 'বণিক' শব্দ এসেছে।

এই যোগের পদ্ধতি যে শুধু বৈদিক সূক্তেই আছে তা নয়। বৈদিক দেবদেবীর ক্ষেত্রেও সমান ভাবে প্রযোজ্য। যেমন ঋগ্বেদের বায়ু যোগের প্রাণের সঙ্গে যুক্ত। প্রাণ অর্থ যোগে শ্বাস। এই জন্যই প্রাণায়াম করার ব্যবস্থা

হয়েছে। 'অগ্নি' যুক্ত মনের সঙ্গে। সোমের যোগ রয়েছে সমাধির সঙ্গে। সমাধির যে প্রশান্তি 'কোটীচন্দ্র সুশীতলম্' অবস্থার মধ্যেই তা পাওয়া যায়। এ-ভাব কিন্তু বেদের কম গুরুত্বপূর্ণ দেবতাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তাঁদের যথাযোগ্য যে মর্যাদা বেদে তাই দেওয়া হয়েছে। বেদের মহান দেবতাদের ক্ষেত্রেই যৌগিক রহস্য প্রয়োগযোগ্য। যোগের এই মরমিয়া রহস্য দ্বারাই সেই মহান দেবতাদের চরিত্র সম্যক উদ্ঘাটন করা সম্ভব। বেদকে এই কারণে যোগের পাঠ্যপুস্তক হিসাবেও ধরা যেতে পারে। যোগের উৎস বিচার করলেও বৈদিক ঐতিহ্যের সঙ্গে তাকে খাপ খাইয়ে নেওয়া যায়।

বেদের সবিতৃ অর্থাৎ স্রষ্টা সূর্যের সঙ্গে যোগের যে সম্পর্ক সেটা আকস্মিক কোন ব্যাপার নয়। অর্থাৎ একে সন্নিপাত বলে ভাবা চলে না। দিব্য সূর্য 'সবিতৃ', গায়ত্রী মন্ত্রের দেবতা। বৈদিক মন্ত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব-পূর্ণ সূক্ত। সকাল সন্ধ্যায় প্রত্যেক ব্রাহ্মণকেই এই গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতে হয়। 'ওঁ'-ই গায়ত্রী মন্ত্রের ভিত্তি। এখানে 'সবিতৃ' যোগের দেবতা হিসেবে দৃষ্ট মানুষের অধ্যাত্ম চেতনার উন্মেষে প্রথম শর্ত। যদি অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করা যায় তা হলে বলা চলে যে, সমগ্র উপনিষদ্ই গায়ত্রীরই ক্রমবিস্তার মাত্র। গায়ত্রী মন্ত্র একটু ভাল করে লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে, তা যোগের দিকেই নির্দেশ দিচ্ছে। যেমন, ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের ৬২তম সূক্তের ১০ম শ্লোকে আছে ঃ

"তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি।
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥"

অর্থাৎ "যিনি আমাদের ধীশক্তি প্রেরণ করেন আমরা সেই সবিতৃদেবের বরণীয় তেজ স্মরণ করি।"

যজুর্বেদও সেই সবিতৃদেবের কাছ থেকে প্রেরণা লাভ করেই আরম্ভ (শুক্ল যজুর্বেদ ১/১)। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে শুক্ল যজুর্বেদের একাদশ অধ্যায়ের উদ্ধৃতিতে 'সবিতৃ'ব বিশেষ গুরুত্বের উল্লেখ রয়েছে। বলা হয়েছে, পৃথ্বী থেকে অগ্নিকে নিয়ে আসার কথা। এখানে একটা গূহ্য ভাব রয়েছে। এই পৃথিবী বস্তুসত্তা। অগ্নি হল অধ্যাত্ম চেতনা। বস্তুসত্তা থেকেই তা আহরণ করে নিতে হবে। উপনিষদে যজুর্বেদ থেকে উদ্ধৃতি এই প্রমাণ করে যে, যোগের উদ্ভব ঋগ্বেদ থেকে। এর আগে হলেও বেদ যোগবিবর্জিত নয়। বৈদিক অনুষ্ঠানগুলির আন্তরশক্তি হিসেবে রয়েছে যোগ। 'ওঁ' হল গায়ত্রী, সবিতৃ ও বেদেরও শক্তি। বৈদিক দেবতারা মূলতঃ বেদানুসারীদের যোগেরই পথে পরিচালনা করেন।

ঋগ্বেদে 'যোগ' হিসেবেই যোগের উল্লেখ তেমন পাওয়া যাবে না। পরবর্তী সংস্কৃত সাহিত্যেও অনেক সময়ই অধ্যাত্মসাধনার পথ হিসেবে এর উল্লেখ না থাকলেও এর গুরুত্ব যেমন অস্বীকৃত নয়, ঋগ্বেদের ক্ষেত্রেও তাই। যোগক্ষেম —কর্ম ও বিশ্রাম এমন সাধারণ ভাবেই বেদ ও গীতাতে এর উল্লেখ রয়েছে। তথ্যাপি নানা শ্লোকেই যোগ যে একটি ধ্যানপদ্ধতি এমন ভাব অত্যন্ত স্পষ্ট।

ঋগ্বেদে যোগ অর্থ যে 'যুজ্' এমন ভাব বহুস্থানেই ব্যক্ত। গরুর জোয়াল যেমন গাড়িকে এগিয়ে নিয়ে যায় যোগও তেমনই ঈশ্বরের পথে পরিচালিত করে। যোগ যে সমন্বয় সাধনে পটু এ ভাব বহু ক্ষেত্রেই রয়েছে। অবশ্য 'যোগ' নাম না করেই এর উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং অধ্যাত্ম পদ্ধতি হিসেবে কদাচিৎ ঋগ্বেদে যোগের উল্লেখ থাকলেও যোগের মূল বক্তব্য যে মানুষের সঙ্গে দৈবী সত্তার সংযোগ সাধন, মানুষের দৈবী সত্তা লাভ, অমরত্ব লাভ প্রভৃতি. রহস্যময় ভাবে ঋগ্বেদের মরমিয়া সূক্তগুলির মধ্যে তা উল্লেখিত হয়েছে। বৈদিক শিক্ষার এটা মূল কথা।

মন নিয়ন্ত্রক হিসেবে যোগের সামগ্রিক ভাব স্পষ্টই ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। যেমন ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলের ৮১তম সূক্তের প্রথম শ্লোকে আছে ঃ—

"যুঞ্জতে মন উত যুঞ্জতে ধিয়ো বিপ্রা বিপ্রস্য বৃহতো বিপশ্চিতঃ।
বি হোত্রা দধে বয়ুনাবিদেক ইন্মহী দেবস্য সবিতুঃ পরিষ্টুতিঃ॥"১

অর্থাৎ "বিপ্রগণ নেত্র, কর্ণ, নাসিকা, রসনা ও ত্বক এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে মনঃসংযোগ করে ব্রহ্মময় সূর্যদেবের জ্যোতি চিন্তা করবেন। এমন করলেই সর্ববৃহৎ সর্বদর্শী সূর্যদেবের যথার্থ স্তব হয়। যে সকল ব্রাহ্মণ ইন্দ্রিয়সমূহকে বিষয় থেকে নিবৃত্ত করে হোমাদি ক্রিয়া দ্বারা সেই পরমাত্মার স্তুতি করেন তাঁরাই পরিণামে প্রকৃত ফলেব অধিকারী হন।"

অনেকে মনে করেন ঋগ্বেদে উপরোক্ত শ্লোকটি একটি ব্যতিক্রম। বস্তুত তা নয়। সেরকম ভাবলেও এ কথা স্পষ্ট যে, যোগের বীজ এই প্রাচীনতম আর্য সাহিত্যের মধ্যেই ছিল।

যোগের যে বলিদান ও যজ্ঞ, আন্তরক্ষেত্রে তাইই যোগপথ অনুসরণ। বাইরের বলি প্রকৃত পক্ষে মনের অহংয়ের বলি। যে অগ্নিশিখাতে তা আহুতি দেওয়া হচ্ছে তা আসলে দৈবী চিৎসত্তা। যোগের সর্বাপেক্ষা মৌল রূপ হল মন্ত্রযোগ, 'শব্দযোগ' বা 'দিব্য বাক্যযোগ', মন্ত্র অর্থও মনন করে যে শব্দ উচ্চারণ করলে তা 'ত্র' বা তারণ করে। ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি এদিক থেকে রীতিমত মরমিয়া। অগ্নির প্রতি ঋগ্বেদীয় শ্লোক হোল প্রকৃত পক্ষে জ্ঞান-যোগ। ইন্দ্রসূক্ত প্রকৃতপক্ষে কর্মযোগ। সোমসূক্ত ভক্তিযোগ। সুতরাং বলা যেতে পাবে যে, বৈদিক জ্ঞান ও যোগজ্ঞান সমার্থবোধক। যোগে পাওয়া যায় বেদের বাস্তব দিক, বেদে পাওয়া যায় তাত্ত্বিক দিক। বৈদিক ঐতিহ্য যথার্থ অর্থে যৌগিক ঐতিহ্য। অপর পক্ষে যৌগিক ঐতিহ্য হল বৈদিক ঐতিহ্য। বেদ হল যোগের তাত্ত্বিক জ্ঞানের দিক, ব্যবহারিক দিক।

যোগে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হল প্রাণায়াম। উপনিষদ পাঠ করলে দেখা যাবে—প্রাণের প্রতি রয়েছে অফুরন্ত উল্লেখ। প্রাণ ব্রহ্মের সমার্থক। অর্থাৎ আত্মনের সমার্থক। এই প্রাণই দেবরাজ ইন্দ্র। প্রাণ পাঁচ ধরনের—প্রাণ, উদান, সমান, ব্যান ও অপান। এই পঞ্চপ্রাণ প্রাণশক্তির সূক্ষ্ম বিজ্ঞান হিসাবে স্বীকৃত।

মৈত্রায়াণী উপনিষদে (৬/১) বলা হয়েছে ঃ "আত্মার দুটি দিক—প্রাণ ও

সূর্য। একটি অন্তরে আর একটি বাহিরে। দিনরাত্রি ঘুরে বেড়াচ্ছে। সূর্য হলেন আত্মার বাইরের দিক। প্রাণশক্তি অন্তরের দিক। বাইরের সূর্যের গতিদ্বারা আন্তর সূর্য বা প্রাণের গতি হিসাব করা যায়। কিন্তু যিনি জ্ঞানী নিষ্কলুষ চিত্ত, যিনি অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন তিনি জানেন যে, প্রকৃতপক্ষে অন্তরাত্মার গতি দ্বারাই বহিরাত্মার গতি নির্ধারিত হয়।"

প্রাচীন ঋষিরা বাইরের সূর্যের গতি দ্বারা আন্তরশক্তির গতি উপলব্ধি করতেন। এই পদ্ধতি যোগের পদ্ধতি হিসেবে কাজ করেছে। কিন্তু যাঁদের অন্তর্দৃষ্টি গভীর তাঁরা অন্তরের প্রাণশক্তিতে চিত্তনিবেশ করে বাইরের সূর্যের গতি বুঝতেন। প্রাণায়াম এইজন্য প্রাচীন সৌরধর্মের বিজ্ঞান হিসাবে কাজ করত। ব্রাহ্মণের অনুষ্ঠান ক্রিয়ার মধ্যেও প্রাণের উল্লেখ আছে। অইতরেয় ব্রাহ্মণে (১. ১৯) বলা হয়েছে—" 'সবিতৃ'ই হলেন শ্বাসপ্রশ্বাস" 'ক' ব্রাঃ (৯/৬)-এ বলা হয়েছে—"সোমই শ্বাসপ্রশ্বাস।" অঃ ব্রাঃ (১১/৪) বলা হয়েছে—"অরণী কাষ্ঠের ঘর্ষণই শ্বাসপ্রশ্বাস।" দিব্যসত্তাকে যাঁরা আহ্বান করেন তাঁরা শ্বাসপ্রশ্বাসের দ্বারাই করেন। বৈদিক সাহিত্যে এইভাবে প্রতীক হিসাবে প্রাণায়ামের ভূরি ভূরি উল্লেখ আছে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের ২৯নং শ্লোকে বলা হয়েছে :—

"অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাঽপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়াম পরায়ণাঃ ।।"২৯

অর্থাৎ "অন্যান্য যোগী অপান বায়ুতে প্রাণবায়ু (পূরক প্রাণায়াম) এবং প্রাণবায়ুতে অপান বায়ু আহুতি দিয়ে (রেচক নামক প্রাণায়াম করে) প্রাণ ও আপন বায়ুর গতিরোধ করে কুম্ভকরূপ প্রাণায়াম করেন।"

প্রাণায়ামের এই যে ব্যবস্থা ব্রাহ্মণ, উপনিষদ ও গীতাতে অভিনব কিছু নয়। এর উৎস রয়েছে বেদে। সমগ্র বৈদিক অনুষ্ঠান যোগের দর্পণ স্বরূপ। চক্রে চক্রে এতে বায়ুর গতিবিধির কথা রয়েছে।

যজুর্বেদের নানা অংশে প্রাণবায়ুর উল্লেখ রয়েছে। বৈদিক যজ্ঞ হল আমাদের কর্মক্ষমতাকে আন্তরক্ষমতাকে পূতঃকরণের একটি চেষ্টা মাত্র। এতে শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া পরিশুদ্ধকরণের ব্যাপারও রয়েছে। এটা করা হত সত্যকে জানার জন্য, আমাদের আত্মা স্বরূপ নিখিল বিশ্বমানবকে জানার জন্য অর্থাৎ আত্মাকে বাইরে আনার এ ছিল একটি প্রকৃষ্ট পন্থা।

শ্বাস বা বায়ুর ঈশ্বর এই জন্য ঋগ্বেদে একজন গুরুত্বপূর্ণ দেবতা এবং ইন্দ্ররূপে কথিত। এই জন্য ঋগ্বেদের চতুর্থ মণ্ডলের ৪৭তম সূক্তের ১-২ শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ—

"বায়ো শুক্রো অয়ামি তে মধ্বো অগ্রং দিবিষ্টিষু।
আ যাহি সোমপীতয়ে স্পার্হো দেব নিযুত্বতা ।।১
ইন্দ্রশ্চ বায়বেষাং সোমানাং পীতিমর্হথঃ।
যুবাং হি যন্তীন্দবো নিম্নমাপো ন সধ্র্যক্ ।।"২

অর্থাৎ "হে বায়ু! আমি পবিত্র হয়ে স্বর্গ অভিলাষে তোমার কাছে প্রথমে

সোমরস এনেছি। হে দেব! তুমি স্পৃহণীয়, তুমি সোম পানের জন্য নিযুক্ত অশ্বে এস। হে ইন্দ্র ও বায়ু! তোমরা সোমরস পান করার যোগ্য। কারণ জল যেমন নিম্নগামী সেইভাবে সোমরস তোমাদের দিকে গমন করে। তবে প্রতিকার্থে প্রাণায়ামের কথাই বলা হয়েছে।"

ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলের ৯১তম সূক্তের ৪র্থ শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ

"যাবত্তরস্তন্বো যাবদোজো যাবন্নরশ্চক্ষসা দীধ্যানাঃ।
শুচিং সোমং শুচিপা পাতমস্মে ইন্দ্রবায়ু সদতং বর্হিরেদম্ ॥"৪

অর্থাৎ "যাবৎ তোমাদের দেহের বেগ থাকে, বল থাকে, নেতৃগণ জ্ঞানবলে দীপ্যমান থাকেন তাবৎ হে বিশুদ্ধ সোমপায়ী ইন্দ্র ও বায়ু! তোমরা আমাদের বিশুদ্ধ সোমপান কর, এই বর্হিতে উপবেশন কর।" উপবের অংশ থেকে এটা স্পষ্ট যে, বৈদিক অনুষ্ঠানের একটি মনস্তাত্ত্বিক বা আধ্যাত্মিক তাৎপর্য ছিল। ইন্দ্রের যে দুই অশ্ব তাঁকে যজ্ঞে নিয়ে আসে তা প্রাণ ও অপান বায়ু। বৈদিক অশ্ব শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রতীক। বায়ু হল জাগ্রত প্রাণেব প্রতীক। ইন্দ্র আত্মজ্ঞানের প্রতীক বা দিব্যসত্তার প্রতীক। যোগের মূল লক্ষ্য আমাদের প্রাণশক্তিকে দিব্যশক্তির সঙ্গে যুক্ত করা। যোগের জন্যই ঋগ্বেদে এই কারণে ইন্দ্রকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। এতে প্রাণায়ামই গুরুত্ব পেয়েছে। এই যোগ সেই কারণে উপনিষদে ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণকারী হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। কঠ উপনিষদে (২/৩/১১) তাই বলা হয়েছে ঃ জ্ঞানী ব্যক্তিরা যোগকে ইন্দ্রিয় নিযন্ত্রক বলে মনে করেন। 'ইন্দ্রিয়' শব্দটি এই কারণে ইন্দ্র থেকেই এসেছে। ইন্দ্র এমন শক্তি যিনি ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণ করেন। মনকে কলুষমুক্ত করেন বা জ্ঞান-দীপ্ত করেন। ইন্দ্রিয়েব নিযন্ত্রক হিসাবে ইন্দ্র যোগেরও দেবতা বটে। উপনিষদে সেরকমই ইঙ্গিত আছে।

ঋগ্বেদে অসংখ্য প্রতীকি ব্যঞ্জনা আছে। এর মধ্যে খুবই বেশি প্রচলিত সাত সংখ্যা, যেমন সপ্ত ঋষি, সপ্ত সমুদ্র ইত্যাদি। দেবতারাও সাত বা সাত সংখ্যায় শ্রেণীবদ্ধ। মনু এই জন্য বলেছেন,—সাত ঋষির সাত বর্শা ও সাত আলো। তাঁদের সপ্ত গৌরব। ঋগ্বেদের এই সাত সংখ্যাকে যোগের সপ্ত দেহচক্রের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

ঋগ্বেদে দশম মণ্ডলের ৬৭তম সূক্তির ১-২ শ্লোকে অযস্য ঋষির এই ধরনের বক্তব্য আছে ঃ—

"ইমাং ধিয়ং সপ্তশীর্ষ্ণীং পিতা ন ঋত প্রজাতাং বৃহতীমবিন্দৎ।
তুরীয়ং স্বিজ্জনয়দ্বিশ্বজন্যোঽযাস্য উকথ্মিন্দ্রায় শংসন্ ॥১
ঋতং শংসন্ত ঋজু দীধ্যানা দিবস্পুত্রাসো অসুরস্য বীরাঃ।
বিপ্রং পদমাঙ্গিরসো দধানা যজ্ঞস্য ধাম প্রথমং মনন্ত ॥"২

অর্থাৎ "আমাদের পিতা এই সপ্তশীর্ষযুক্ত মহৎ স্তব রচনা করেছেন। সত্য থেকে এব উৎপত্তি। সকল লোকের হিতকারী অযাস্য ঋষি ইন্দ্রের প্রশংসা করতে গিয়ে চতুর্থ একটি স্তব সৃষ্টি করেছেন। অঙ্গিরার বংশধরগণ যজ্ঞের

সুন্দর স্থানে যেতে মনস্থ করলেন। তাঁরা সত্যবাদী, সরল; তাঁরা স্বর্গের পুত্র। মহাবলে বলী; তাঁরা বুদ্ধিমান ব্যক্তির ন্যায় আচরণ করেন।”

যজ্ঞের আদি চরিত্র ছিল ধ্যান দ্বারা সপ্তচক্র এবং চৈতন্যের চারটি স্তর ভেদ করে জাগ্রত, স্বপ্ন, নিবিড় নিদ্রা ও শাশ্বত চেতনা বা তুরীয় অবস্থা লাভ করা। চতুর্থ স্তর অর্থাৎ তুরীয় স্তরে মনের আর তিনটি অবস্থা ঐক্যবদ্ধ হয়।

ঋগ্বেদে যে সূর্য, ঋতু ও বর্ষ সম্পর্কে প্রতীক ব্যবহার করা হয়েছে তা নিশ্চয়ই যোগ অভ্যাসের সঙ্গে যুক্ত। ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ১৬৪ সূক্তের ২-৪ শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ—

“সপ্ত যুঞ্জন্তি রথমেকচক্রমেকো অশ্বো বহতি সপ্তনামা।
ত্রিনাভি চক্রজরমনর্বং যত্রেমা বিশ্বা ভুবনাধি তস্থুঃ ॥২
ইমং রথমধি যে সপ্ত তস্থুঃ সপ্তচক্রং সপ্ত বহন্ত্যশ্বাঃ।
সপ্ত স্বসারো অভি সং নবন্তে যত্র গবাং নিহিতা সপ্ত নাম ॥৩
কো দদর্শ প্রথমং জায়মানমস্থন্বন্তং যদনস্থা বিভর্তি।
ভূম্যা অসুরসৃগাত্মা ক্ব স্বিৎকো বিদ্বাংসমুপ গাৎ প্রষ্টুমেতৎ ॥”৪

অর্থাৎ “সূর্যের একচক্ররথে সপ্ত অশ্ব যোজিত হয়েছে। এক অশ্বই সপ্ত নামে এই রথ বহন করছে। চক্রের তিন দণ্ড। এ কখনও শিথিল বা জীর্ণ হয় না। এতে সকল জগৎ আশ্রয় করে আছে। সপ্ত যে রথে দাঁড়িয়ে আছেন তার সাতটি চাকা আছে। সপ্ত অশ্ব একে বহন করে। সাত ভগ্নী একত্র বসে গান করে— সেখানে সপ্ত গাভীর নাম লুকিয়ে আছে। প্রথম জাতককে কে দেখেছে? সেই অস্থিবিহীনকে, যাকে অস্থিবানেরা বহন করে? ভূমি থেকে প্রাণ ও রক্ত এসেছে। কিন্তু সেই আত্মা এসেছে কোথা থেকে? কে এর উত্তর জানে যে, তাঁর কাছে আমরা যাব?”

এই সূক্তটিতে নিশ্চয়ই রহস্যময় যোগের সপ্ত চক্রের কথা বলা হয়েছে। আরও একটি জিনিস এ থেকে স্পষ্ট যে, বৈদিক ঋষিরা তাঁদের অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে দেখেছিলেন যে, মনের মধ্যেই জগতের স্থিতি। এই সাতের ধারণা বৈদিক ঋষিদের একের ধারণার কাছে নিয়ে এসেছিল—অর্থাৎ আত্মনের কাছে।

ঋগ্বেদের ষষ্ঠ মণ্ডলের ৪৪তম সূক্তের ২২-২৩ শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ—

“অয়মকৃণোদুষসঃ সুপত্নীরয়ং সূর্যে অদধাজ্জ্যোতিরন্তঃ।
অয়ং ত্রিধাতু দিবি রোচনেষু ত্রিতেষু বিন্দদমৃতং নিগূঢ়হম্ ॥”২৩

অর্থাৎ “সোম ঊষাকে সৎ সাথীগণকে দিয়েছেন। তিনি সূর্যের বুকে আলো স্থাপন করেছেন। তিনি দীপ্তিসম্পন্ন তিন ভুবনের মধ্যে স্বর্গে গূঢ়ভাবে অবস্থিত ত্রিবিধ অমৃত লাভ করেছেন।”

এই সূক্তে পরে যে সপ্তরশ্মির কথা বলা হয়েছে তা স্থূলদেহের সূক্ষ্ম-শরীরের সাতটি কেন্দ্র। ঊর্ধ্ব তিন ধরনের অমৃত হল সচ্চিদানন্দ—সৎ+ চিৎ+আনন্দ। এতে মনে হয় বৈদিক রথ অথবা অনুষ্ঠান-রথ যোগের আন্তর উপলব্ধির কথা মাত্র।

ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের ৫৬তম সূক্তের দ্বিতীয় শ্লোকে আছে ঃ

"ষড়্‌ভারাঁ একো আচরন্বিভর্ত্যতঃ বর্ষিষ্ঠমুপ গাব আগুঃ।
তিস্রো মহীরুপরাস্তস্থুরত্যা গুহা দ্বে নিহিতে দর্শ্যেকা ॥"২

অর্থাৎ "একটি স্থায়ী বৎসর ছয়টি ঋতুভার ধারণ করে। গাভীসকল ও রশ্মি-সকল সত্য ও প্রবৃদ্ধ আদিত্যাত্মক সম্বৎসরে মিলিত হয়। চঞ্চল তিনলোক উপরি উপরি বর্তমান। দুটি স্বর্গ ও অন্তরিক্ষ গুহায় নিহিত। একটি পৃথিবী দেখতে পাওয়া যায়।"

এই যে 'ছয়' এই 'ছয়' হল নিম্ন ষট্‌চক্র। সপ্তম ক্ষেত্রেই মোক্ষ ও অমরত্ব লাভ করা যায়।

১ম মণ্ডলের ১৬৪তম সূক্তের ১৫নং শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ—

"সাকঞ্জানাং সপ্তথমাহুরেকজং ষলিদ্যমা ঋষয়ো দেবজা ইতি।
তেষামিষ্টানি বিহিতানি ধামশঃ স্থাত্রে রেজন্তে বিকৃতানি রূপশঃ ॥"১৫

অর্থাৎ "আদিত্যের সহজন্মা ঋতুগণের মধ্যে সপ্তম কেবল একক। অন্য ছয় ঋতু যুগ্ম ; গমনশীল ও দেব থেকে উৎপন্ন। এ ঋতুগণ সকলের ইষ্ট। স্থান-ভেদে পৃথক পৃথক ভাবে স্থাপিত। রূপভেদে বিবিধ আকৃতিবিশিষ্ট এরা আপনার অধিষ্ঠাতার জন্য বার বার ঘূর্ণায়মান হচ্ছে।"

এই ঋতু হল ঋষি। সাতজন ঋষির মধ্যে ছয়জন যুগ্ম। এঁরা হলেন ছটি নিম্ন চক্র। এদের দুই ধরনের কাজ। ঐক্য ও অমরত্ব শুধু সপ্তমের অর্থাৎ সপ্তম চক্রের। এই যুগ্ম গুণসম্পন্ন ষট্‌চক্র ও এক সপ্তম চক্র ছটি ঋতু ও ত্রয়োদশ অনুপ্রবিষ্ট মাসের কথাও মনে করিয়ে দেয়। এখানে আকাশে সূর্যের গতির সঙ্গে সূক্ষ্ম দেহের বায়ুর খেলাও লক্ষণীয়। এই সম্পর্কে উপনিষদে বক্তব্য পাওয়া যায়। কিন্তু এ ধারণা মূল বেদেও অনুপস্থিত ছিল না।

ঋগ্বেদের নবম মণ্ডলের ১১৪নং সূক্তের তৃতীয় শ্লোকে বলা হয়েছে—

"সপ্ত দিশো নানা সূর্যাঃ সপ্তহোতার ঋত্বিজঃ।
দেবা আদিত্যা যে সপ্ত তেভিঃ সোমাভি রক্ষ ন ইন্দ্রায়েন্দো পরিস্রব ॥"৩

অর্থাৎ "সপ্তদিকের সাতটি সূর্য আছে। তাঁদের ঋতু অনুযায়ী সপ্ত আহ্বায়ক আছেন। সূর্যদেবতা সাতটি। তাঁদের সঙ্গে সোম আমাদের রক্ষা করুন। হে সোম ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।"

এই সপ্ত দিক সাতটি সূক্ষ্মদেহদ্যোতক। এরাই সাতটি চক্র। প্রত্যেকটি চক্রের নিজস্ব দীপ্তি আছে। সোম হল ব্রহ্মরন্ধ্রক্ষরিত সুধা। সাতটি চক্র দিয়েই তার অবতরণ ঘটে। এই সোমরস পেলেই প্রত্যেকটি চক্র জাগ্রত হয়ে ওঠে।

দু'ধরনের দিবা ও রাত্রি দেবতা ও পিতৃবর্গের দুটি পথ। ইড়া পিঙ্গলা দিয়ে প্রাণ ও অপান বায়ুর সঙ্গে এদের যোগ রয়েছে। বাইরের জগতে একে সূর্যের অয়নান্ত থেকে গতি ধরা হয়। মূলাধার হল অয়নান্ত। সূর্যের উত্তর অয়নান্ত হল কর্কটকান্তি এবং দক্ষিণ অয়নান্ত হল মকরক্রান্তি। মূলাধার হল—শীতের অয়নান্ত, ব্রহ্মরন্ধ্রের কূটস্থান গ্রীষ্ম অয়নান্ত। সূর্যের 'বিষুব' (যখন দিবারাত্র সমান হয়) হল দেহের মধ্যচক্র বা অনাহত চক্র। এই গতিই

যজ্ঞের গতি। অনুষ্ঠানকারিরা বাইরের সূর্য দেখে অনুষ্ঠান করেন। অন্তর্চারিরা অর্থাৎ যোগীরা প্রাণায়ামের মধ্য দিয়ে এই যজ্ঞ করেন।

সূর্যদেবী[৬] যিনি রথে আরোহণ করে এই পথ পরিক্রমা করেন তিনি হলেন মন্ত্রশক্তি, প্রার্থনা বা আমাদের আকাঙ্ক্ষা। এই দেবী ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ি দিয়ে সৌরপথেরই মত পরিভ্রমণ করেন। ব্রহ্মরন্ধ্রের কূটস্থানের দিব্য ক্ষেত্রেই তার লক্ষ্য। এই দিব্য দিন সমূহের আবর্ত আত্মারও জন্ম জন্মান্তরের আবর্ত। সূর্যের নিত্য ও বাৎসরিক আবর্তন মৃতের আত্মার নবজন্মের প্রতীক। সেই জন্য বৈদিক প্রতীকের মধ্যে কর্ম ও জন্মান্তরের জ্ঞান বিদ্যমান রয়েছে। দার্শনিক ভাবে এই অভিজ্ঞতা বা জ্ঞানকে ব্যক্ত না করে সূর্যের মাধ্যমে করা হয়েছে। সূর্যের দীর্ঘ অদর্শনের পর ঊষার আবির্ভাব আত্মার নতুন দেহে আগমনতুল্য। অন্ধকার থেকে সূর্যের নবোদয় দেহ থেকে আত্মার নবোদয়ের সমান। এতে আত্মার বস্তুসত্তা বা বস্তুজাগতিক বন্ধন থেকে পূর্ণচেতনার মধ্যে মুক্তিও বোঝায়।

ঋগ্বেদের তিন মুখ্য দেবতা ইন্দ্র, অগ্নি ও সোমের সঙ্গে যোগের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। ইন্দ্রকে দেখা যাচ্ছে অহি বা বৃত্রকে ধ্বংস করছেন। সর্প-রূপী এই বৃত্র পর্বতের পাদদেশে সপ্ত তটিনীর ধারাকে রুদ্ধ করে রাখে। এই অহি, বৃত্র বা সর্প কুলকুণ্ডলিনী ছাড়া আর কেউ নন। মূলাধারে এই শক্তি কুণ্ডলায়িত হয়ে থাকেন। দেহই হল পর্বত। সপ্তচক্রের শক্তি বা অগ্নি এখানে আবদ্ধ হয়ে থাকে। ইন্দ্র বা প্রাণশক্তি বা elan vital হল প্রাণায়াম। এই প্রাণায়াম দ্বারা ইন্দ্রিয় সমূহের উপরে নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করে প্রাকৃত শক্তি অর্থাৎ সর্পশক্তির উপর প্রাধান্য স্থাপন করা যায়। ইন্দ্রকে এই জন্য দেখা যাচ্ছে তিন তিনবার করে সপ্ত পর্বতশ্রেণী ভেদ করছেন।

ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলের ৯৬ সূক্তের ১-২ শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ—

> "অস্মা উষাস আতিরন্ত যামমিন্দ্রায় নক্তমূর্ম্যাঃ সুবাচঃ।
> অস্মা আপো মাতরঃ সপ্ত তস্থুর্নৃভ্যস্তরায় সিন্ধবঃ সুপারাঃ ॥
> অতিবিদ্ধা বিথুরেণা চিদস্ত্রা ত্রিঃ সপ্ত সানু সংহিতা গিরীণাম্।
> ন তদ্দেবো ন মর্ত্যস্তুতুর্যাদ্যানি প্রবৃদ্ধো বৃষভশ্চকার ॥"

অর্থাৎ "তার ভয়ে ঊষাসকল তাদের গতি বৃদ্ধি করেছেন। আকাশের নক্ষত্র-সমূহ মিষ্ট বাক্য ব্যবহার করছেন। ইন্দ্রেরই জন্য সপ্তসিন্ধু সর্বতোব্যাপ্ত মায়ের মত দাঁড়িয়ে আছে যাতে সহজে মানুষ তা অতিক্রম করতে পারে। বজ্র-পাণি যদিও ক্রুদ্ধ, তিনতিনবার সপ্তপর্বতশ্রেণীকে ভেদ করলেন। এই মহান বৃষ[৭] বা ইন্দ্র যা করেছেন কোন দেবতা বা মানুষ তা করতে পারতেন না।"

---

৬ বহু দেশেই প্রাচীন কালে সূর্যকে দেবী হিসাবে কল্পনা করা হত। যেমন জাপান, টিউটন জাতি, সমুদ্র দ্বীপবাসী জনগোষ্ঠী—**Vide An Illustrated Encyclopaedia of Traditional Symbols. J. C. Kooper.**

৭ প্রাচীন মেসোপোটেমিয়াতেও বৃষকে মহান দেবতা হিসাবে কল্পনা করা হত।

ঘটনাটি রহস্যময় সন্দেহ নেই। সাধারণতঃ এর প্রাকৃতিক ব্যাখ্যাই হবে। কিন্তু এর যৌগিক ব্যাখ্যাও অস্বীকার করবার মত নয়। সপ্ত তটিনী দেহের সপ্ত চক্রের প্রাণপ্রবাহ ছাড়া আর কিছুই নয়। অন্ধকার থেকে আলোয় যেতে হলে এদের অতিক্রম করতে হবে। অর্থাৎ অজ্ঞতা থেকে জ্ঞানে বা মৃত্যু থেকে অমৃত লোকে যেতে হলে এদের অতিক্রম করতে হবে। প্রাণশক্তি বা ইন্দ্র সপ্তচক্র ভেদ করলে চেতনা জাগ্রত হয়। প্রত্যেকটি চক্রের তিন ধরনের স্রোত আছে। এরা সূর্যপথ, চন্দ্রপথ ও মধ্যপথ অর্থাৎ ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়িভেদ করে যায়। অবশ্য সাতটি চক্রকে তিনতিনবার করে ভেদ করার আর একটি অর্থ এই যে ৭ × ৩ = ২১ বার বা দিন সমাধিস্থ হতে পারলে মোক্ষ লাভ করা যায়।[৮]

ঋগ্বেদের আর একটি সূক্তে বলা হয়েছে যে, ইন্দ্র মধ্যগগনে তাঁর হয় ছুটিয়ে দস্যুদের পরাজিত করলেন। অনাহত চক্রে চেতনা উপস্থিত হলে যোগীদের মতে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আর আহত হবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। এই ইন্দ্রিয়গুলিই দস্যু। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১৩৮ সূক্তের তৃতীয় শ্লোকে তাই বলা হয়েছে ঃ

"বি সূর্যো মধ্যে অমুচদ্রথং দিবো বিদদ্দাসায় প্রতিমানমার্যঃ।
দৃড়হানি পিপ্রোরসুরস্য মায়িন ইন্দ্রো ব্যাস্যচ্চকৃবাঁ ঋজিশ্বনা ॥"৩

অর্থাৎ "সূর্য আকাশের মধ্যে নিজের রথ চালিত করলেন। দেখলেন, আর্যজাতি দাসজাতির সমকক্ষ। ইন্দ্র ঋজিশ্বা নামক ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব করে পিপ্রু নামক মায়াবী অসুরের বলবীর্য নষ্ট করে দিলেন।"

এই শ্লোকটির প্রচণ্ড প্রতীকার্থ রয়েছে। এ হল সমাধির প্রতীক, যেখানে প্রাণশক্তি আন্তরসূর্য দেহ থেকে নির্গত হয়ে যাচ্ছে। সূর্যের অন্ধকার থেকে মুক্তি মানে যোগে আত্মার কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়া এবং অনন্ত চিৎসত্তায় মিশে যাওয়া।

ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলের ৪০তম সূক্তের পঞ্চম শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ

"প্র ব্রহ্মাণি নভাকবদিন্দ্রাগ্নিভ্যামিরজ্যত।
যা সপ্তবুধ্নমর্ণবং জিহ্মবারমপোর্ণুত ইন্দ্র ঈশান ওজসা
নভন্তামন্যকে সমে ॥"৫

অর্থাৎ "ইন্দ্র ও অগ্নি স্বর্গ থেকে সাগরকে ঢেলে দিলেন যার ভিত্তি সাতটি, যার বাইরের পথ ঊর্ধ্বদিকে।" সাধারণ বাংলা করলে দাঁড়ায় 'নাভাকের ন্যায় ঋষি ইন্দ্র ও অগ্নির উদ্দেশে স্তুতি প্রেরণ করছেন। এরা সপ্তমূলবিশিষ্ট ও অবরুদ্ধ দ্বারবিশিষ্ট অর্ণবকে আচ্ছাদন করেন। ইন্দ্র তেজবলে ঈশ্বর। ইন্দ্র ও অগ্নি সকল শত্রু হিংসা করুন।"

আসলে উপরোক্ত বক্তব্যের মূল কথা হল সপ্ততলবিশিষ্ট চিৎশক্তি।-এটা যে প্রাচীন প্রাকৃত কল্পনাজাত তা নয়।

৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

পবিত্র অগ্নি মানস-অগ্নির প্রতীক। মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার শিখা, জাগ্রত মানস ও জাগ্রত চেতনার প্রতীক। সেই জন্য ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলের ৪৪তম সূক্তের ১৫নং শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ—

"অগ্নির্জাগার তমৃচঃ কাময়ন্তেঽগ্নির্জাগার তমু সামানি যন্তি।
অগ্নির্জাগার তময়ং সোম আহ তবাহমস্মি সখ্যে ন্যোকাঃ ।।"৬

অর্থাৎ "অগ্নি সর্বদা বিনিদ্র। ঋক্ সকল তাঁকে কামনা করে। অগ্নি সর্বদা বিনিদ্র। সামগানগুলি তাঁকে প্রাপ্ত হয়। অগ্নি বিনিদ্র। সোম তাঁকে বলেন— 'হে দেব আমি যেন সর্বদা তোমার সহবাসে থাকি।"

আসলে যথার্থ অর্থ এই "যারা জাগ্রত, মন্ত্র তাঁদেরই ভালবাসেন। অন্তরে যাঁরা জাগ্রত তাঁদের কাছে মরমিয়া সঙ্গীত আসে। যাঁরা জাগ্রত সোম তাঁদের বলেন, তোমার অন্তরঙ্গতার মধ্যেই আমার গৃহ। অগ্নি জাগ্রত সেইজন্য মন্ত্র তাকে ভালবাসেন। অগ্নি জাগ্রত বলেই মরমিয়া সঙ্গীত তাঁর কাছে আসে। অগ্নি জাগ্রত বলে সোম তাকে বলেন, "তোমার অন্তরঙ্গতাই আমার গৃহ।" এখানে সোম হল ব্রহ্মরন্ধ্রক্ষরিত অমৃত।

ঋগ্বেদের নবম মণ্ডলের ৭০তম সূক্তের প্রথম শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ—

"ত্রিরস্মৈ সপ্ত ধেনবো দুদুহ্রে সত্যামাশিরং পূর্ব্যে ব্যোমানি।
চত্বার্যন্যা ভুবনানি নির্ণিজে চারূণী চক্রে যদৃতৈরবর্ধত ।।"১

অর্থাৎ "তিনবার ব্যোমে দুগ্ধবতী গাভী তাঁর জন্য সত্যদুগ্ধ দান করলেন। তার জন্য ভিন্ন চার লোকে পরিচ্ছদ তৈরি করলেন। সত্য দ্বারা তার বৃদ্ধি হল।" সাধারণ বাচ্যার্থে দাঁড়ায় এইরকম ঃ—"যখন সোমরস যজ্ঞের সঙ্গে বৃদ্ধি পেলেন তখন তার জন্য পূর্ব পরম্পরাগত যজ্ঞের মধ্য থেকে একুশটি ধেনু, একুশটি গাভী দুগ্ধ দোহন করেছিল। তিনি চারটি জলপাত্রে শোধনের জন্য প্রবেশ করে জলপাত্রগুলিকে সুশোভিত করলেন।"

এখানে আবার সপ্ত চক্র ও তাদের ত্রিধারার উল্লেখ রয়েছে। সত্তার চতুর্থ জগৎ হল চৈতন্যের চারটি ভাব জাগ্রত, স্বাপ্নিক, গভীর নিদ্রামগ্ন ও তুরীয় ভাব। পরবর্তী বেদান্ত ও যোগদর্শনে এই ভাবগুলির কথা স্পষ্ট করে ব্যক্ত আছে। মনের এই স্তরগুলি যোগির কাছেই কেবল জ্ঞাত।

ঋগ্বেদের নবম মণ্ডলের ৬৮-তম সূক্তের সপ্তম শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ—

"ত্বাং মৃজন্তি দশ যোষণঃ সুতং সোম ঋষিভির্মতিভির্ধীতি ভিহিতম।
অব্যো বারেভিরুত দেবহূতিভিনৃভির্যতো বাজমা দর্ষি সাতয়ে ।।"

অর্থাৎ "হে সোম! দু'হাতের দশ আঙ্গুল মিলিত হয়ে তোমাকে মেষলোমের উপর শোধন করছে। তুমি নিষ্পেষণের সাহায্যে ঋষিদের দ্বারা উৎপন্ন হয়েছ। শোধনকালে তোমার উদ্দেশে নানাধরনের স্তব পাঠ করা হচ্ছে, তুমি পাত্রে পাত্রে সংস্থাপিত হয়েছ। যাঁরা দেবতাদের নাম করেন তুমি তাঁদের অন্ন বিতরণ কর।"

বোঝার মত বাংলা এই—"তোমাকে যখন নিষ্পেষণ করা হয় তখন দশটি কুমারী তোমাকে নির্মল করেন। ঋষিদের চিন্তা ও অন্তদৃষ্টির মধ্যে

তোমাকে রাখা হয়েছে। সোমকে নিষ্পেষণ ও আহ্বান করে নির্মল করার মধ্য দিয়ে তুমি আমাদের বোধ দান কর।"

পাঁচটি কুমারী এখানে শুদ্ধ পঞ্চ স্থূলেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়। পবিত্রকরণ ও নির্মলকরণ বলতে এখানে নির্মল চিৎসত্তা উদয়ের কথা বলা হয়েছে। ইন্দ্রিয় স্তব্ধ হলে তবেই সম্যক জ্ঞান জন্মে।

ঋগ্বেদের নবম মণ্ডলের ৭৩তম সূক্তের অষ্টম শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ—

"ঋতস্য গোপা ন দভায় সুক্রতুস্ত্রী ষ পবিত্রা হৃদ্যং তরা দধে।

বিদ্বান্ত্স বিশ্বা ভুবনাভি পশ্যাত্যবাজষ্টান্বিধ্যাতি কর্তে অব্রতান ।।"৮

অর্থাৎ "সত্য ও শুভের রক্ষককে প্রতারণা কবা যায় না। হৃদয়ে তিনি তিনটি ধৌতিকরণ নির্মলকারী ছাকুনি রেখেছেন। সর্বজ্ঞ তিনি। সকল জগৎকেই জানেন। যারা অবাঞ্ছিত, রীতি মানে না, তিনি তাদের কুণ্ডে নিক্ষেপ করেন।"

যে তিনটি ছাকুনি দ্বারা তিনি আমাদের নির্মল করেন তা হল জাগ্রত, স্বাপ্নিক ও চিৎসত্তার নিবিড় নিদ্রার অবস্থা।

বৈদিক নির্মলকরণ অনুষ্ঠানে মনকে শুদ্ধ করার কথা স্পষ্টই বলা হয়েছে। যেমন ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের ২৬নং সূক্তের ৮ম শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ—

"ত্রিভিঃ পবিত্রৈরপুপোদ্ধ্যর্কং হৃদা মতিং জ্যোতিরনু প্রজানন্।

বর্ষিষ্ঠং রত্নমকৃত স্বধাভিরাদিদ্যাবাপৃথিবী পর্যপশ্যৎ ।।"৮

অর্থাৎ "অগ্নি অন্তঃকরণ দ্বারা মনোহর জ্যোতি বিশেষ রূপে অবগত হয়ে তিন পবিত্র রূপ দ্বারা অর্চনীয় আত্মাকে পবিত্র করেছেন। অগ্নি স্বীয় রূপসমূহ দ্বারা উৎকৃষ্ট রত্ন তৈরি করেছিলেন এবং পরক্ষণেই দ্যাবা পৃথিবীকে অবলোকন করেছিলেন।"

বোঝার মত বাংলা এই ঃ তিনটি পবিত্রকরণ ছাকুনি দ্বারা তিনি সূর্যকে পবিত্র করেছিলেন। চিন্তা অনুযায়ী পূর্বাহ্নে জ্ঞাত হয়েই তিনি এমন করেছিলেন। আত্মচরিত্রের দ্বারা তিনি চরমানন্দ ধারণ করে আছেন। এর ফলে তিনি পৃথিবী ও স্বর্গকে চতুর্দিকে স্পষ্টভাবে দেখতে পেলেন। এই সূর্য এখানে চৈতন্য সূর্য যাকে নির্মল করতে হবে। এই চিৎসত্তা নির্মল হলেই আমরা সর্বলোকদর্শী হই, দেখতে পাই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড আমাদের মধ্যেই রয়েছে। এই বোধ ও অভিজ্ঞতা থেকেই আধুনিক যোগী কবিরা বলতে পেরেছেন—"ভাবিস তুই ক্ষুদ্র কলেবর, ইহাতেই অসীম নীলাম্বর।"

বেদের মরমিয়া কবিতাগুলির যদি এই ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে, বেদের দেবতাগণ যোগাভ্যাসকেই প্রস্ফুটিত করছেন। অগ্নি হলেন যোগের কুণ্ডলিনী যা মূলাধারে সুপ্ত থাকে। সোম হলেন ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ অমৃত। সূর্য হলেন চিৎসত্তা আত্মা। ইন্দ্র হলেন জাগ্রত প্রাণশক্তি যিনি যোগমাধ্যমে সিদ্ধি দান করেন।

ঋগ্বেদে যে সরস্বতী নদীকে নিয়ে পুরাণ কাহিনী তৈরি হয়েছে সেই সরস্বতী বহমান নদী নয়। এর একটি গভীর অন্তর্নিহিত অর্থ আছে।

গঙ্গার মত সরস্বতীও সুষুম্না নাড়ির ইঙ্গিতবহ। এ নদী হল জ্ঞানের নদী। এই জ্ঞান তটিনীই সূক্ষ্মদেহের ষট্‌চক্র ভেদ করে অগ্রসর হয়। সরস্বতী যে শুধু আকাশের ছায়াপথ তা নয়, অন্তরে তিনি সৎ চৈতন্য-নদী যা বাইরে প্রকাশিত হয়েছে। অন্যান্য ধর্মেও এইজন্য পবিত্র কিছু নদীর উল্লেখ দেখা যায়, যেমন জর্ডন নদী। বাম নদী অর্থাৎ চন্দ্রের স্রোত হল দেহ-নাড়ির ইড়া নাড়ি। ঋগ্বেদে এই ইড়া-পরুষ্নি নদী দ্বারা প্রতিভাত হয়েছে। দক্ষিণ নদী অর্থাৎ পূর্ব বা সূর্যস্রোত হল পিঙ্গলা নাড়ি। যমুনা দ্বারা এই নাড়ি বোঝানো হয়েছে। এই দুই নদীর মধ্যেই আর্যভূমি। অনেক সময় ঋগ্বেদে এই দক্ষিণ স্রোতকে ভারতী ও বাম স্রোতকে ইলা নামে ডাকা হয়েছে।

সরস্বতীর এই মহাবৈশ্বিক চরিত্র তাকে আর্যমানসে মহান স্থান অর্পণ করেছে। বৈদিক জ্ঞানকাণ্ড এইজন্য জ্ঞান নদীর তীরে করারই নির্দেশ আছে। তার মানে সূক্ষ্মদেহে যে চক্রগুলি রয়েছে তার ধারেই করতে বলা হয়েছে। ঋগ্বেদের ৬ষ্ঠ মণ্ডলের ৬৩-তম সূক্তের ৮, ৯, ১১ ও ১২নং শ্লোকে এই জন্য এই ধরনের বক্তব্য পাই ঃ—

"যস্যা অনন্তো অহ্রুতস্ত্বেষশ্বরিষ্ণুরর্ণবঃ। অমশ্চরতি রোরুবৎ ।।৮
সানো বিশ্বা অতি দ্বিষঃ স্বস্‌রন্যা ঋতাবরী। অতন্নহেব সূর্যঃ ।।৯
আপপ্রুষী পার্থিবান্যুরু রজো অন্তরিক্ষম্। সরস্বতী নিদস্পাতু ।।১১
ত্রিষধস্থা সপ্তধাতুঃ পঞ্চজাতা বর্ধয়ন্তী। বাজেবাজে হব্যা ভূৎ ।।"১২

অর্থাৎ "যার অপরিমিত অকুটিল দীপ্তি, অপ্রতিহত গতি, জলবর্ষী বেগ প্রচণ্ড শব্দে বিচরণ করে।"

"সর্বদা গতিশীল সূর্য যেমন দিনগুলিকে আনয়ন করেন সেইরূপ সেই সরস্বতী যেন আমাদের সকল শত্রুকে পরাজিত করেন এবং সলিলময়ী নিজের অন্যান্য ভগ্নিকে আমাদের নিকট আনেন।"

"পৃথিবী ও স্বর্গের সকল বিস্তীর্ণ প্রদেশ যিনি নিজের দীপ্তি দ্বারা পূর্ণ করেছেন সেই সরস্বতী দেবী যেন নিন্দুকদের থেকে আমাদের রক্ষা করেন।"

"ত্রিলোকব্যাপিনী সপ্ত অবয়বা, পঞ্চশ্রেণীর সমৃদ্ধিকারিণী সরস্বতী দেবী যেন প্রতি যুদ্ধে লোকের আহ্বানযোগ্যা হন।"

ভাল করে বুঝিয়ে বলতে গেলে বাংলা দাঁড়ায় এইরকম ঃ—"যার অসীম অনন্ত দীপ্তিময় গতি গর্জন করে ছুটে চলেছে সেই সত্যধারিণী সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করে তাঁর অপর অগ্নীদের অতিক্রম করে সূর্যের মত দিনকে বিলম্বিত করুন। যিনি পার্থিব জগৎ ও আবহাওয়ামণ্ডলীতে ব্যাপ্ত হয়ে আছেন সেই সরস্বতীকে বন্দনা করি। যাঁর তিনক্ষেত্র ও সপ্তস্তর আছে যিনি মানুষের পাঁচটি জন্ম বৃদ্ধি করেন, সকল সংগ্রামে তাঁকে পূজা করা উচিত।"

সরস্বতীর সপ্তস্তর চেতনার সাতটি ধাপ। প্রত্যেকটি স্তরে তাঁর তিনধরনের অবস্থান ধনাত্মক, নঙর্থক ও নিরপেক্ষ প্রাণস্রোত। যোগের অভিজ্ঞতাতে একে সৌর, চান্দ্র ও উভয়ের সম্মিলিত অবস্থা বলা যেতে পারে। পাঁচটি জন্ম হল পঞ্চ ইন্দ্রিয়।

ঋগ্বেদের রাজাদেরও প্রতীকার্থ আছে। সুদাস হলেন জাগ্রত চেতনার প্রতীক যিনি সরস্বতী বা সত্য নদীর তীরে বাস করেন। এই সরস্বতীই সূক্ষ্ম দেহের সুষুম্না নাড়ি। যে দশজন রাজার বিরুদ্ধে তাঁকে সংগ্রাম করতে হয়েছিল তারা হল পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়। প্রথম পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের চরিত্র সৌর, অধিষ্ঠান যমুনাতে। দ্বিতীয় পাঁচটির চরিত্র চান্দ্র, অধিষ্ঠান পুরুষ্ণিতে। এরা সত্যের রাজত্ব আক্রমণ করে তাকে আচ্ছন্ন রাখতে চায়। সরস্বতী অঞ্চল অধিকারই তাদের বাসনা। দিবদাস যে সাতটি নগরী জয় করেছিলেন তা সূক্ষ্ম দেহের সাতটি চক্র।

এই ভাবে ঋগ্বেদের অন্যান্য নৃপতিকেও নানা ধরনের অধ্যাত্মতার প্রতীক রূপে কাজ করতে দেখা যায়। দিবোদাস যিনি সম্বর অসুরকে পর্বত থেকে নিম্নে নিক্ষেপ করেছিলেন তিনি জাগ্রতমানসের প্রতীক। সম্বর হল অহং-তত্ত্ব। পর্বত হল মেরুদণ্ড।

তবে যোগাসনের স্পষ্ট উল্লেখ ঋগ্বেদে নেই। প্রাচীন বৈদিক সাহিত্য ধর্মশাস্ত্র সম্পর্কিত ও আনুষ্ঠানিক। যোগ দর্শন বা অভ্যাসের কোন গ্রন্থ নয়। ভাষা প্রতীকী ও মরমিয়া। বর্ণনামূলক বা বিচারবিশ্লেষী নয়।

তবে হস্ত জোড় করে নমস্কারের কথা ঋগ্বেদে বার বার উল্লেখিত হয়েছে। ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলের ১০৩নং সূক্তে অনুষ্ঠান কালে ব্রাহ্মণদের ভেকের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। যেমন—

"দিব্যা আপো অভি যদেনমায়ন্দৃতিং ন শুষ্কং সরসী শয়ানম।
গবামহ ন মায়ুর্বৎসিনীনাং মণ্ডূকানাং বগ্নুরত্রা সমেতি ॥"২

অর্থাৎ "শুষ্কচর্মের ন্যায় সরোবরে শায়িত মণ্ডূকগণের কাছে স্বর্গীয় বারি যখন আসে তখন বৎসযুক্ত ধেনুর শব্দের মত মণ্ডূকদের শব্দ নির্গত হয়।" মণ্ডূকদের সঙ্গে ব্রাহ্মণদের তুলনা করার কথাটি পদ্মাসনে বসার ভঙ্গী থেকে এসেছে কিনা ভেবে দেখবার মত। কারণ দেখা যায় অধিকাংশ যোগাসন ভঙ্গীর নাম পশুদের নামানুসারে করা হয়েছে। হয়তো বেদে উল্লেখিত অন্যান্য পবিত্র পশুদেরও এইভাবে যোগাসনভঙ্গীর গুরুত্ব আছে। তবে যোগাসন সম্পর্কে তেমন ভাবে নিশ্চিত হওয়া না গেলেও যোগের অন্যান্য মুখ্য উপাদান নিশ্চিত ভাবেই উল্লেখিত—যোগ, ধ্যান, মন্ত্র ও প্রাণায়াম।

বেদের দেবতাদের অনেকেই মনুষ্যাকৃতি। প্রাচীন কালে এঁদের মধ্যে অনেকেই যজ্ঞ করে দেবত্ব অর্জন করেছিলেন। মরুৎ ও আদিত্যদের এঁদের মধ্যে ধরা যেতে পারে। বেদের আদিত্যদের মত ব্রাহ্মণে বৈদিক ঋষি অঙ্গিরসদেরও দেবত্ব দেওয়া হয়েছে। ঋগ্বেদের রিভূগণ আদিতে ছিলেন মরণশীল পরে অমরত্ব অর্জন করেন। এইজন্য ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১১০ নং সূক্তের চতুর্থ শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ

"বিষ্টবী শমী তরণিত্বেন বাঘ্যতো মর্তাসঃ সন্তো অমৃতত্বমানশুঃ।
সৌধন্বনা ঋভবঃ সূরচক্ষসঃ সম্বৎসরে সমপৃচ্যন্ত ধীতিভিঃ ॥"৪

অর্থাৎ "তারা শীঘ্র কর্মসাধন করেছেন বলে এবং ঋত্বিকদের সঙ্গে মিলিত

হয়েছিলেন বলে মানুষ হয়েও অমরত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তখন সুধন্বার পুত্র ঋভুগণ সূর্যের ন্যায় দীপ্তিমান হয়ে সাংবাৎসরিক যজ্ঞসমূহের হব্যভাজন হলেন।" এর স্পষ্ট মানে এই ঃ—"তাঁদের কাজের শক্তি ও দক্ষতা দ্বারা ঋষিগণ (ঋভুগণ) যাঁরা ছিলেন মরণশীল, তাঁরা অমরত্ব অর্জন করলেন। অশ্বিনীদ্বয়কেও দেখা যায় তাঁদের অনুরাগীদের সাহায্যের জন্য মানবরূপ ধরে আসছেন।"

বৃহস্পতি দেবতা হলেও প্রাচীনতম ঋষি, বর্তমানে বৃহস্পতি গ্রহের সঙ্গে সমার্থক করে দেখানো হয়। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যকেও শুক্রগ্রহ হিসেবে দেখানো হয়। প্রথম মানব মনু যাঁর একটা ঐতিহাসিক পটভূমি আছে তিনিও দেবত্ব অর্জন করেছেন। যেমন করেছেন মৃত্যুর অধীশ্বর যম। কখনও যমকে যমজ হিসেবে দেখানো হয়। ইন্দ্র সম্পর্কেও এমন ভাবে বলা হয়েছে যাতে মনে হতে পারে যে, তিনিও মানুষ ছিলেন। সপ্তঋষি মিলে মহান রাজা ত্রসদস্যুকে, অর্ধদেবত্ব দিয়েছিলেন। অনেকটা ইন্দ্রেরই মত ছিলেন তিনি। ঋগ্বেদে এর উল্লেখ আছে। যেমন,

"অস্মাকমত্র পিতরন্ত আসন্ত্সপ্ত ঋষয়ো দৌর্গহে বধ্যমানে।
ত আয়জন্ত ত্রসদস্যুমস্যা ইন্দ্রং ন বৃত্রতুরর্ধদেবম্ ।।"৮

(ঋগ্বেদ, ৪. ৪২. ৮)

অর্থাৎ "দুর্গহের পুত্র বন্দী হলে পরে সপ্তঋষিগণ এদেশে পিতা হয়েছিলেন। তাঁরা পুরুকুৎসের স্ত্রীর জন্য ত্রসদস্যুকে যজ্ঞ করে লাভ করেছিলেন। ত্রসদস্যু ইন্দ্রের মত শত্রুবিনাশক ও অর্ধদেবতা।"

দেখা যাচ্ছে বৈদিক দেবতারা বহু প্রাচীন ঋষি—যাঁদের নিয়ে পুরাণ-কাহিনী রচিত হয়েছে তাঁদের প্রতিনিধিত্ব করছেন। দেবতাদের মধ্যে বহু প্রাচীন ঋষির অধ্যাত্ম বক্তব্য পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। দেখা যাচ্ছে যে, ঋষিরা দেবতা হচ্ছেন ও দেবতারা তাঁদের মধ্য দিয়ে কাজ করছেন। দীর্ঘতমসকে দেখা যাচ্ছে নিজের উচ্চতর মাত্রাকে একটি সূক্তে অগ্নি হিসেবে বর্ণনা করছেন। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১৪৫তম সূক্তের দ্বিতীয় শ্লোকে তিনি বলেছেন ঃ

"তমিৎ পৃচ্ছন্তি ন সিমো বিপৃচ্ছতি স্বেনেব ধীরো মনসা যদগ্রভীৎ।
ন মৃষ্যতে প্রথমং নাপরং বচোঽস্য ক্রত্বা সচতে অপ্রদৃপিতঃ ।।"২

অর্থাৎ "তাকেই (অগ্নি) সকল লোকে প্রশ্ন করে, অন্যায় জিজ্ঞাসা করে না। ধীর ব্যক্তি নিজের মনে যা স্থির করেন, তার পূর্বে ও পরে কোন কথা সহ্য করতে পারেন না। এই জন্যই দাম্ভিকতাশূন্য ব্যক্তি অগ্নির আশ্রয় প্রাপ্ত হন।"

বৈদিক ঋষি হতে গেলে দেবতার কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে হত যাতে দেবতারা তাঁদের মধ্য দিয়ে কথা বলতে পারেন। পবিত্র অগ্নিই যথার্থ শিক্ষক। এই অগ্নি আত্মশুদ্ধির প্রতীক।

সেই জন্য বলা যেতে পারে যে, বৈদিক দেবতার অন্তরালে ঋগ্বৈদিক ঋষিদের জ্ঞান ও শক্তি কাজ করেছে। সর্বত্রগামী মরুৎ ও আরোগ্যদানকারী

অশ্বিনীদ্বয় বৈদিক ঋষিদেরই ক্ষমতার প্রতীক। এই ঋষিদের দেবতা হওয়ার মধ্যেই পরবর্তীকালে অবতারত্বের গুহ্যতত্ত্ব নিহিত রয়েছে।

ঋগ্বেদে দেখা যাচ্ছে বহু ঋষি সোমরসবলে তাঁর জাদুক্রিয়ায় দীপ্তিশালী হচ্ছেন। আয়ুর্বেদ চিকিৎসক সুশ্রুত সোমরস সম্পর্কে বলেন যে, এই ভেষজ ঔষধি দেহের স্নায়ুতন্ত্রীকে এমন উজ্জীবিত করে যে, লোকে দশসহস্র গ্রীষ্ম উপভোগ করতে পারে, নবতারুণ্য লাভ করে। এতে তাঁর দেহে দুর্ভেদ্যতা আসে। সে অযুত মত্তহস্তীর বল লাভ করে। এই রসবলে সে সাগর পার হতে পারে ও ইন্দ্রলোকে গমন করতে পারে। উত্তর কুরুর শেষ সীমা পর্যন্ত যেতে তার বাধে না। এই উত্তর কুরু মেরু পর্বতের উত্তর দিকে অবস্থিত। মেরু পর্বত মেরুদণ্ড। তার উত্তর দিক হল সহস্রার, সিদ্ধ স্থান। দক্ষিণ অর্থাৎ নিম্নে মূলাধার—যেখানে ইন্দ্রিয়পরবশ ব্যক্তিদের বাস। উত্তর কুরু সিদ্ধদের বাসস্থান। ব্রাহ্মণ সাহিত্যে উত্তর কুরু দেবতাদের বাসস্থান হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। উত্তর কুরুর সিদ্ধ অধিবাসীদের নাম শুনে মনে হয় এঁরা যোগসিদ্ধ পুরুষ। সেই অর্থে সোমরস সহস্রারস্থ ব্রহ্মরন্ধ্র নির্গত অমৃত স্বরূপ। এর প্রতীকী অর্থ থাকাই স্বাভাবিক।

ঋষি বিশ্বামিত্র ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের ৫৩তম সূক্তের সপ্তম শ্লোকে বলেছেন ঃ

"ইমে ভোজা অঙ্গিরসো বিরূপা দিবস্পুত্রাসো অসুরসা বীরাঃ।
বিশ্বামিত্রায় দদতো মঘানি সহস্রসাবে প্র তিরন্ত আয়ুঃ ॥"৭

অর্থাৎ "অঙ্গিরস ঋষি, স্বর্গের সন্তান ও ঈশ্বরীয় ব্যক্তিগণ কল্যাণপ্রদ। বিশ্বামিত্রকে দান করে, সহস্রবার সোম পেষণ করে তাঁরা তাঁদের আয়ু দীর্ঘতর করেন।"

শুধুমাত্র ভাষার অনুবাদে দাঁড়ায়—"এই ভোজগণ, বিরূপ অঙ্গিরাগণ অপেক্ষা অসুর (দেবতা), আকাশের বীর পুত্রগণ বিশ্বামিত্রকে সহস্র সুযজ্ঞে ধন দান করে তাঁর জীবন বর্ধিত করুন।"

এর দ্বারা মনে হয় ঋষিরা দীর্ঘ-আয়ু হতে পারতেন। যোগসাধনা দ্বারা তাঁরা দিব্যশক্তি ও অধ্যাত্ম ক্ষমতা লাভ করতে পারতেন।

প্রাচীন ইউরোপীয় ধর্মেও বৈদিক ঋষিদের প্রতিরূপ লক্ষ্য করা যায়। গ্রীক Angelos, রোমান Angelicus ও ইংরেজী Angel সংস্কৃত অঙ্গিরসের সমার্থক। Angels-এর মত বৈদিক অঙ্গিরস ঋষিরাও সপ্তচক্রের আলোর প্রতীক—যে আলো দেহের সূক্ষ্ম নাড়িসমূহ দিয়ে প্রবাহিত হয়। অগ্নি থেকেই এই ঋষিরা জাত। এঁদের সম্পর্কে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৬২তম সূক্তের প্রথম ও ৬ষ্ঠ শ্লোকে তাই বলা হয়েছে ঃ

"যে যজ্ঞেন দক্ষিণয়া সমক্তা ইন্দ্রস্য সখ্যমমৃতত্ত্বমানশ।
তে ভ্যো ভদ্রমঙ্গিরসো বো অস্তু প্রতি গৃভ্নীত মানবং সুমেধসঃ ॥"১
"যে অগ্নেঃ পরি জজ্ঞিরে বিরূপাসো দিবস্পরি।
নবগ্বো নু দশগ্বো অঙ্গিরস্তমঃ সচা দেবেষু মংহতে ॥"৬

অর্থাৎ "হে অঙ্গিরাগণ! তোমরা ইন্দ্রের যজ্ঞীয় দ্রব্যসমূহ ও দক্ষিণা গ্রহণ করে ইন্দ্রের বন্ধুত্ব ও অমরত্ব প্রাপ্ত হয়েছ। তোমাদের মঙ্গল হোক। হে মেধাবিগণ! আমি মানব, আমাকে তোমরা যজ্ঞ সমাপনের জন্য নিযুক্ত কর।"

"তাঁরা অগ্নির চতুর্দিকে আবির্ভূত হলেন। নানা মূর্তিতে আকাশের চতুর্দিকে উদিত হলেন। কেউ নবসু অর্থাৎ ন'মাস যজ্ঞের পর গোধন পেয়েছেন, কেউ দশগ্ব অর্থাৎ দশমাস যজ্ঞ করে গোধন পেয়েছেন। তিনি অঙ্গিরাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম, তিনি দেবতাদের সঙ্গে একত্রে অবস্থান করে আমাকে ধনদান করছেন।"

Archangel-এর সংস্কৃত হল অর্হত অঙ্গিরস বা মহান অঙ্গিরস। বৌদ্ধরাও তাঁদের প্রাচীন ঋষিদের অর্হত বলতেন। প্রায়শই অগ্নিকে অর্হত বলা হোত। খ্রীষ্টান 'evangel' শব্দ এসেছে গ্রীক eu-an-gelos শব্দ থেকে। সংস্কৃতে একেই বলা হয় সু-অঙ্গিরস। এর অর্থ ঋষিদের সুসমাচার।

'Christ' শব্দ এসেছে গ্রীক 'Christos' থেকে। এর অর্থ অভিষিক্ত। সংস্কৃতে একেই বলা হয় ঘৃত। এই ঘৃত জ্যোতির প্রতীক। বলা হয়েছে ঘৃতসমুদ্রে অগ্নির বাসস্থান। ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলের ৩নং সূক্তের একাদশ শ্লোক ও চতুর্থ মণ্ডলের ৫৮নং সূক্তের ১নং শ্লোকে এই জন্য এই ধরনের উল্লেখ আছে ঃ

"ঘৃতং মিমিক্ষে ঘৃতমস্য যোনির্ঘৃতে শ্রিতো ঘৃতম্বস্য ধাম্‌।
অনুষ্বধমা বহ মাদয়স্ব স্বাহাকৃতং বৃষভ বক্ষি হব্যম ॥"১১

অর্থাৎ "আমি অগ্নিতে ঘৃত সিঞ্চন করি। ঘৃতই তার জন্মভূমি, ঘৃতই আশ্রয়, ঘৃতই দীপ্তি। হে অভীষ্টবর্ষী অগ্নি! তুমি হব্য দেবার সময় দেবতাদের আহ্বান করে তাঁদের প্রীতি উৎপাদন কর এবং স্বাহার আকারে প্রদত্ত হব্য গ্রহণ কর।"

"সমদ্রাদূর্মির্মধুমাঁ উদারদুপাংশুনা সমমৃতত্ত্বমানট্‌।
ঘৃতস্য নাম গুহ্যং যদস্তি জিহ্বা দেবানামমৃতস্য নাভিঃ ॥"১

অর্থাৎ "সমুদ্র থেকে মধুমান ঊর্মি উদ্ভূত হয়। মানুষ কিরণ দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করে। ঘৃতের যে গোপনীয় নাম আছে তা দেবতাদের জিহ্বা ও অমৃতের নাভি।"

ঘৃত দ্বারা সিক্ত হলেই কেউ যজ্ঞের যোগ্য হন না। শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ হল আত্মত্যাগ, আত্মযজ্ঞ, বা যজ্ঞদ্বারা অহংতত্ত্বকে দেবতাদের কাছে উৎসর্গ করা। এরই প্রতীক যিশুখ্রীষ্টের ক্রুশবিদ্ধ হবার মধ্যে ফুটে উঠেছে। খ্রীষ্টের মধ্যে তাই অঙ্গিরস ঋষিদের জ্ঞান ও কর্ম ফুটে উঠেছে।

খ্রীষ্টানদের Eucharist (যাতে প্রতীক হিসাবে রুটি ও মদের মধ্যে যিশুখ্রীষ্টের মাংস ও রক্ত পান করা হয়) নামে যে পবিত্র অনুষ্ঠান আছে তা গ্রীক eu-kharistos ও সংস্কৃত 'সু-হরিতস' শব্দের তুল্য।। বিষ্ণুর এক নামও হরি। বিষ্ণু থেকেই অবতারগণ এসেছেন। শেষ ভোজের সময় যিশু বলেছিলেন 'এই আমার দেহ'। গ্রীক শব্দে এই দেহ হল সোম। এই সোমই

ভারতে অমৃতস্বরূপ সোম। সুতরাং খ্রীষ্টানদের শেষ অনুষ্ঠান সোম অনুষ্ঠান বা সোম যজ্ঞ। মধ্যযুগীয় Hory Grail-সন্ধান বস্তুত পক্ষে সোমপাত্র সন্ধান। সোমপাত্র হল ভারতের অমৃত কুম্ভ।

রোমানদের পুরোহিত Flamen নামে পরিচিত ছিলেন। সংস্কৃতে এই Flamen-ই ব্রাহ্মণ। কেল্টিক পুরোহিতদের বলা হত 'ড্রুইড'। এঁরা ছিলেন একধরনের জাদুকর। বেদে এর প্রতিশব্দ পাওয়া যায় 'দ্রু-বিদ্'-এ। 'দ্রু-বিদ' অর্থ যিনি কাষ্ঠতত্ত্ব জানেন। ইংরেজী 'elf' শব্দ যা কেল্টিক শব্দ থেকে এসেছে সংস্কৃতে তারই নাম রিভু। 'L', ভারতে হয়ে যাচ্ছে 'R', ও 'F' হচ্ছে 'ভ' বা 'bh'। ঋভুরা দেব-কারিগর। আসলে এক শ্রেণীর বৈদিক ঋষি। আয়ার্ল্যাণ্ডের 'Eire' শব্দ ভারতীয় 'আর্য' শব্দ। ইংরেজী man ও জার্মান mensh বৈদিক মনু শব্দ থেকে এসেছে। মনু আর্যদের প্রথম মানব।

গৌতম বুদ্ধ নিজের ধর্মকে 'আর্যধর্ম' বলেছেন। গৌতম নামধারী কোন বৈদিক ঋষিবংশ থেকে তিনি এসেছেন বলেই বুদ্ধের নাম গৌতম। ইরাণীয় 'জরথুস্ত্র'-এর প্রতিনাম সংস্কৃতে হরে-দ্যুৎ-অস্ত্র অর্থাৎ নক্ষত্রের নয়নমুগ্ধকর আলো। হরি যেমন বিষ্ণুর নাম, সেই কারণেই জরথুস্ত্রকেও বিষ্ণুর একটি অংশ বলা যেতে পারে। জরথুস্ত্র ও হরি খ্রীষ্টান খ্রীষ্ট ও ভারতীয় কৃষ্ণের মত। এই জন্যই যিশু খ্রীষ্ট ও কৃষ্ণকে মিশিয়ে ভারতে 'কৃষ্ট' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। পরবর্তীকালে হিন্দু ধর্মে যে বহু মহান দেবতা লক্ষ্য করা যায় কোন না কোন ভাবে তাঁরা ঋগ্বেদের দেবতাদের সঙ্গেই যুক্ত। হিন্দুধর্মে শিব ও বিষ্ণু দুটিই বিখ্যাত দেবতা। ঋগ্বেদে শিবের উল্লেখ রয়েছে রুদ্র হিসেবে। তাঁর উদ্দেশে কয়েকটি সূক্তও রয়েছে। তবে ইন্দ্র, অগ্নি ও সোমের মত প্রথম দিকে রুদ্র ও বিষ্ণুর তেমন মর্যাদা ছিল না। যজুর্বেদ, অথর্ববেদ ও ব্রাহ্মণ সাহিত্যে তাঁদের মর্যাদা বেড়ে যায়। তবে তাঁদের প্রাধান্য পুরাণ সাহিত্য আবির্ভূত হবার আগে হয়নি। পুরাণ সাহিত্যে আদি বৈদিক দেবতারা পেছনের দিকে চলে যান, এঁরাই প্রথম দিকের আসন অধিকার করেন। পরে তাঁরা বিশ্ব ঋতের অংশ বলে গণ্য হন—যেমন অগ্নি তথাকথিত অগ্নির উপাদান হিসাবে প্রতিভাত হন। ফলে অনেকেই মনে করেন যে, রুদ্র ও বিষ্ণু বৈদিকধর্মে পরে আগত। রুদ্রের ইঙ্গিত স্পষ্টতই সিন্ধু উপত্যকার পশুপতির মধ্যে পাওয়া যায়। বিষ্ণু শব্দ দ্রাবিড়দের কাছ থেকে এসেছে বলে মনে হয়। 'বিন্' আকাশ এই শব্দই বিষ্ণুর উৎস। এই জন্য তাঁর বর্ণও নীল। প্রাগবৈদিক ভারতীয়দের দেবতা ছিলেন তাঁরা। পরে আর্যরা গ্রহণ করেন। অবশ্য এরকম মনে করার পেছনে যে কোন ঐতিহাসিক তথ্য রয়েছে তা নয়। সাহিত্যেও এমন কোন প্রমাণ নেই। সবই অনুমান মাত্র।

প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে কার কতবার উল্লেখ রয়েছে সেটাই তাঁদের গুরুত্বের পরিচায়ক নয়। আসলে প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যের অনেকটাই গুহ্য রয়ে গেছে আজও। সেই জন্য দেবদেবীদের গুরুত্ব বিচার করতে হবে তাঁদের কার্যপ্রণালী দ্বারা। এই অর্থে রুদ্র ঋগ্বেদে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দেবতা।

তিনি অন্যান্য দেবতার পিতাস্বরূপ। সকল দেবতাকেই রুদ্র বলা যেতে পারে। বৈদিক ঝড়ের দেবতা মরুৎগণকে রুদ্রের সন্তান হিসেবে দেখানো হয়েছে। ঋগ্বেদের ৬ষ্ঠ মণ্ডলের ৬৬নং সূক্তের ৩নং শ্লোকে তাই পাই ঃ

"রুদ্রসা যে মীড়হুষঃ সন্তি পুত্রা যাংশ্চো নু দাধৃবির্ভরধ্যৈ।
বিদে হি মাতা যহো মহী ষা সেৎপৃশ্নিঃ সুভ্বে গর্ভমাধাৎ।।"৩

অর্থাৎ "অভীষ্টদানকারী রুদ্রের যে মরুৎপুত্রগণ আছেন এবং যাঁদের অন্তরিক্ষ ধারণ করতে সক্ষম সেই মহান মরুৎগণের মাতা মহতী। ঐ অন্তরিক্ষ মনুষ্যগণের উৎপত্তির জন্য গর্ভে জল ধারণ করেন।" এর সংক্ষিপ্ত স্পষ্ট অর্থ এই—"মরুৎগণ দয়াপরবশ রুদ্রের সন্তান।" ইন্দ্র হলেন এই মরুৎগণের নেতা।

ঋগ্বেদে আমরা অগ্নিকেও রুদ্র হিসাবে পাই। ঋগ্বেদের চতুর্থ মণ্ডলের ৩নং সূক্তের প্রথম শ্লোকে তাই বলা হয়েছে ঃ

"আ বো রাজানমধ্বরস্য রুদ্রং হোতারং সত্যয়জং রোদস্যোঃ।
অগ্নিং পুরা তনয়িত্নোরচিত্তাদ্ধিরণ্যরূপমবসে কৃণুধ্বম্।।"১

অর্থাৎ "ঋত্বিকগণ, যজ্ঞের অধিপতি, দেবগণের আহ্বায়ক দ্যাবা পৃথিবী অন্নদাতা, সুবর্ণপ্রভ রুদ্রাগ্নিকে রক্ষার জন্য তোমরা বজ্ররূপ মৃত্যুর পূর্বেই সেবা কর।" এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, রুদ্র শব্দের আদি অর্থও বজ্র।

নাম দ্বারাই যে ঋগ্বেদের দেবতা বিচার করা যাবে তাও নয় কিন্তু। অনেক সময় ইন্দ্রকেও রুদ্র হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইন্দ্র হলেন রাজা, শাসক। এই জন্য তাঁর সম্পর্কে রাজা ও ঈশান শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। ঈশান অর্থ রুদ্র। বস্তুতঃ ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলের ২০নং সূক্তের তৃতীয় শ্লোকে এবং ৬ষ্ঠ মণ্ডলের ৪৫নং সূক্তের ১৭নং শ্লোকে ও অষ্টম মণ্ডলের ৯৩নং সূক্তের ৩নং শ্লোকে এবং অষ্টম মণ্ডলের ৯৬নং সূক্তের ১০নং শ্লোকে ইন্দ্রকে শিবই বলা হয়েছে। যেমন,

"স নো যুবেন্দ্রো জোহূত্রঃ সখা শিবো নরামস্তু পাতা।
যঃ শংসন্তং যঃ শশমানমূতী পচন্তং চ স্তুবন্তং চ প্রণেষৎ।।"
(ঋগ্বেদ ২/২০/৩)

অর্থাৎ "আমরা যজ্ঞ করছি। তরুণ আহ্বানযোগ্য সখাতুল্য শিব-ইন্দ্র আমাদের পালন করুন। যে সকল ব্যক্তি স্তোত্র উচ্চারণ করে ক্রিয়াসমাধান করে, হব্য রন্ধন করে ও স্তুতি করে, ইন্দ্র আশ্রয় দান ক'রে তাদের কর্মের পারে নিয়ে যান।"

"যো গৃণতামিদাসিথাপিরূতী শিবঃসখা। সত্বং ন ইন্দ্র মূলয়।।"
(ঋগ্বেদ ৬/৪৫/১৭)

অর্থাৎ "হে ইন্দ্র! তুমি রক্ষা দ্বারা শিবতুল্য ও মিত্রভূত। আমরা স্তব করলে পূর্বে তুমি বন্ধুত্ব প্রকাশ করেছ ; এখন আমাদের সুখী কর।"

"স না ইন্দ্রঃ শিবঃ সখাশ্বাবদেগামদ্যবমৎ। উরুধারেব দোহতে।।"
(ঋগ্বেদ ৮/৯৩/৩)

অর্থাৎ "সেই শিব, বন্ধু, ইন্দ্র আমাদের উদ্দেশ্যে অশ্বযুক্ত, গোযুক্ত, যবযুক্ত ধন পয়োবিশিষ্ট গাভীর ন্যায় দোহন করুন।"

"মহ উগ্রায় তবসে সুবৃক্তিং প্রেরয় শিবতমায় পশ্বঃ।
গির্বাহসে গির ইন্দ্রায় পূর্বীর্ধেহি তন্বে কুবিদঙ্গ বেদৎ ॥"১০

(ঋগ্বেদ ৮/৯৬/১০)

অর্থাৎ "পশু লাভের জন্য মহান উগ্র প্রবৃদ্ধ শিবতম ইন্দ্রের উদ্দেশে সুন্দর স্তুতি প্রেরণ কর। স্তুতিভাক ইন্দ্রের উদ্দেশে বহুপ্রকার স্তুতি বিধান কর। ইন্দ্র! পুত্রের জন্য বহুবিধ ধর্ম প্রেরণ করুন।" ইন্দ্রকে ঘোর ও উগ্র বলা হচ্ছে। পরবর্তীকালে শিবের ক্ষেত্রেও এই নামগুলি প্রযুক্ত হয়েছিল। ইন্দ্রের বর্ণনায় শিবেরই মত তাঁকে ভয়বিদূরক হিসেবে দেখানো হয়েছে। শিবেরই মত সৎ এবং মায়ার ঈশ্বর বলা হয়েছে তাঁকে। শিবের মত ইন্দ্র নর্তকও, তাই ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলের ২৪নং সূক্তের নবম ও দ্বাদশ শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ

"ইন্দ্র যথা হ্যস্তি তেহপরীতং নৃতো শবঃ।
অমৃক্তা রাতিঃ পুরুহূত দাশুষে ॥"৯

(ঋগ্বেদ ৮/২৪/৯)

অর্থাৎ "হে সকলের নর্তয়িতা ইন্দ্র! তোমার শক্তি শত্রুগণ অভিভব করতে পারে না। হে পুরুহূত। তুমি হব্যদায়ীকে যে দান কর কেউ তা হিংসা করতে পারে না।"

"নহ্যং গ নৃতো ত্বদন্যং বিন্দামি রাধসে।
রায়ে দ্যুম্নায় শবসে চ গির্বণঃ ॥"

অর্থাৎ "হে নর্তক স্তুতিভাক্ ইন্দ্র! অন্ন, দ্যুতিমান যশ ও শক্তি লাভার্থে তুমি ব্যতীত অপর কারো নিকট যাব না।"

শিবের মত ইন্দ্রেরও সহধর্মীর নাম শক্তি। তাঁর মায়েরও শক্তিদ্যোতক নাম 'শবসি'।

শিবকে অনেকে আর্যদেবমন্দিরে বহিরাগত বলে মনে করেন, কারণ তিনি ব্রাত্য। সেই অর্থে ইন্দ্রও ব্রাত্য। ইন্দ্র এমন কাজ করছেন দেখা যায় যা বিশ্ব-ছন্দকে ভঙ্গ করছে। এই কারণেই বৃত্রের সঙ্গে সংঘর্ষের সময় অন্যান্য দেবতা তাঁকে পরিত্যাগ করেছিলেন। ইন্দ্রের জননী তাঁকে অভিশপ্ত মনে করে লুকিয়ে রেখেছিলেন। এই জন্য ঋগ্বেদের চতুর্থ মণ্ডলের ১৮নং সূক্তের পঞ্চম শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ

"অবদ্যমিব মন্যমানা গুহাকারিন্দ্রং মাতা বীর্যেণা ন্যৃষ্টম।
অথোদস্থাৎ স্বয়মৎকং বসান আ রোদসী অপৃণাজ্জায়মানঃ ॥

অর্থাৎ "গুহাজাত ইন্দ্রকে নিন্দনীয় মনে করে মাতা তাঁকে বীর্যে পূর্ণ করেছিলেন। এরপর উৎপাদ্যমান ইন্দ্র তেজধারণ করে উত্থিত হলেন এবং দ্যাবাপৃথিবীকে পরিপূর্ণ করলেন।" এর যৌগিক একটি ব্যাখ্যাও সম্ভব। গুহা এখানে কুণ্ড অর্থাৎ মূলাধার। ইন্দ্র কুলকুণ্ডলিনীর বীর্য বা elan

vital. এই কুণ্ডলিনী জাগ্রত হলে দ্যুলোক ভূলোক তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়। অপর পক্ষে ইন্দ্রের অনার্যত্বও এতে প্রমাণ হতে পারে। গুহাজাত মানে গর্ভজাত। গর্ভ হল জার। পিতৃপরিচয় না থাকলে জারজাত সন্তানকে জারজ বলে। ইন্দ্রের পিতা অবশ্যই ছিল। কিন্তু তিনি তাঁকে হত্যা করেছিলেন। তাহলে কি এই পিতা আইনসম্মত নয়! আসলে এখানেও যোগের গুহ্যতত্ত্ব আছে। পিতাকে হত্যা করা মানে সহস্রারস্থ ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করা। যোগে কুণ্ডলিনীর ক্রিয়াকে পরব্রহ্মের নিস্তব্ধতার মধ্যে শেষ করলে এইজন্য মাতৃহত্যা বলা হয়। সাধক কবি রামপ্রসাদ এই জন্যই লিখেছিলেন 'এবার কালী তোমায় খাব।'

সে যাই হোক ইন্দ্রের পিতৃহত্যার বর্ণনা লক্ষ্য করা যাক। ঋগ্বেদের চতুর্থ মণ্ডলের ১৮নং সূক্তের দ্বাদশ শ্লোকে এর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এইভাবে ঃ

"কস্তে মাতরং বিধবামচক্রচ্ছয়ুং কস্তামজিঘংসচ্চরন্তম্।
কস্তে দেবো অধি মর্ডীক আসীদ্যৎপ্রাক্ষিণাঃ পিতরং পাদগৃহ্য ।।"১২

অর্থাৎ "হে ইন্দ্র তুমি ভিন্ন কে আপন মাতাকে বিধবা করেছে? তুমি যখন শায়িত থাক অথবা সঞ্চরণশীল থাক তখন কে তোমাকে বধ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করে? কোন্ দেবতা সুখদান বিষয়ে তোমা থেকে শ্রেষ্ঠ? যেহেতু তুমি তোমার পিতার পদদ্বয় গ্রহণ করে তাঁকে বধ করেছ।" পাদদ্বয় স্থূলতার প্রতীক মূলাধার। সেখান থেকে উঠেই ইন্দ্র সহস্রারে পৌঁছে শূন্যকে (পিতাকে) ভেদ (হত্যা) করেছেন।

সাধারণভাবে এ ধরনের কাজ নিশ্চয়ই আর্যরীতি বহির্ভূত। সুতরাং ইন্দ্রও সেই হিসেবে আর্য সমাজে ব্রাত্য। নতুবা শ্লোকটির অর্থ তাৎপর্য সহকারে ব্যাখ্যা করতে হবে। যেমন পরশুরামের মাতৃহননকে প্রকৃতি হত্যা করে পুরুষের নিকট যাবার প্রতীক বলে ধরে নিতে হবে। ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনায় মায়ের সঙ্গে সংগ্রাম এই কারণেই বড় কথা, যেমন 'আয় মা সাধন সমরে / দেখি মা হারে কি পুত্র হারে।'—রসিকচন্দ্র রায়

ইন্দ্রের সহধর্মিণীকেও দেখা যাচ্ছে ইন্দ্র সোম লাভ করবার আগে কুকুরের নাড়িভুঁড়ি খেতে বাধ্য হয়েছিলেন। ঋগ্বেদের চতুর্থ মণ্ডলের ১৮নং সূক্তের ১৩নং শ্লোকে এর উল্লেখ আছে। যেমন,

"অবর্ত্যা শুন আন্ত্রানি পেচে ন দেবেষু বিবিদে মর্ভিতারম্।
অপশ্যং জায়ামমহীয়মানামধা মে শ্যেনো মধ্বা জভার ।।"১৩

অর্থাৎ "আমি জীবনের উপায় না দেখে কুকুরের অন্ত্রসমূহ রন্ধন করেছিলাম। আমি দেবগণের ইন্দ্র ব্যতীত সুখদাতা পাইনি। আমি আমার ভার্যাকে অসম্মানিতা হতে দেখেছি। এরপর শ্যেন ইন্দ্র আমার জন্য মধুর পানীয় আহরণ করেছিলেন।" কুকুরের মাংস ভোজনও অনার্য খাদ্যতালিকাভুক্ত ব্যাপার। এতে আর্য সমাজে ইন্দ্রের বহিরাগত ভাব পাওয়া যায়।

ইন্দ্র সূর্যের মর্যাদাহানী পর্যন্ত ঘটিয়েছিলেন। ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলের ৩৩নং সূক্তের ৪র্থ শ্লোকে এবিষয়ে এই ধরনের উল্লেখ আছে ঃ

"পুরু যত্ত ইন্দ্র সন্ত্যুক্থা গবে চকর্থোর্বরাসু যুধ্যন্।
তত্তক্ষে সূর্যায় চিদোকসি স্বে বৃষা সমৎসু দাসস্য নাম চিৎ ।।"৪

অর্থাৎ "হে ইন্দ্র! যেহেতু তোমার অনেক স্তোত্র আছে। সুতরাং তুমি উর্বরা ভূমির উপর বারি বর্ষণ করার জন্য যুদ্ধ করে বিস্ময়কারিগণকে সংহার করেছ। হে কামনাপূরক! তুমি সূর্যের প্রতি অনুগ্রহ দেখানোর জন্য দাসের সঙ্গে তোমার গৃহে যুদ্ধ করে তাঁর নাম পর্যন্ত নষ্ট করেছ।"

ঊষার রথকেও তিনি ধ্বংস করেছিলেন। ঋগ্বেদের চতুর্থ মণ্ডলের ৩০নং সূক্তের নবম ও দশম শ্লোকে এর উল্লেখ আছে। যেমন,

"দিবশ্চিদঘা দুহিতরং মহান্মহীয়মানাম।
উষাসমিন্দ্র সং পিণক্ ।।৯
অপোষা অনসঃ সরৎসংপিষ্টাদহ বিভ্যুষী ।।
নি যৎসীং শিশ্নথদ্বৃষা ।।"১০

অর্থাৎ "হে মহান ইন্দ্র! তুমি দ্যুলোকের দুহিতা পূজনীয়া ঊষাকে পিষ্ট করেছিলে।"৯

অভীষ্টদানকারী ইন্দ্র যখন ঊষার শকট ভগ্ন করেছিলেন তখন ঊষা ভীতা হয়ে ভগ্ন শকট থেকে অবতরণ করেছিলেন।১০ ঊষার সঙ্গে ইন্দ্রের এই সংঘর্ষকে বস্তুবাদী ঐতিহাসিক ডি. ডি. কোশাম্বি এই ভাবে ব্যাখ্যা করেছেনঃ ঊষা তাঁর মতে প্রাগার্য দেবী (The Culture and Civilisation of Ancient India—D. D. Kosambi p. 84.)। ঊষা গ্রীক পুরাণ কাহিনীর ঊষাদেবী Eos-এর সমকক্ষা। তিনিই মেসোপটেমিয়াতে ইশতার নামে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তিনি ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হবার পরও পূজিতা হতেন। (An Introduction to the Study of Indian History—pp. 87-89) তাকে পশ্চিম এশিয়ার ইশতারের সঙ্গে তুলনা করা যায় এই কারণে যে, তিনি নগ্নবক্ষা ও নগ্নদেহ হয়ে সাধারণ মানুষের চোখে দেখা দিতেন। ইশতার ও তিনি উভয়েই অনেক সময় পক্ষযুক্তা অবস্থায় দেখা দিয়েছেন। অনার্য বলে ইন্দ্রের শত্রু হিসাবে গণ্যা হলেও ইন্দ্রও নিজেকে অনার্যিক প্রবৃত্তির ঊর্ধ্বে তুলতে পারেন নি। তাই মনে হয় ইন্দ্র ও ঊষা উভয়েরই মরমিয়া কোন ব্যাখ্যা থাকা সম্ভব—যা যোগের অভিজ্ঞতার দ্বারাই বর্ণনা করা যেতে পারে।

ইন্দ্র যুদ্ধপ্রিয়। রণক্ষেত্র থেকে কখনও পলায়ন করেন নি—ঋগ্বেদের ৫ম মণ্ডলের ৩৪নং সূক্তের ৪নং শ্লোকে এই ধরনের উল্লেখ আছে। যদিও বক্তব্য মরমিয়া আলো ছাড়া ধরা সহজ নয়। শিবেরই মত শুভ অশুভের তিনি বাইরে এবং নির্বিকার ভাবে দৈত্যাদি শত্রুদের দমন করেন। তাঁকে নির্যাতিত অন্ধ, খঞ্জ ও ব্রাত্যদের সাহায্য করতেও দেখা যায়। শিবেরও এটা গুণ। ব্রাত্যদের দ্বারা পূজিত। ঋগ্বেদের ২য় মণ্ডলের ত্রয়োদশ সূক্তের দ্বাদশ শ্লোকে ইন্দ্রের এই গুণের কথা বলা হয়েছে। যেমন,

"অরময়ঃ সরপসস্তরায় কং তুর্বীতয়ে চ বয্যায় চ স্রুতিম্ ।
নীচা সন্তমুদনয়ঃ পরাবৃজং প্রান্ধং শ্রোণং শ্রবয়ন্তসাস্যুক্থ্যঃ ।।"৩

অর্থাৎ "হে ইন্দ্র, তুমি তুর্বীতি বয্য যাতে অনায়াসে প্রবাহশীল নদী পার হতে পারে তার পথ করে দিয়েছ। তুমি অন্ধ ও পঙ্গু পরাবৃজকে তল থেকে উদ্ধার করে নিজেকে কীর্তিমান করেছ। সুতরাং তুমি স্তুতিযোগ্য।"

শিবকে যে অনার্য দেবতা বলা হয় তার কারণ তিনি বিশিষ্ট আর্য নেতা দক্ষের যজ্ঞ নাশ করেছিলেন। এটা পুরাণকাহিনীর কথা, ঋগ্বেদেরও নয়, মরমিয়া অভিজ্ঞতারও নয়। দক্ষযজ্ঞ নাশ করেছিলেন বলেই তিনি যজ্ঞনাশকারী নন। শিব দক্ষকে মানতে রাজি হননি বলেই তিনি তাঁকে 'বেদবাহ্য' অর্থাৎ বেদের বাইরে বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। কিন্তু দক্ষদুহিতা সতী স্বয়ং বলেছেন যে, শিব নিজেই যজ্ঞ। তিনি নিজেই বেদ।

তষ্টা-এর কাছ থেকে সোম চুরি করার মধ্যে ইন্দ্রের গায়ে শিবের একটা গন্ধ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের ৪৮নং সুক্তের ৪নং শ্লোকে এর বর্ণনা আছে। যেমন,

"উপস্তুরাযালভিভূত্যোজা যথাবশং তন্বং চক্র এষঃ।
ত্বষ্টারমিন্দ্রো জনুযাভিভূয়ামুষ্যা সোমমপিবচ্চমূষু ।।"৪

অর্থাৎ "তিনি উগ্র, শীঘ্র অভিভূতিপ্রবণ ও অভিভকর, পরাক্রান্ত হয়ে শরীরকে নানা রূপবিশিষ্ট করেছিলেন। ইন্দ্র ত্বষ্টাকে নিজের শক্তিদ্বারা পরাভূত করে তাঁর চমসস্থিত সোম পান করেছিলেন।" ত্রিত হিসাবে ত্বষ্টা-এর পুত্রকে বধ করার মধ্যে একটা গূঢ় ইঙ্গিত রয়েছে। তষ্টার পুত্রের তিনটি শির ছিল। এই তিন শিরে সাতটা রশ্মি ছিল। এর মধ্যে পুনরায় সপ্তচক্র এবং জাগ্রত, নিদ্রিত ও অর্ধজাগ্রত-অর্ধনিদ্রিত চিৎশক্তির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এতে মনে হয় সবটা সংগ্রামই যোগের মাধ্যমে রিপুর সঙ্গে সংগ্রাম। পরবর্তী কালে অধ্যাত্ম সাধনাকে এই জন্য সংগ্রাম হিসেবেই ব্যক্ত করা হয়েছে। ঋষি সত্যদেব 'সাধনসমর' গ্রন্থ রচনা করেছেন। সাধক কবি রসিকচন্দ্র রায় শক্তিসাধনা ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন ঃ

"আয় মা সাধন সমরে,
দেখি মা হারে কি পুত্র হারে।"

ত্বষ্টা বা তাঁর পুত্র যজ্ঞেরও প্রতীক। ত্বষ্টার মত পরবর্তীকালে দক্ষও প্রজাপতি বা জনগণের জন্য কর্মশীল ব্যক্তি। ইন্দ্র যে ত্বষ্টাকে হত্যা করেছিলেন তার মরমিয়া অর্থ এই যে, বিশ্বশক্তিকে জয় করে তিনি আত্মস্থ হয়েছিলেন।

শিবের দক্ষযজ্ঞনাশের বীজ ব্রাহ্মণের রুদ্র কর্তৃক প্রজাপতি নিধনের কাহিনীর মধ্যে নিহিত আছে। বেদের অইতরেয় ব্রাহ্মণে গল্পটা পাওয়া যায় (অঃ ব্রাঃ ৩/৩৩)। যজ্ঞ হল কালের উদম্ভের কাহিনী। এই কাল বা সময় দ্বারাই সৃষ্টি। সৃষ্টির পেছনে কালের এই ভূমিকা এখন বিজ্ঞানীরাও স্বীকার করেন। কাল একটি মাত্র। বিশ্ব উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে দেশের বুকে

এসেছিল। যদি সময়ের সঙ্গে আগে যাওয়া যায় ভবিষ্যতে যা ঘটেনি তাকেও ঘটে থাকতে দেখা যাবে। যদি অতীতে ফিরে যাওয়া যায়—অতীত জীবন্ত ভাবেই প্রতিভাত হবে। সময় ও মাধ্যাকর্ষণ অন্তরঙ্গ সঙ্গী। এই দুয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ এলে তবেই মানুষ সত্যকে জানবে। কিন্তু মাধ্যাকর্ষীয় শক্তির চরিত্র যেমন দুঃনির্ণেয় তেমনই সময়েরও। তাই বৈজ্ঞানিকেরা বলেছেন—সময় ও মাধ্যাকর্ষণ অন্তরঙ্গ সঙ্গী। মাধ্যাকর্ষণের চরিত্র এখনও সম্পূর্ণ জ্ঞাত নয়। সময়েরও। মানুষের ভাগ্য মাধ্যাকর্ষণ থেকেই এসেছে। তার রূপ নির্ণয় করেছে সময়।[৮] এই সময় ও দেশকে অতিক্রম করতে না পারলে সত্যকে জানা যাবে না। যজ্ঞের ইঙ্গিত এই চরম বৈজ্ঞানিক সত্যটিই। শিবের দক্ষযজ্ঞ নাশের গুরুত্ব সেইখানে। এই জন্য ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ১৬৪নং সূক্তের ৫০নং শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ

"যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাস্তানি ধর্মাণি প্রথমান্যাসন্।
তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত যত্র পূর্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ ॥"৫

অর্থাৎ "দেবগণ যজ্ঞ দ্বারা যজ্ঞ করছেন কারণ এটাই প্রথম ধর্ম। সেই মাহাত্ম্য আকাশে একত্রিত, যেখানে সাধনীয় দেবগণ পূর্ব থেকেই আছেন।"

মূল কথা দেবগণ যজ্ঞদ্বারা যজ্ঞকেই ত্যাগ করলেন। এটাই প্রথম বিধি।

যজ্ঞ অর্থ সর্বকিছুর অস্তিত্বকে নাস্তিতে নিয়ে যাওয়া। যে যজ্ঞ দ্বারা অর্থাৎ পরমের আত্মত্যাগ দ্বারা সৃষ্টি, সেই সৃষ্টিকে ত্যাগ করতে না পারলে পরমের মধ্যে ফিরে যাওয়া যাবে না। এই জন্য যজ্ঞের অর্থ হল সময় বা কালকে বলি দেওয়া। কালকে অতিক্রম করতে না পারলে শাশ্বতের সন্ধান পাওয়া যাবে না। এই শাশ্বতকেই বর্তমান বিজ্ঞান বলছে—Singularity.[৯]

ত্বষ্টা দক্ষেরই মত ঈশ্বরের বহিরাকৃতি। ইন্দ্র শিবের মত আন্তর-ঈশ্বর বা অধ্যাত্ম জ্ঞান। ইন্দ্রের সংগ্রাম ও শিবের সংঘাত উভয়েই আন্তরসত্তা ও বহিঃসত্তার সংঘর্ষ ব্যক্ত করে। ভারতীয় ঐতিহ্যে একটি হল আনুষ্ঠানিক আর একটি আধ্যাত্মিক। এতে অধ্যাত্ম সত্যকে আনুষ্ঠানিক সত্য অপেক্ষা বড় করে দেখানো হয়েছে। বিপরীত দুটি ঐতিহ্যের মধ্যে যে এই সংগ্রাম—তা আর্য ও অনার্য নয়। ইন্দ্র ও শিব—সেই ধরনের ঋষি, যাঁরা অন্তর্জগতকে

৮ Time and gravity are an intimate pair. Fischbach's work demonstrated that gravity has yet to be fully understood. The same is true for science.........Human destiny has been forced by gravity and sculped by time.—Masters of Time. John Boslough. p. 178.

৯ This was a theoritical abyss, a place beyond the beyond the end of the road, a place where space and time would simply disappear, it was known as a singularity.—Master of Time, John Boslough p. 184.

বহির্জগৎ অপেক্ষা বেশি মূল্য দেন। বর্ণ ও শ্রেণীরও তাঁদের কাছে কোন মূল্য নেই।

শিবের মত ইন্দ্রের এই নঙর্থক চরিত্র যদি বিচার করি তাহলে মনে হতে পারে যে, ইন্দ্র অনার্য-দেবতা। তা যদি হয় তাহলে ঋগ্বেদকে তার মুখ্য দেবতা বাদ দিয়েই পড়তে হবে। আসলে বেদেই আর্যদের ব্রাত্য হিসাবে দেখানো হয়েছে। চতুর্দিকে শত্রু পরিবেষ্টিত আর্যরা ছিলেন সংখ্যালঘু। এদের ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের ১৮নং সূক্তের ১ম শ্লোকে আছে ঃ

"ভবা নো অগ্নে সুমনা উপেতৌ সখেব সখ্যে পিতরেব সাধুঃ।
পুরুদ্রুহো হি ক্ষিতয়ো জনানাং। প্রতি প্রতীচী র্দহতাদরাতীঃ।।"৬

অর্থাৎ "হে অগ্নি! আমাদের প্রতি আগমন বিষয়ে অনুকূল হয়ে সখা যেমন সখার প্রতি ও পিতামাতা যেমন পুত্রের প্রতি হিতকারী হন তেমনই হিতকারী হও। মানুষ মানুষের দ্রোহকারী। সুতরাং তুমি প্রতিকুলাচারী শত্রুদের ভস্মসাৎ কর।" সুতরাং ব্রাত্য হিসেবে এখানে আর্যদেরই দেখা যাচ্ছে। এঁরা উভয়েই বাইরের আনুষ্ঠানিকতার বিরোধিতা করে আন্তর সাধনার উপর জোর দিয়েছিলেন। বৈদিক ঋষিরা বদ্ধ কোন সমাজের গোঁড়া যাজক সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না। এঁরা নতুন এক সংস্কৃতির উদ্ভাবক ছিলেন। শিবের মত ইন্দ্রও মানুষের অধ্যাত্ম শক্তি ও আত্মনের প্রতিনিধি। এঁরাই আমাদের অন্তরতম সত্তা যা স্থূল জগৎকে ও জাগতিক নিয়মকে অতিক্রম করে সূক্ষ্ম দিব্য জগতে নিয়ে যায়। ইন্দ্র ও শিব আমাদের মনুষ্যসত্তার অতিক্রমণিক দিক। মোক্ষদাতা। ইন্দ্র ও শিব আর্যদের অধ্যাত্ম চিন্তার প্রতীক। এঁদের ইঙ্গিত অদ্বৈত সত্যের দিকে, আত্মোপলব্ধির দিকে। একেশ্বরবাদ ও বহুদেববাদের পৃষ্ঠপোষক এঁরা নন। এই শেষোক্ত উভয় ধর্মবিশ্বাসেই ব্যক্তিকে দিব্য সত্তা থেকে পৃথক করে দেখানো হয়।

ঋগ্বেদে দেখা যাচ্ছে মরুৎগণ রুদ্রের সন্তান হিসেবে দেবতা নয়, ঋষি মাত্র। ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ৮৯ সূক্তের সপ্তম শ্লোকে দেখি ঃ

"পৃষদশ্বা মরুতঃ পৃশ্নিমাতরঃ শুভং যাবানো বিদথেষু জগ্ময়ঃ।
অগ্নি জিহ্বা মনবঃ সূরচক্ষসো বিশ্বে নো দেবা অবসা গমন্নিহ।।"৭

অর্থাৎ "যাদের বিন্দুচিহ্নিত অশ্ব রয়েছে, পৃশ্নি যাঁদের মাতা, যাঁরা সুন্দরভাবে বিচরণ করেন, যজ্ঞগামী সেই মরুৎগণ অর্থাৎ সূর্যনিভ চক্ষুসম্পন্ন মানবগণ, তাঁরা তাঁদের সকল করুণা নিয়ে এখানে আসুন।"

আসলে মরুৎগণ হলেন বৈদিক ঋষি। এঁরা পরবর্তী কালের সন্ন্যাসীদের মতন যাঁরা জ্ঞানান্বেষণায় ঘুরে বেড়ান। এঁদের যেমন আকাশভ্রমণের অভিজ্ঞতা (Astral travel) আছে, তেমনই এঁরা মানুষের মধ্যেও বিচরণশীল। তাঁরা ভ্রাম্যমান মৌনীবাবাদের মত।...তাই ঋগ্বেদের ৭ম মণ্ডলের ৫৬নং সূক্তের ৮নং শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ

"শুভ্রো বঃ শুষ্ম ক্রুধ্মী মনাংসি ধুনির্মুনিরিব শর্ধস্য ধৃষ্ণোঃ।।"৮

অর্থাৎ "তোমাদের শক্তি সর্বত্র। নীরব হলেও তোমাদের চিত্ত উগ্র।। ধর্ষণযোগ্য শক্তিযুক্ত মরুৎদের বেগ স্তোতার মত বিবিধ শব্দকারী।"

এঁদের বলা হয়েছে তরুণ ঋষি, যাঁরা সত্য-জ্ঞানের অধিকারী। ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলের ৫৮নং সূক্তের ৮ম শ্লোকে এঁদের সত্য জ্ঞানের সাক্ষ্য মেলে। যেমন—

"হয়ে নরো মরুতো মৃলতা নস্তুবীমঘাসো অমৃতা ঋতজ্ঞাঃ।
সত্যশ্রুতঃ কবয়ো যুবানো বৃহদ্গিরয়ো বৃহদুক্ষমাণাঃ।।"৮

অর্থাৎ "হে মরুৎগণ। তোমরা আমাদের প্রতি অনুকূল হও। তোমরা নেতা, বিপুল ঐশ্বর্যশালী, অবিনশ্বর, বারিবর্ষক, সত্যনিবন্ধন, জ্ঞানসম্পন্ন, তরুণ, প্রচুর স্তুতিযুক্ত ও বর্ষণকারী।"

পুরাণে শিব ভ্রাম্যমান সন্ন্যাসী, যোগী। ঋগ্বেদে তিনি রুদ্র হিসাবে মরুৎগণের পিতা। ইন্দ্র এই মরুৎদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ বলে শিবেরই পুত্র। বৈদিক দেবতারা দিব্যপুত্রের দেবতারূপ, তাঁদের পিতা দিব্যপিতা রুদ্র-শিব। দেখা যাচ্ছে পরবর্তীকালে শিবপুত্র স্কন্দকে অগ্নির সঙ্গে সমার্থক করে দেখানো হয়েছে। গ্রহ হিসাবে তিনি মঙ্গলগ্রহ, অগ্নির দেবতা। ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলের দ্বিতীয় সূক্তের ১ম শ্লোকে তাই বলা হয়েছে ঃ

কুমারং মাতা যুবতি সমুব্ধং গুহা বিভর্তি ন দদাতি পিত্রে।
অনীকমস্য ন মিনজ্জনাসঃ পুরঃ পশ্যন্তি নিহিতমরতৌ।।১

অর্থাৎ "যুবতী মাতা কুমারকে নিহত দেখে গুহার মধ্যে ধারণ করলেন। পিতার কাছে ছিলেন না। জনগণ তাঁর হিংসারূপ দেখতে পেল না। কিন্তু অরণিস্থানে স্থাপিত হলে দেখতে পেলেন।" এখানে কুমার অর্থ অগ্নি। মাতা হলেন অরণি অর্থাৎ অগ্নি জ্বালাবার কাষ্ঠ। পিতা—যাঁরা কাষ্ঠ থেকে অগ্নি প্রজ্বলিত করেন অর্থাৎ যজমান। লোকে অরণিস্থ অগ্নিকে দেখতে পায় না, কিন্তু অরণি-প্রজ্বলিত অগ্নিকে দেখতে প্রায়। স্কন্দ বা কুমারের পৌরাণিক কাহিনীতে তাঁর জন্ম হয়েছিল অগ্নিকে নিক্ষিপ্ত শিবের বীর্য থেকে। এই জন্য এই দেবপুত্রের নাম অগ্নিস্কন্দ। ঋগ্বেদে এর সাক্ষ্য আছে। উপরোক্ত শ্লোকে সেই কথাই বলা হয়েছে। সকল দেবপুত্র—ইন্দ্র, অগ্নি, সোম, সূর্য সবাই রুদ্র-শিবের পুত্র। এই দেবপুত্রদের দেখে অলক্ষ্যে তাঁদের পিতাকে বিস্মৃত হলে চলবে না। স্কন্দের কার্যকলাপ যেমন শিবের গুরুত্বকে কমিয়ে দেয় না, তেমনই ঋগ্বৈদিক দেবতাদের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত সূক্তের জন্য তাঁদের পিতারও গুরুত্ব হ্রাস পায় না।

ঋগ্বেদে বিষ্ণু হলেন সূর্যেরই এক রূপ। তিনি এক বিশেষ আদিত্য। প্রথম দিকে তাঁর গুরুত্ব তেমন ছিল না। সেই জন্য অনেকে মনে করেন তিনি বহিরাগত। দ্রাবিড়দের 'বিন্' অর্থাৎ আকাশ এই শব্দ থেকে বিষ্ণু শব্দ এসেছে বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু তিনি তা নন। তিনি সূর্যেরই ভিন্নরূপ। সূর্য-নারায়ণ হিসেবে তিনি অন্যান্য সূর্যদেবতাকে আত্মস্থ করে নিয়েছেন। সুতরাং বিভিন্ন সূর্যের নামে যে সকল সূক্ত লেখা হয়েছে সবই বিষ্ণুর সঙ্গে সংপৃক্ত।

বিষ্ণুকে দেখা যায় তিনি মরুৎগণের নেতা হিসাবে স্বীকৃত। সেই জন্য ঋগ্বেদে তাঁকে 'এবায়মরুৎ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁকে ইন্দ্রের সহকারী হিসাবেও দেখানো হয়েছে। কতটা সূক্ত বিষ্ণুর নামে উৎসর্গীকৃত হয়েছে তা দিয়ে তাঁর গুরুত্ব বিচার করা যাবে না। তাঁর ব্যাপ্তি দিয়ে বিষ্ণু সকল দেবতাকেই গ্রাস করে বসেছিলেন। সূর্যদেবতা হিসাবেই ঋগ্বেদে বিষ্ণু এত গুরুত্ব পেয়েছেন। সেই জন্যই নারায়ণ হিসেবে অদ্যাবধি তিনি জনগণের কাছে 'সূরযনারায়ণ'।

প্রকাশ্যে ঋগ্বৈদিক সূক্তে মহিলা দেবতার নাম তেমন উল্লেখ করা হয়নি। এই জন্য অনেকে মনে করেন যে, ঋগ্বেদ মূলতঃ পুরুষপ্রধান ধর্মগ্রন্হ। তবে মনে রাখতে হবে যে, বৈদিক দেবতা প্রকৃতির বিভিন্ন দিকের দেবতা। তাঁদের নির্দিষ্ট কোন মানবাকৃতি রূপ নেই। বরং পশু হিসেবেই তাঁদের বর্ণনা বেশি পাওয়া যায়—যেমন গাভী, অশ্ব ইত্যাদি। তবে বেদে অনেক মহিলাবোধক শব্দ আছে। 'বেদ' 'বাক্' হিসেবে নিজেই দেবী রূপে পূজিতা। বেদ প্রাচীনতম কাল থেকেই মা হিসাবে স্বীকৃত। সুতরাং দেবতাদের নাম দিয়ে বেদের পুরুষ-প্রধান চরিত্র বিচার করা সহজ নয়। কারণ যে ভাষায় দেবতাদের স্তুতি করা হচ্ছে বৈদিক ঋষিরা সেই ভাষাকেই মাতৃরূপে কল্পনা করেছিলেন। সুতরাং বেদের সর্বত্রই এই মহিলাশক্তি বিরাজমানা। সেই জন্য বেদে ও পরবর্তী হিন্দুধর্মে মাতৃপূজা বিশেষ এক স্থান অধিকার করে আছে। এই দেবী বা মাতৃ আরাধনার মধ্য দিয়েই বর্তমানে ভারতে বৈদিক ধর্ম টিকে আছে। বৈদিক যজ্ঞ হল অহংতত্ত্ব বিসর্জন দেবার প্রতীক। শাক্ত কবিরাও মাতৃ আরাধনাকে সংগ্রাম বলেন। এই সংগ্রামে মা বা প্রকৃতিকে জয় করেই যেতে হয়। বৈদিক যজ্ঞই মাতৃ আরাধনার রূপ নিয়েছে। দেবাসুরের যুদ্ধে দেবী দুর্গা অসুরদের বধ করেছিলেন, অর্থাৎ পার্থিব বস্তুর প্রতি অনুরক্ত ইন্দ্রিয়দেরই হত্যা করে-ছিলেন। চণ্ডীতে একথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান। ৺কালীর গলার মুণ্ডমালা একান্ন সংস্কৃত অক্ষরের প্রতীক। এই বর্ণগুলি আবার বিশ্বতরঙ্গের বিভিন্ন ধাপ। সুতরাং মন্ত্রও প্রকৃতিজাত, সুতরাং মন্ত্রও স্ত্রীলিঙ্গ। এই কারণেই দেবীবন্দনা কালে বৈদিক মন্ত্রই উচ্চারিত হয়।

হিন্দু দেবীদের আবির্ভাব বৈদিক প্রতীকার্থ থেকে। দেবী কালিকাকে মুণ্ডক উপনিষদে প্রথম দেখা যায় (মুঃ ২/৪)। অগ্নির প্রথম স্ফুরিত জিহ্বার নামই কালী। মুণ্ডক উপনিষদে এমন বলা হয়েছে ঃ

"কালী করালী চ মনোজবা চ
সুলোহিতা যা চ সুধুম্রবর্ণা।
স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী চ দেবী
লোলায়মানা ইতি সপ্ত জিহ্বাঃ ॥"

অগ্নির এই জিহ্বার কথা ঋগ্বেদেও উল্লেখিত আছে। তবে জিহ্বাগুলির নাম দেওয়া হয়নি। কারো কারো মতে ঋগ্বেদের রাত্রি সূক্তের রাত্রিদেবীই পরবর্তী কালে ৺কালী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ তাঁকে বৈদিক নিঋর্তি

দেবীর সঙ্গে এক করে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। শতপথ ব্রাহ্মণে ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণে নির্ঋতি দেবীর উল্লেখ আছে। শতপথ ব্রাহ্মণে দেবীকে কৃষ্ণ ও ঘোরা বলা হয়েছে ঃ

"কৃষ্ণং হি তত্তম আসীদথ কৃষ্ণা বৈ নির্ঋতিঃ। (৭/২/৭)
ঘোরা বৈ নির্ঋতিঃ ; (৭/২/১১)।"

কারো কারো মতে ৺কালী অগ্নির অন্ধকার দিক। ভস্মও জ্বলন্ত অঙ্গার স্বরূপ। অগ্নির নিবিড় নীল শিখাই তিনি—তাপ সর্বাপেক্ষা বেশি। এই জন্য তাঁকে স্বাহা ও স্বধাও বলা হয়। এই দুটি শব্দ প্রয়োগ করে অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয়। স্বধা শব্দের বিরাট তাৎপর্য আছে। স্বধা মানে নিজেই নিজের সৃষ্টিকর্তা। তার অস্তিত্বের জন্য জাগতিক বা মহাজাগতিক কোন কিছুরই প্রয়োজন হয় না। তিনি এক এবং অদ্বিতীয়—"আনীৎ অবাতম্ স্বধয়া তৎ একম।" ভারতের যিনি স্বধা ইরাণে তিনিই খোদা। স্বাপঃ এই সংস্কৃত শব্দের অর্থ নিদ্রা। ইরাণের ভাষায় খবাব্। তেমনই স্বধাও খোদা হতে পারে। তবে তন্ত্র মতে ৺কালী মহাজাগতিক আদ্যাশক্তি। একান্নটি তরঙ্গে জগৎ সৃষ্টি করেছেন বলে একান্নটি বর্ণে অর্থাৎ অক্ষরে মুণ্ডমালা গলায় পরে আছেন। সেই জন্য ৺কালীই মন্ত্র। এই মন্ত্রই অগ্নিকে সমর্পণ করা হয়। কালী সেই হিসেবে যজ্ঞাগ্নির স্ত্রীরূপ। মূলতঃ **Black hole**-এর বিস্ফোরণে যে 'সময়' বা কালের উদ্ভব হয়েছিল সেই কালের অধিশ্বরী হিসেবেই আদ্যাশক্তি কালী। এর বর্ণনা বিস্তারিত ভাবে পাবেন বর্তমান লেখকের 'দেবদেবীর উৎস সন্ধানে' গ্রন্থে। ৺কালী মূলতঃ শ্রেষ্ঠ বৈদিক যজ্ঞ অর্থাৎ আত্মযজ্ঞ। এই আত্ম-যজ্ঞে অহং তত্ত্বকে দিব্যসত্তায় বিসর্জন দেওয়া হয়। সেই জন্য ৺কালীপূজাকে যজ্ঞ পূজা অর্থাৎ যজ্ঞের স্ত্রীলিঙ্গের পূজা বলা যেতে পারে। এবং সেই জন্য ৺কালীর মূলসূত্র বেদের মধ্যেই রয়েছে।

সুতরাং কেউ যে বলবেন শিব ও তাঁর সহধর্মিণী হিন্দুধর্মে বৈদিক বৃত্তের বাইরে থেকে এসেছেন, একথা ঠিক নয়। বরং বৈদিক যজ্ঞকে তাঁরাই সর্বাপেক্ষা বেশি ব্যক্তিরূপ দিয়েছেন। বৈদিক আন্তরসত্যের তাঁরা প্রতিনিধি। শিব সোমপায়ী। এই সোমই তাঁর মাথায় অর্ধচন্দ্র হয়ে শোভা পাচ্ছে। এই সোম জ্যোতির জগতের নিবিড় জ্যোতি, যে জ্যোতির মধ্যে প্রবেশ করলে নেশাগ্রস্তের মত নিদ্রার আলস্য জন্মে। যাঁরা যোগ করেননি তাঁরা এই সোম পর্যায়ের তাৎপর্য বুঝতে পারবেন না। শিব হলেন চরমানন্দ। চরমনেশা ও চরম ত্যাগের প্রতীক। পরবর্তীকালে ভারতীয় ভাস্কর্যে তাই প্রশান্ত ধ্যাননেত্র-শিব ফুটে উঠেছেন। যোগসিদ্ধ গৌতম বুদ্ধের মূর্তির মধ্যেও এই ভাব ফুটে উঠেছে।

শৈব ও বৈদান্তিকদের কতকগুলি কঠোর তপস্যার প্রণালী, ত্যাগ এবং পবিত্রতার যে ভাব তা সবই বৈদিক যজ্ঞ ব্যবস্থারই মূল সূত্র ধরে এসেছে। এ সবই হল বেদের আধ্যাত্মিক দিক। শিব ও ৺কালীর নাম ঋগ্বেদে তেমন স্পষ্ট কিনা সেটা কোন ব্যাপার নয়। বেদের সকল শিক্ষার তাঁরা

সংক্ষিপ্ত প্রতীক। তাঁদের ভাবের মধ্যেই রয়েছে সমগ্র বৈদিক শিক্ষার মূল তত্ত্ব।

বিষ্ণুও সেই অর্থে যজ্ঞবাচক। শ্রীমদ্ভগবদগীতাতে তাই বলা হয়েছে যে, যজ্ঞই বিষ্ণু। বিষ্ণু হলেন যজ্ঞের আলো। তাঁর সহধর্মিণী লক্ষ্মীকে পূতঃ যজ্ঞাগ্নির মধ্য দিয়েই আরাধনা করা হত। তিনি মহৈশ্বর্য—দিব্যসত্তার সঙ্গে সংযোগ সাধন করা গেলে মানুষের যা করায়ত্ত হয়।

সাধারণ বিশ্বাস এই যে, তন্ত্রের যে আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠান সেটা অনার্য, তন্ত্রের দার্শনিক দিকটি বৈদান্তিক ঐতিহ্যের অনুসারী। আসলে তন্ত্রকে যাঁরা আভিচারিক ক্রিয়া দ্বারা বুঝেছেন—তাঁরা তন্ত্রের অভ্যন্তরে যেতে পারেন নি। তন্ত্র সম্পর্কে বলা হয়েছে "তন্যতে বিস্তারিয়তে জ্ঞানম অনেন ইতি তন্ত্রম।" যে জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়ে তারণ করে তাই তন্ত্র। সত্য জ্ঞানই এর মূল লক্ষ্য। বেদের মূলকথাও জ্ঞান। সুতরাং মূল সুরে তন্ত্র কখনও বেদ বিরোধী নয়। কিন্তু তন্ত্রের বাইরের দিক দেখে বড় বড় ঐতিহাসিকও ভুল করেছেন। তবে রোমিলা থাপারের মত ঐতিহাসিকও মনে করেন যে তন্ত্র বেদের সহজীকরণ। তিনি বলেছেন—"তন্ত্রতত্ত্বের উৎপত্তি খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে। ৮ম শতাব্দী থেকে রীতিমত প্রচলিত হয়। উত্তর ভারত ও পূর্ব ভারতেই ছিল এর শক্ত ঘাঁটি। তিব্বতের সঙ্গে তন্ত্রের নিবিড় সম্পর্ক। এর কিছু অনুষ্ঠান নিশ্চিতরূপেই তিব্বত থেকে এসেছিল। বলা হয় তন্ত্র বৈদিক ধর্মকে সরলীকৃত করেছে। সকলের কাছেই শ্রেণী নির্বিশেষে তন্ত্রের দুয়ার অবারিত ছিল। এমনকি মহিলারাও এতে যোগ দিতে পারতেন। গোঁড়া সংস্কারপন্থীদের বিরুদ্ধে তন্ত্র-আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল। তন্ত্রের মধ্যে রয়েছে প্রার্থনা, রহস্যময় বিধিসমূহ, জাদু-নক্শা, প্রতীক এবং দেবতা আরাধনা। মাতৃমূর্তিকে এখানে বিশেষ ভক্তি করা হয় কারণ মায়ের গর্ভ থেকেই সবকিছু এসেছে। গোঁড়া হিন্দু ধর্মানুষ্ঠান ও ব্রাহ্মণ্য শ্রেণীনির্ভর সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপই এর উদ্ভব হয়েছিল। তন্ত্রের মধ্যে অশাস্ত্রীয় রীতিসমূহ প্রবেশ করেছিল, যেমন শক্তি-আরাধনা। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা ও রীতিনীতির বিরুদ্ধে ছিল এর প্রতিবাদ।"[১০]

[১০] Tantrism had originated in the sixth century but became current from the eighth century onwards. It was strongest in north-eastern India and had close ties with Tibet, some of its ritual doubtlessly coming from Tibetan practices. It claimed to be a simplification of the vedic cults and was open to all castes as well as to women which identified it with the anti-orthodox movement. Tantric practice centred on prayer, mystical formulae, magical diagrams and symbols and the worship of a particular deity. The mother image

অশাস্ত্রীয় বলতে যদিও এর ইঙ্গিত অনার্য ধর্মের দিকেই যায়, তবুও গভীর ভাবে বিচার করে দেখলেই দেখা যাবে যে যোগেরই মত তন্ত্রও বেদেরই অন্তরঙ্গ সুর। তবে ব্যবহারিক দিক থেকে আনুষ্ঠানিক। সেই জন্যই তন্ত্রে মন্ত্রের প্রাধান্য, পুরাণ কাহিনীর প্রাধান্য, যজ্ঞাগ্নিতে বলি দেবার প্রথা এবং দিব্যশক্তির ভয়ংকর রূপের উপাসনার ব্যবস্থা। তবে তন্ত্রের মন্ত্র কিন্তু সংস্কৃতভিত্তিক। এর মধ্যে অনেকগুলিই এসেছে বেদের সূক্ত থেকে। যেমন 'হুম' এই বীজ মন্ত্র অগ্নিরও বীজ। অগ্নিকে হোতৃ বলা হয়। তার মানে আহ্বায়ক। বৈদিক দেবতাদের সাধারণত 'হুঁ' বীজ দিয়েই আহ্বান করা হোত।

তন্ত্রের যে যজ্ঞ ব্যবস্থা তা বৈদিক যজ্ঞ ব্যবস্থারই মতো অগ্নিকুণ্ড জেলে করা হয়। তন্ত্রের দেবতারা তাঁদের শক্তি ও ভয়ংকরিতা নিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই বৈদিক দেবতাদের মত। আসলে বৈদিক ধর্মের বাহ্য আনুষ্ঠানিকতার অনেক কিছুই তন্ত্রে দেখা যায়। বৈদিক দার্শনিকতা এখানে অনুপস্থিত বলে মনে হয়। আসলে এর মধ্যে গভীর দার্শনিকতাও রয়েছে। যেমন তিব্বতী তন্ত্রের 'ওঁ মণিপদ্মে হুম' বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। 'ওঁ' হল **Black hole**-এর বিস্ফোরণ জাত শব্দ। পদ্ম হল নিউট্রন ফিল্ড। মণি হল বজ্র বা শূন্যতা। মূলতঃ সেই শূন্যতাকেই আহ্বান করা হয়। জগতের মূলে কিন্তু শূন্যতাই সত্য। শূন্যতা ছাড়া আর কিছু নেই। তাই বিজ্ঞানও বলেছে—"যদি আমরা মাধ্যাকর্ষীয় ক্ষেত্রের অভ্যন্তরস্থ তেজ বিচার করি, দেখব যে তা নঙর্থক। সমগ্র ব্যবস্থার তেজই বস্তুতপক্ষে শূন্য।······শক্তিসংরক্ষণ নীতির কোন বিচ্যুতিই ঘটবে না যদি 'কিছু নয়' থেকেও এই শক্তি এসে থাকে।"[১১] সুতরাং তন্ত্রে বৈদিক ধর্মের দার্শনিকতার দিকের অভাব আছে তা নয়। যদি বেদের

was accorded great veneration, since life was created in mother's womb. ···it originated in a conscious and deliberate opposition to the orthodox Hindu ritual and the Brahmanical ordering of society, which it expressed by incorporating non-orthodox cults such as the worship of sakti and by protesting against what were regarded as the established standards of social behaviour—A History of India Vol I. Romila Thapar. p. 261-62.

১১ However if we calculated the energy locked within its gravitational field, we would find that it is negative. The total energy of the system may in fact, actually be zero······ there was no violation of the conservation of energy when it was created out of nothing.—Beyond Einstein Michio Kaku and Jennifer Trainer—p. 191.

অশ্বমেধ যজ্ঞ লক্ষ্য করি তাহলে তন্ত্রের আনুষ্ঠানিকতার সঙ্গেই তার বেশি মিল খুঁজে পাব। বৈদিক দর্শনের সঙ্গে তার সম্পর্ক বরং কম। তবে গভীর ভাবে বিচার করে দেখলে নিবিড় দার্শনিকতাও এতে পাওয়া যাবে। বৃহদারণ্যক উপনিষদেও তন্ত্রজাতীয় অশ্বমেধ যজ্ঞের ভাব দেখা যায়। এর আরম্ভও দার্শনিকতা দিয়ে নয়।

তন্ত্র-দর্শনেও অগ্নি, সোম, সূর্য প্রভৃতি দেবতারা যৌগিক শক্তিতে উদ্ভাসিত। সূক্ষ্মদেহের বিভিন্ন চক্রের সঙ্গে তার সম্পর্ক। কাশ্মীর শৈবতত্ত্ব, তন্ত্র-দর্শনের মধ্যে যাকে সর্বোৎকৃষ্ট বলা হয়, যেখানে মন্ত্র চূড়ান্ত শক্তি অর্জন করেছিল—তার উৎসও বৈদিক মন্ত্র। সুতরাং তন্ত্রকে বেদবহির্ভূত বলা চলে না।

হিন্দুদের মতে সৃষ্টিতে চারটি যুগ আছে—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। প্রত্যেক যুগের জন্য নির্দিষ্ট ধর্মশাস্ত্র আছে। সত্য বা কৃত যুগের জন্য বেদ, ত্রেতার জন্য স্মৃতিশাস্ত্র, দ্বাপরের জন্য পুরাণ, কলিযুগের জন্য আগম বা তন্ত্রশাস্ত্র। কুলার্ণবতন্ত্রে এই জন্য বলা হয়েছে ঃ

"কৃতে শ্রুত্যুক্ত আচারস্ত্রেতায়াম স্মৃতি সম্ভবঃ।
দ্বাপরে তু পুরাণোক্তঃ কলাবাগমসম্মতঃ॥"

কলিযুগের জন্য আগম বিশিষ্ট ধর্মশাস্ত্র হলেও তার অর্থ এই নয় যে এই শাস্ত্র বেদবিরোধী। সামগ্রিক ভাবে আগম বেদের শিক্ষাই দিয়ে থাকে যেমন দেয় পুরাণ ও স্মৃতিশাস্ত্র। জীবাত্মার সঙ্গে যেমন পরমাত্মার সম্পর্ক তেমনই তন্ত্রের সঙ্গে বেদের। বেদের মূল সূত্রই রয়েছে তন্ত্রে।[১২]

সাধারণ ধারণা এই যে, ঋগ্বেদের কালে 'ওঁ' শব্দ জ্ঞাত ছিল না—কারণ ঋগ্বেদে ওঁ শব্দ পাওয়া যায় না। ব্রাহ্মণ-সাহিত্যের শেষ দিকে ও উপনিষদে 'ওঁ' শব্দ পাওয়া যায়। তবে এ সম্পর্কে মনে রাখতে হবে যে, ঋগ্বেদ একটি রহস্যময় ধর্মগ্রন্থ। ঋষিদের জ্ঞানের সবটাই সেখানে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয় নি।

১২ For each of the ages suitable sastra is given, for Satya or Krita the vedas, for Treta Smriti sastra, for Dvapara the Puranas and for Kaliyuga the Agama or Tantra sastra······ when it is said that Agama is the peculiar scripture of the Kali age, this does not mean that something is presented which in opposed to Veda······The Agama, however as a whole, purports to be a presentment of the teaching of Veda just as the Puranas and Smritis are······Indeed the Sakta followers of the Agama claim that its Tantras contain the very core of the Veda to which it is described to bear the same relation as the supreme spirit (paramatma) to the embodied spirit (Jivatma).—Sakti and Sakta—Sir John p. 5.

ঋগ্বেদে বিশেষভাবে 'ওঁ'-এর উল্লেখ না থাকলেও পবিত্র শব্দ বা মন্ত্রের উপর জোর ছিলই। মন্ত্রের মধ্য দিয়েই দেবতারা আত্মপ্রকাশ করেন—এই বিশ্বাস ছিল। এই পবিত্র শব্দ 'ওঁ'-ও হতে পারে। তৈত্তিরিয় উপনিষদের ১-৩-৯-এ বলা হয়েছে—"মন্ত্রের বৃষকে—যার সবরকম আকৃতি রয়েছে, যিনি অবিনাশী, মন্ত্র থেকে জন্ম নিয়েছেন, ইন্দ্র আমাকে সেই কথা বলে জ্ঞান দান করুন।" বিখ্যাত ঋষি বামদেব শব্দের বৃষকে বলেছেন ঃ

"বয়ং নাম প্র ব্রবামা ঘৃতস্যাস্মিন্যজ্ঞে ধারয়মা নমোভিঃ।
উপ ব্রহ্মা শৃণবচ্ছস্যমানং চতুঃ শৃঙ্গোহবমীদ্গৌর এতৎ ।।২
চত্বারি শৃঙ্গা ত্রয়ো অস্য পাদা দ্বে শীর্ষে সপ্তহস্তাসোঅস্য।
ত্রিধাবদ্ধো বৃষভো রোরবীতি মহোদেবো মর্ত্যাঁ আ বিবেশ ।।"৩

অর্থাৎ "আমরা ঘৃতের নাম স্তব করব। এ যজ্ঞে নমস্কার দ্বারা তা ধারণ করব। ব্রহ্মণস্পতি (সম্ভবতঃ যজ্ঞীয় অগ্নি বা আদিত্য) এই স্তব শ্রবণ করুন। চার শৃঙ্গবিশিষ্ট গৌরবর্ণ দেবতা এ জগৎ নির্বাহ করছেন। এর চারটি শৃঙ্গ, তিনটি পাদ, দুটি মস্তক ও সাতটি হস্ত। ইনি অভীষ্টদানকারী তিন প্রকারে বন্ধ হয়ে অত্যন্ত শব্দ করছেন। মহতী দেবতা মর্ত্যবাসীর মধ্যে প্রবেশ করছেন।" সম্ভবতঃ এখানে 'ওঁ' শব্দের দিকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে। 'ওঁ'-এর মূলতঃ চারটি স্তর—পরা, পশ্যন্তি, মধ্যমা ও বৈখরী। তিনটি পাদ—সাধারণ মতে অ-উ-ম-ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর। দুটি মস্তক অর্থাৎ বর্ণের দিক থেকে দুই যেমন—'ওম্'। সাতটি হস্ত অর্থাৎ পরা, পশ্যন্তি মধ্যমা ও বৈখরীরূপে সত্তার সাতটি স্তর—সপ্তচক্র ব্যাপ্ত করে আছেন।[১৩] সুতরাং 'ওঁ'-এর একটা সূক্ষ্ম ইঙ্গিত এখানে রয়েছে বলে মনে হয়।

উপনিষদেও 'ওঁ'-এর চারটি দিক্ আছে বলে বলা হয়েছে। যেমন জাগ্রত, স্বপ্নময়, সুষুপ্তিময় ও নির্ভেজাল চৈতন্যময় অবস্থা। ঋগ্বেদের নানা সূক্তের গাণিতিক ব্যাখ্যা ও ঋগ্বৈদিক যজ্ঞ ওঁ-এরই বিভিন্ন স্তর সূচিত করে। সপ্ত ঋষিও হয়তো ওঁ-এর সপ্ত তেজ হতে পারেন। সূর্য হলেন ওঁ-এর বিন্দু বা জ্যোতি। সপ্তঋষি তার তেজ কুলকুণ্ডলিনী, ইন্দ্র প্রাণশক্তি। সামবেদ হল সূর্যস্তব মাত্র। এই স্তব 'ওঁ'-এর সমার্থবোধক। 'ওঁ' হল আদিকাল থেকেই বেদের প্রধান মন্ত্র। আদি, মধ্য, অন্ত সর্বত্রই ওঁ রয়েছে। 'ওঁ'-এর মধ্য দিয়েই বেদের চূড়ান্ত জ্ঞান অর্জন করা যেতে পারে। 'ওঁ' হল বেদের ব্রহ্মণ বা দিব্য শব্দ। উপনিষদে তাই হল ব্রহ্মণ ও মহাজাগতিক সত্য—শব্দ ব্রহ্মণ (শব্দ ব্রহ্মণের বিস্তৃততর ব্যাখ্যার জন্য লেখকের 'দিব্য জগৎ ও দৈবী ভাষা' গ্রন্থের দুটি খণ্ডই পড়ুন)। ওঁ-এর মধ্য দিয়েই সোমরূপ অমৃত-প্রবাহ প্রবাহিত। উপনিষদের মতে সূর্যের মধ্যে 'ওঁ'-ই ধ্বনিত হচ্ছে। ঋগ্বেদের প্রধান পৌরাণিক

---

১৩ বিস্তৃত বর্ণনার জন্য লেখকের দিব্যজগৎ ও দৈবী ভাষা ২য় খণ্ড দেখুন। ও **Cocepts of Space Ancient and Modern—Kapila Vatsayan** দেখুন।

কাহিনী এই—যেখানে দেখানো হচ্ছে—ঋষি ও দেববৃন্দ একত্রে অন্ধকার থেকে সূর্যকে পুনর্জাগরিত করছেন। চতুর্থ ব্রহ্মণ দ্বারাই এই কার্য সম্পাদিত হচ্ছে। এই চতুর্থ ব্রহ্মণ হল 'ওঁ'-এর শেষ ধাপ, বৈখরি ধাপ যেখানে জগৎ স্থূল ও ও দৃশ্যগোচর হয়। ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলের চল্লিশতম সূক্তের ৬ষ্ঠ শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ

"স্বর্ভানোরধ যদিন্দ্র মায়া অবো দিবো বর্তমানা অবাহন্।
গূড়্হং সূর্যং তমসাপব্রতেন তুরীয়েণ ব্রহ্মণাবিন্দদত্রিঃ ॥"৬

অর্থাৎ "হে ইন্দ্র! যখন তুমি সূর্যের নিচে অবস্থিত স্বর্ভানুব সেই সকল মায়া-অন্ধকার দূরে অপসারিত করেছিলে তখন অত্রি চারটি ঋকের দ্বারা, কর্মনাশক অন্ধকার দ্বারা আচ্ছন্ন সূর্যকে প্রকাশিত করলেন।" এই চারটি ঋক্ ওঁ-এর চারটি পর্যায়ের ব্যাপারও হতে পারে। ওঁ-সূর্যের চতুর্থ পর্যায়ে অর্থাৎ শব্দের বৈখরি পর্যায়ে সূর্য অন্ধকার থেকে প্রথম আবির্ভূত হন। অপর দিকে অতিক্রান্তিক দর্শনে জাগ্রত, স্বাপ্নিক, সুষুপ্তির পর চতুর্থ নির্ভেজাল চিৎ-পর্যায়ে প্রকৃত জ্ঞানের উন্মেষের কথাও এখানে বলা হতে পারে। যে সূর্যকে বৈদিক ঋষিরা অন্ধকার থেকে স্বর্গীয় আলোকে তুলে এনেছিলেন তা হল সত্য-সূর্য। এই সত্যসূর্যের দিব্য অক্ষর বা ধ্বনি হল 'ওঁ'। ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের, ১৬৪তম সূক্তের ৩৯ শ্লোকে দীর্ঘতমস ঋষি তাই বলেছেন ঃ

"ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্যস্মিন্দেবা অধিবিশ্বে নিষেদুঃ।
যস্তন্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি চ ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে ॥"

অর্থাৎ "সকল দেবতা পরম ব্যোমসদৃশ ঋকের অক্ষরে উপবেশন করেছেন। একথা যিনি না জানেন ঋক্ দ্বারা তিনি কি করবেন? একথা যাঁরা জানেন তাঁরা সুখে অবস্থান করেন।" আরো স্পষ্ট বাংলায়—"পরম ব্যোমে মন্ত্রের পবিত্র অক্ষর (ওঁ), যাতে সকল দেবতা বাস করেন, যিনি এ কথা জানেন না তিনি বেদ দ্বারা কি করবেন?" সুতরাং অনুমান করতে দ্বিধা নেই যে, ওঁ-এর উপরই বেদ দাঁড়িয়ে আছে। তবে ঋগ্বেদে 'ও'-এর অন্যান্য আরও নাম আছে।

উপনিষদে ওঁ-কে বলা হয় 'উদ্গীথ' অর্থাৎ যা উচ্চারিত হয়ে ঊর্ধ্বে গমন করে। উদ্গীথের মূল হল 'গ' অক্ষর, যার অর্থ 'চলা'। 'গান' অর্থেও একে ব্যবহার করা হয়। 'উৎ'-এর অর্থ ঊর্ধ্ব। সুতরাং একে ঊর্ধ্বগীতও বলা যেতে পারে। অর্থাৎ উচ্চস্তরের সঙ্গীত যা ঊর্ধ্ব দিকে ছুটে চলে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৬৭নং সূক্তের তৃতীয় শ্লোকে শব্দটি প্রথম লক্ষ্য করা যায়। যেমন,

"হংসৈরিব সখিভির্বাবদদ্ভিরশ্মন্ময়ানি নহনা ব্যস্যন্।
বৃহস্পতিরভিকনিক্রদদ্গা উত প্রাস্তৌদুচ্চ বিদ্বা অগায়ৎ ॥"৩

অর্থাৎ "বৃহস্পতি সহায়গণ হংসের ন্যায় কোলাহল করতে লাগল। তাদের সাহায্যে তিনি প্রস্তরময় দুয়ার খুলে দিলেন। অভ্যন্তরে রুদ্ধ গাভীগণ চিৎকার করে উঠল। তিনি উৎকৃষ্টরূপে স্তর ও উচ্চৈঃস্বরে গান গেয়ে উঠলেন।" বক্তব্যটির স্পষ্ট অর্থ হল—'বৃহস্পতির গর্জনে আলো ফুটে বেরুলো। সত্যজ্ঞানী হিসেবে তিনি ঊর্ধ্ব দিকে উঠতে লাগলেন।' উক্ত সূক্তটি

অযাস্য ঋষি কর্তৃক বিরচিত। তিনি এবং বৃহস্পতিকে উপনিষদে পরস্পর 'ওঁ' ও 'উদ্গীথ' সহকারে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত দেখা যাচ্ছে। সুতরাং বলা যায় উপনিষদও 'ওঁ'-এর উৎস হিসেবে ঋগ্বেদকেই ইঙ্গিত করছে।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৬৭ সূক্তের ১-২ শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ—

"ইমাং ধিয়ং সপ্তশীর্ষ্ণীং পিতা ন ঋত প্রজাতাং বৃহতীমবিন্দৎ।
তুরীয়ং স্বিজ্জনয়দ্বিশ্বজন্যোঽযাস্য উকথ্মিন্দ্রায় শংসন্ ॥১
ঋতং শংসন্ত ঋজু দীধ্যানা দিবস্পুত্রাসো অসুরস্য বীরাঃ।
বিপ্রং পদমঙ্গিরসো দধানা যজ্ঞস্য ধাম প্রথমং মনন্ত ॥"২

অর্থাৎ "আমাদের পিতা এই সপ্তশীর্ষযুক্ত মহৎ স্তব রচনা করেছেন। সত্য থেকে এর উৎপত্তি। সকল লোকের হিতকারী অযাস্য ঋষি ইন্দ্রের প্রশংসা করতে করতে চতুর্থ একটি স্তব সৃষ্টি করেছেন। অঙ্গিরার বংশধরেরা সুন্দর যজ্ঞস্থানে যাওয়া স্থির করলেন। তাঁরা সত্যবাদী, সরল, স্বর্গের পুত্র ও মহাবলী। তাঁরা বুদ্ধিমান ব্যক্তির ন্যায় আচরণ করেন। সরল সাদাসিধে বাংলায় এর অর্থ এই ঃ "সপ্তশীর্ষক, সত্যজাত এই বিরাট ভাব আমাদের পিতা পেয়েছিলেন। এই চতুর্থ অবস্থাই সব কিছুর উৎস অযাস্য ঋষি ইন্দ্রের প্রতি নিবেদিত সূক্তে একথাই বলেছিলেন। দেবপুত্র স্বরূপ অঙ্গিরস ঋষিরা সরাসরি ধ্যান করে, এই সত্য ঘোষণা করে ঋষিদের ক্ষেত্র থেকে যজ্ঞের যথার্থ চরিত্র ধ্যানে জানতে পেরেছিলেন।" মূলতঃ 'ওঁ' শব্দব্রহ্মণ একথাই এখানে বলা হয়েছে। এব পরা পর্যায়ই চতুর্থ স্তর। এখান থেকেই জ্যোতি ও অন্তরীক্ষ পার হয়ে শব্দের ঝঙ্কার বস্তুরূপ ধারণ করে বিশ্ব সৃষ্টি করেছিল। Big Bang তত্ত্ব ও সে কথাই বলে। পরা পর্যায়ে এই শব্দ ছিল নিস্তরঙ্গভাবে শূন্যতার মধ্যে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎস যে সত্যিই শূন্য বিজ্ঞানীরা তা স্বীকার করেন। আজ তাঁদের প্রশ্ন ঃ সবকিছু কোথা থেকে এসেছে? উত্তর এই যে, অণুপরমাণু তেজ থেকে সৃষ্টি হতে পারে, পরমাণু প্রতিপরমাণু যুগ্ম ভাবে। কিন্তু তেজ এল কোত্থেকে? জবাব ঃ বিশ্বজগতের সমগ্র তেজ যথার্থই শূন্য।[১৪] এই শূন্য পর্যায়ই হয়তো পরা শব্দের পর্যায়, যেখানে সবই ছিল অথচ ছিল না। এইই হল চতুর্থ অবস্থা 'ওঁ'-এর উচ্চ ব্যোমমার্গীয় অবস্থা।

বৈদিক মন্ত্রের অক্ষরেখাই হল গায়ত্রী মন্ত্র। নিশ্চিত রূপেই এই মন্ত্রটি বৈদিক সূক্ত থেকে এসেছে। খুঁজলে সম্ভবতঃ ঋগ্বেদের অভ্যন্তরে এই 'ওঁ'-এর বীজ পাওয়া যাবে—ওম্ ভূর্ ভুবর সুবর ওম্।

তবে প্রশ্ন নিশ্চয়ই আসবে যে, 'ওঁ' যদি বৈদিক সাহিত্যের অক্ষরেখা

১৪ Where did they all come from? The answer is that in quantum theory particles can be created out of energy in the form of particle/antiparticle pairs. But that just raises the question of where the energy came from. The answer is that the total energy of the universe is exactly zero.—A Brief History of Time, Stephen W. Hawking, p. 136.

তাহলে স্পষ্টভাবে তা আদি বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া যায় না কেন ? তাছাড়া বৈদিক সূক্তে বীজমন্ত্র দেখা যায় না। বরং তন্ত্রে এর ছড়াছড়ি। তবে বৈদিক সাহিত্যের চরিত্র বিচার করলে সেখানে ওঁ-এর অস্তিত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই।

সাধারণ বিশ্বাস, ঋগ্বেদে কোন মূর্তি ব্যবহার করা হোত না। ধর্মীয় অনুষ্ঠান হত অগ্নি প্রজ্বলিত করে। পবিত্র বারি ব্যবহার করা হোত। প্রতীক ছিল। নরাকৃতি কোন দেবদেবী ছিল না। অনেকের ধারণা শিল্পকৃতি তখনও মূর্তি তৈরি করার মত অবস্থায় ছিল না বলেই মূর্তি পাওয়া যায় না। জরথুস্ত্রবাদীদের মত ঋগ্বৈদিক ধর্মেও ছিল রূপহীন কোন দ্রব্য ব্যবহার। পাথর বা ঐ জাতীয় কিছু। কি যে হত বলা কষ্টকর।

ঋগ্বেদে যে ভাষা পাই তাতে কাব্যসম্পদ যেমন রয়েছে তেমনই রূপ-কল্পনাও অত্যন্ত জীবন্ত। মূর্তি না থাকলে কি হবে, বেদের দেবদেবীর মধ্যে মানুষের গন্ধ বেশ প্রবল ভাবে বিদ্যমান। মূর্তি না থাকলে কি হবে দেবতাদের হাতে অস্ত্র আছে বলা হচ্ছে। রূপ না থাকলে, দেহ না থাকলে অস্ত্র ধরবেন কি করে ? গহনাগাঁটি পরা হচ্ছে এমন নজিরও কম নেই। মরুৎ ও ইন্দ্রের ক্ষেত্রে তো অলংকার স্পষ্ট।

যদি সোম-এর কথা ধরা যায় তাহলে দেখা যাচ্ছে—তাঁর যে বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে তাতে রূপের উপস্থিতি অনস্বীকার্য। যেমন সোম হলেন তরুণ, একটু ধূসর বর্ণ। তিনি সক্রিয়, জ্ঞানী, নিজেকে স্বর্ণমণ্ডিত করে রাখেন।

অগ্নি দীপ্তিময়। জগৎ সৃষ্টির মূলেই তিনি ছিলেন। দেবতাদের মধ্যে পরম জ্ঞানী।

ত্বষ্টাকে দেখা যাচ্ছে দেবতাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দৃঢ়চেতা। তাঁর হাতে লৌহ তরবারি।

ইন্দ্রের হাতে রয়েছে বজ্র, যে বজ্র দিয়ে তিনি সর্পজাতীয় অসুরদের বধ করেন !

রুদ্রের হাতেও রয়েছে ধারালো অস্ত্র। সে অস্ত্র ঝলমল করছে। তিনি আরোগ্যেরও দেবতা।

পূষণ গোপন রত্নভাণ্ডারের সন্ধান জানেন। সে পথ তিনি তস্করের মত পাহারা দেন।

বিষ্ণুর তো তিন পদক্ষেপের কথাই উল্লেখ আছে। পা না থাকলে পদক্ষেপ হবে কোথা থেকে ?

সুতরাং নৈর্ব্যক্তিক ভবদ্যোতক প্রতীকী চরিত্র হলেও তাঁদের রূপ আছে। অশ্বিদ্বয়কে দেখা যাচ্ছে এক স্ত্রী নিয়ে ছুটছেন। পরিব্রাজকদের মত তিনি অনেক দূরে বাস করেন। কেউ কেউ অশ্বিদ্বয়কে আজ্ঞাচক্রের দুই দল বলে মনে করেন। 'ওঁ' হলেন গৃহিণী।

মিত্র ও বরুণকে দেখা যাচ্ছে ঊর্ধ্ব গগনে সম্রাটের মত বিরাজ করছেন। ঘৃত দ্বারা তাঁরা অভিষিক্ত।

যদিও কোন সূক্তেই মূর্তির কথা স্পষ্ট করে বলে দেওয়া নেই তবে সূক্তগুলো পাঠ করলে মনে মনে কোন মূর্তি তৈরি করে নেওয়া কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়। তৎকালে যে প্রচলিত ধ্যানধারণা ছিল সূক্তগুলি হল সেই সবের অত্যন্ত সরলীকৃত বক্তব্য। বিশ্বাসের বাকী কথা হয়তো লোকমুখে প্রচলিত ছিল।

মানুষের ভাষার প্রথম যখন উদ্ভব ঘটে তখন তা রূপব্যঞ্জক ছিল। প্রকৃতির বিভিন্ন দিককে বোঝানোই ছিল ভাষার যথার্থ উদ্দেশ্য। নৈর্ব্যক্তিক ভার বহন করবার ক্ষমতা ভাষার দেহে পরে আসে। গাভী শব্দ আদিতে দুগ্ধবতী গাভীই ছিল। সেই গাভী মূলতঃ মহিলারাই দোহন করতেন বলে 'দুহিতা' শব্দের উৎপত্তি হয়। 'ধেনু' শব্দ ব্যাপ্ত ভাব নিয়ে আসে—যার অর্থ প্রতিপালক। মিশরীয় হায়ারোগ্লিফ্‌স-এ যে চিত্রব্যঞ্জনা পাই বেদের ভাষাও আদিতে সেই চিত্রাত্মক ছিল। সুতরাং বেদের যে ভাষায় দেবতাদের উদ্দেশ্যে সূক্ত রচিত হয়েছিল মনে হয় তাতে সূক্তকারগণ অবশ্যই কোন রূপ চিন্তা করেই সেগুলি রচনা করেছিলেন। সেই চিত্রাত্মক সূক্ত দিয়েই প্রার্থনা করা হোত, ধ্যান করা হোত।

কিছু কিছু চিত্রকল্প পরেও এসেছে। যেমন, ঋগ্বেদের সূর্যদেবতা স্বর্ণপ্রভ দেবতা হিসেবে পরে হিরণ্যগর্ভ হয়েছেন উপনিষদে এসে। উপনিষদে এমন অনেক ধ্যানের মূর্তি আছে যার উৎস নিশ্চিতই ঋগ্বেদে খুঁজে পাওয়া যায়। ব্রহ্মসূত্রে (প্রাচীনতম ভাষ্যগ্রন্থ) দেবারাধনার ক্ষেত্রে প্রতীকের মূল্য কি তা বিচার করার চেষ্টা করা হয়েছে। পশু চিত্রকল্প বা প্রতীক ঋগ্বেদে প্রচুর আছে, যেমন গাভী, ষাঁড়, অশ্ব, গড়ুর ইত্যাদি। প্রত্যেকটি দেবতারই বাহন হিসেবে এই পশুপাখিদের দেখা যায়। পুরাতত্ত্ববিদদের অনুমান আদিতে লোক পশু পুজো করতো অভিজ্ঞান হিসেবে। তারা মনে করত প্রত্যেকটি নরগোষ্ঠিই কোন না কোন পশু থেকে এসেছে। পরে দেবতার রূপ স্পষ্টরূপে দেখা দিলে দেবতার সঙ্গে তারা এই অভিজ্ঞান জুড়ে দেয় বাহন হিসেবে। ইন্দ্রের সঙ্গে রয়েছে দুটি পিঙ্গল বর্ণের অশ্ব, পূষণের সঙ্গে মেষ, অশ্বিদ্বয়ের সঙ্গে গর্দভ ও মরুতের সঙ্গে রয়েছে ছিট্‌ওয়ালা হরিণী। পরবর্তী হিন্দু ধর্মে দেখতে পাই শিবের সঙ্গে রয়েছে বৃষ, যমের সঙ্গে মহিষ, দুর্গার সঙ্গে সিংহ ইত্যাদি। এদের কোন যৌগিক গূঢ়ার্থ থাকতে পারে।

সম্ভবতঃ প্রতীকার্থেই এদের ব্যবহার করা হোত। পৌরাণিক গল্পের আকারে তাদের বলা হোত, যেমন চতুঃশৃঙ্গ, ত্রিপদ ও দ্বি বা সপ্তমস্তিষ্ক যুক্ত বৃষ। ঋগ্বৈদিক সূক্তেও এমন জন্তুজানোয়ারের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন, ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ২৬৩নং সূক্তের প্রথম ও নবম শ্লোকে আছে ঃ

"যদক্রন্দঃ প্রথমং জায়মান উদ্যন্ৎ সমুদ্রাদুত বা পুরীষাৎ।
শ্যেনস্য পক্ষা হরিণস্য বাহু উপস্তুত্যং মহি জাতং তে অর্বন্‌।।"১

অর্থাৎ "হে অশ্ব! তোমার মহৎ জন্ম সকলের স্তুতিযোগ্য। তুমি অন্তরীক্ষ থেকে বা জল থেকে প্রথম উৎপন্ন হয়ে যজমানের অনুগ্রহার্থে মহৎ

শব্দ কর। তোমার পক্ষ শ্যেন পক্ষীর ন্যায় এবং পদ হরিণের পদের ন্যায়।"
নবম শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ

"হিরণ্যশৃঙ্গোঽয়ো অস্য পাদা মনোজবা অবর ইন্দ্র আসীৎ।
দেবা ইদস্য হবিরদ্যমায়ন্যো অর্বন্তং প্রথমো অধ্যতিষ্ঠৎ ।।"৯

অর্থাৎ "অশ্বের কেশর সুবর্ণময়, পাদদ্বয় লৌহময় এবং সে মনের মত বেগবান। বেগের দিক থেকে ইন্দ্রও তার কাছে নিকৃষ্ট। দেবতারা অশ্বের হব্য ভক্ষণের জন্য আসছেন। ইন্দ্রই প্রথম তাতে আরোহণ করেছিলেন ?"

এখানে অশ্বের যা বর্ণনা তাতে বর্ণনা যেন ছাঁচে ঢালাই কোন ধাতুর মূর্তিরূপে ধরা পড়ছে। এর পেছনে রূপকল্পনা ছিলনা বলা যায় না।

তবে পশুদের এত বেশি উল্লেখ দেখে মনে হয় প্রাচীনেরা পশুকে শুধু পূজাই করতেন না, পশুগুলিকে দিব্য শক্তির এবং আত্মশক্তির প্রতীক হিসেবে দেখতেন। পশুর নামের গভীর তাৎপর্য ছিল। গূঢ় অর্থ ছিল। ছাগল বা মেষ, যাকে বলে আজ—তার ভিন্ন অর্থ অজাত। এ এমনই একটি সত্তা যা ষট্‌চক্রের ষড় অঞ্চলকে মেষ বা ছাগলের আকারে ধরে রেখেছে। সেই জন্যই ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলের ৪১তম সূক্তের দশম শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ

"স ধাম পূর্ব্যং মমে যঃ স্কন্তেন বিরোদসী
অজো ন দ্যামধারয়ন্নভন্তামন্যকে সমে ।।"১০

অর্থাৎ "সেই অজাত, যিনি নিজ রশ্মিসমূহকে শ্বেতবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ করেন, তাঁর কর্মের উদ্দেশে, দ্যুলোক ও অন্তরীক্ষলোক নির্মিত হয়েছে, আদিত্য যেমন দ্যুলোক ধারণ করেন তিনিও সেইরূপ অন্তরীক্ষ দ্বারা স্বর্গ-মর্ত্য ধারণ করেছেন। তিনি সকল শত্রু হিংসা করুন।" এই ধরনের সূক্তে চিত্রাত্মকতা ফুটে উঠলেও মূলতঃ কিন্তু তা ভাবার্থক। অর্থাৎ এর মধ্যে প্রতীকই কাজ করছে বেশি।

বেদের রূপ-কল্পনা পুতুলাত্মক নয় প্রতিমাত্মক অর্থাৎ এখানে শুধুমাত্র রূপ নেই তার সঙ্গে ভাবও আছে। ভাবের প্রতিম হিসেবে, অনুরূপ হিসেবে তা প্রতিমা। অদ্যাবধি হিন্দুরা যে দেবদেবীর পূজা করে তা প্রতিমারই পূজা করে। যেমন, কালীর চার হাত, নারায়ণের চতুর্ভুজ, দুর্গার দশভুজ সবই মাত্রাদ্যোতক। মাত্রা হল dimension, শক্তির বিভিন্ন মাত্রা। কালীর চার হাত চারটি শক্তির symmetry breaking. দুর্গার দশ হাত ten dimensional false vacuum-এর প্রতীক। (লেখকের 'দেবদেবীর উৎস সন্ধানে' গ্রন্থ পঠিতব্য)। এই ভাব এসেছে যোগ-বিজ্ঞানের অংশ হিসাবে। মূর্তি ব্যবহার করা হয়েছে মনোনিবেশ করা যাতে সহজ হয় সেই জন্য। বাইবেল ও কোরাণেও বহু চমৎকার রূপক অলংকার আছে। সুফীদের মরমিয়া কাব্যেও এই রূপকের অভাব নেই। সেণ্ট জন-এর অনুভব পশু প্রতীকের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছিল। তিনি প্রাচীন ধর্ম থেকে ষাঁড়, ঈগল, সর্প, দেহের সর্বত্র চক্ষুপূর্ণ মেষ ইত্যাদি প্রতীক ব্যবহার করেছিলেন। খ্রীষ্ট নিজেই মেষ হিসেবে চিহ্নিত যিনি ধরণীর পাপ গ্রহণ করছেন। এই মেষের সঙ্গে শান্ত

বৈদিক গাভীর প্রচুর মিল রয়েছে। ইসলামে ও প্রটেস্টাণ্ট খ্রীষ্টধর্মে এই বাক্যিক রূপের কোন মূল্য দেওয়া না হলেও এই রূপকগুলিকে একেবারে বাদ দেওয়া সম্ভব হয়নি—কারণ, ভাষার স্বাভাবিক অংশ হিসেবেই তারা এসে গিয়েছে। তবে এদের ব্যবহার নৈর্ব্যক্তিক ভাবপ্রবাহ সৃষ্টি করা অপেক্ষা কাব্যিকই বেশি।

আনুষ্ঠানিক ভাবে এসব সূক্ত ব্যবহার করা হলেও তা যে পুতুল পুজার সামিল একথা বলা যায় না। বাক্য যেমন আমাদের কোন বিষয় সম্পর্কে বুঝতে সাহায্য করে তেমনই এই অনুষ্ঠানগুলিও। রূপকল্পনা করা হয় এই কারণে যে, তাতে সংক্ষিপ্তকরণ করা যায়। একটি ছবি যে ভাব ব্যক্ত করে সহস্র বাক্য দিয়েও তার ব্যাখ্যা করা চলে। সেদিক থেকে ধরতে গেলে ভাষার মধ্যেও প্রতিমার দ্যোতনা আছে। সেই জন্য কোন ভাষায় পুস্তক লিখলেই কি বলা হবে যে, তা পুতুল পূজার সামিল? কোন ভাষায় অনন্ত ঈশ্বরকে বোঝাবার চেষ্টা করা হলে সেটাও তো তখন পুতুলেরই সামিল হয়ে দাঁড়ায়! তার মানে কি সকল পবিত্র ধর্মগ্রন্থই পুতুল পূজো বোঝায়? শুধু মাত্র অনন্তকে বোঝাবার জন্য সীমিত একটা খাঁচা ব্যবহার করা হয় এই যা।

ঋগ্বেদে বহু নৈর্ব্যক্তিক প্রতীক আছে। যেমন, রথ, চক্র ইত্যাদি। তাদের মরমিয়া ভাবব্যঞ্জনা আছে, ঠিক স্বর্গে যাবার জন্য এলিজার রথের মতন। সেই জন্য বাইবেলে পুতুল পূজার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে এমন নয়। এ-সব অনেকটা তন্ত্রে যেমন জ্যামিতিক যন্ত্র ব্যবহার করা হয় সেইরকম।

পরবর্তী কালে এই সব প্রতীক থেকে মূর্তি তৈরি করা হয়েছিল, কিংবা বেদে এই প্রতীকগুলোকে কি অর্থে ব্যবহার করা হত আজ তা স্পষ্ট করে বলা দুরূহ। ঋগ্বেদে অনেক দক্ষ কারিগরের উল্লেখ আছে, যেমন ঋভু। এরা সোনা, ব্রোঞ্জ, পাথর, কাঠ এই সব উপাদান নিয়ে কাজ করতেন। সুতরাং কারিগরির উৎকর্ষ যে ঋগ্বেদের আমলে ছিল সন্দেহ নেই। তবে তাঁরা মূর্তি তৈরি করেননি কেন?

বৈদিক ধর্মানুষ্ঠানে যেমন মূর্তির দ্যোতনা থাকলেও মূর্তি পাওয়া যায় না, তেমনই পাওয়া যায় না মন্দিরের কোন উল্লেখ। অদ্যাবধি বহু বৈদিক অনুষ্ঠান খোলা আকাশের নিচেই করা হয়। তবে ঋগ্বেদে মন্দিরের কথা তেমন করে উল্লেখ না থাকলেও প্রার্থনাগৃহ ও জনসমাবেশ-গৃহের উল্লেখ আছে, যেমন সভা ও সমিতি। ঋষি বশিষ্ঠ বরুণের হাজার-দুয়ারী গৃহে প্রবেশ করেছিলেন। ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলের ৮৮নং সূক্তের ৫নং শ্লোকে এর উল্লেখ আছে। যেমন,

"কৃত্যানি সখ্যা বভূবুঃ সচাবহে যদবৃকং পুরা চিৎ।
বৃহন্তং মানং বরুণ স্বধাবঃ সহস্রদ্বারং জগমা গৃহং তে॥"

অর্থাৎ "হে বরুণ কোথায় আমাদের সেই সখ্য হয়েছিল? অর্থাৎ অতীতে কোথায় আমরা একত্রে ছিলাম? পূর্বকালে সে হিংসারহিত বন্ধুত্ব ছিল তারই সেবা করছি (পুরুষ ও প্রকৃতির একত্র সংযুক্ত অবস্থা)। হে বরুণ!

তোমার মহান ভূতগণের বিচ্ছেদকারী সহস্র দ্বারবিশিষ্ট গৃহে যায়।" যোগের দিক থেকে বিচার করলে এই সহস্র দ্বারবিশিষ্ট গৃহকে সহস্রার বোঝায়। কূর্মস্থানই এখানকার গৃহ। সাদাসিধে অর্থে এটা বৃহৎ প্রার্থনাগৃহের অস্তিত্বের কথাও ঘোষণা করে। সেকালে যদি প্রার্থনা গৃহের অস্তিত্ব না থাকতো এমন কল্পনা আসা সম্ভব ছিল না। ভিন্ন একটি সূক্তে, যেমন দ্বিতীয় মণ্ডলের ৪১নং সূক্তের ৫নং শ্লোকে মিত্র ও বরুণের সহস্রস্তম্ভ মন্দিরের উল্লেখ আছে—

"রাজানাবনভিদ্রুহা ধ্রুবে সদস্যুত্তমে। সহস্রস্থূণে আসাতে ॥"

অর্থাৎ "শত্রুতাশূন্য রাজা মিত্র ও বরুণ—স্থির, উৎকৃষ্ট, সহস্রস্তম্ভ বিশিষ্ট এই স্থানে উপবেশন করুন!" এখানেও সহস্রারের ইঙ্গিত থাকতে পারে।

পঞ্চম মণ্ডলের ৬২নং সূক্তের ৬নং শ্লোকে বলা হয়েছে:

"অক্রবিহস্তা সুকৃতে পরস্পা যং ত্রাসাথে বরুণেলাস্বন্তঃ।
রাজানা ক্ষত্রমহৃনীয়মানা সহস্রস্থূণং বিভৃথঃ সহ দ্বৌ ॥"৬

অর্থাৎ "হে মিত্র ও বরুণ! তোমরা যজ্ঞভূমিতে যে যজমানকে রক্ষা কর, শোভন স্তুতিকারী সেই যজমানের প্রতি দানশীল হও ও তাকে রক্ষা কর। কারণ, তোমরা উভয়েই রাজা এবং ক্রোধশূন্য হয়ে ধন ও সহস্রস্তম্ভযুক্ত সৌধ ধারণ কর।" এখানে যে পরম শান্ত অবস্থার কথা বলা হচ্ছে তা সহস্রারের কূটস্থানদ্যোতক। তবে স্থূলে মন্দিরের ইঙ্গিত দিয়েই সে কথা বলা হচ্ছে। পরবর্তী কালে দেখা যাচ্ছে যে হিন্দু মন্দিরগুলিকে রথাকারে তৈরি করা হচ্ছে। বেদে রথের ভূরি ভূরি উল্লেখ রয়েছে। এই রথগুলিই কি তবে পরবর্তী হিন্দু মন্দিরের ভ্রূণ?

আর্য সংস্কৃতিতে প্রত্যেকটি গৃহই ছিল প্রার্থনার স্থান। গৃহের কেন্দ্রস্থ অগ্নিকুণ্ডই ছিল ধর্মানুষ্ঠানে সমবেত হবার স্থান। তবে কোন মূর্তি ছিল না। গৃহদেবতা ছিলেন অগ্নি। গৃহে যে অগ্নি প্রজ্বলিত করা হত তা যে শুধু রন্ধনকার্যের জন্যই করা হতো তা নয়, এর একটি ধর্মীয় মূল্য ছিল। প্রত্যেকটি শহরেই একটি কেন্দ্রীয় অগ্নিকুণ্ড ছিল। কোথায় সেই অগ্নিকুণ্ড ছিল তার তেমন স্পষ্ট উল্লেখ নেই। সম্ভবতঃ কোন মন্দিরেই তা থাকত, পাশে স্নানাগার জাতীয় জলাশয়ও থাকতো—যেমনটি দেখা যায় সিন্ধু-উপত্যকাতে, প্রাগ্বৈদিক যুগে। এখনও প্রত্যেকটি ভারতীয় মন্দিরের পাশেই জলাশয় আছে। এই জলাশয় সমুদ্রের প্রতীক। এই সমুদ্র শূন্যতা বা পরম ব্যোমের প্রতীক।

বৈদিক প্রার্থনা উপলক্ষে স্তম্ভের উল্লেখ আছে। ঐতিহাসিকদের ধারণা এই স্তম্ভ থেকেই পরবর্তী কালে শিবলিঙ্গের উদ্ভব ঘটেছে। যাঁরা যোগ করেন ও ঘূর্ণায়মান বিন্দু প্রত্যক্ষ করেছেন, তাঁরা জানেন যে, শিবলিঙ্গের উৎস অন্যত্র। এ যদি জানতে চান তাহলে লেখকের 'দিব্য জগৎ ও দৈবী ভাষা' গ্রন্থের দুটি খণ্ড পড়ুন। দেখা যাচ্ছে প্রাচীন মিশরীয়দেরও মন্দির স্তম্ভসারি দিয়ে তৈরি করা হত। তারা এক ধরনের চতুষ্কোণ সূক্ষ্মাগ্র স্তম্ভ বা বিশেষ

চিহ্নের পূজা করত। ঋগ্বেদে মসল্লা (বাড়িঘরেরই হোক বা খাবারেরই হোক) তৈরি করার খল ও মুষলও পূজো পেত। সোবন পেষনের পাথরকেও তারা পূজা করত। ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ২৮নং সূক্ত ও দশম মণ্ডলের ৭৬, ৯৪ ও ১৭৫নং সূক্তে এর প্রমাণ রয়ে গেছে। বৃক্ষ ও যূপকাষ্ঠ পর্যন্ত পূজা পেত। এ-জন্য যে প্রতিমা পূজা ব্যাহত হয়েছিল তা বলা যায় না। অগ্নিকুণ্ডের চারধারে হাতে গড়া নানা জিনিস থাকতো। এর মধ্যে পশু ও মানুষ উভয়েরই মূর্তি থাকতো বলে মনে হয়।

যে ভাবেই ব্যবহার করা হোক না কেন মন্দির ও মূর্তি যে ঋগ্বেদে সম্পূর্ণভাবেই অনুপস্থিত ছিল একথা বলা যায় না। প্রাচীন মিশরে যেমন মূর্তিকে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্যবহার করা হত, সম্ভবতঃ প্রাচীন ভারতেও অনেকটা তেমনই ব্যবস্থা ছিল। বাহ্যতঃ বহুদৈবিক আরাধনার মধ্যেও ঋগ্বেদে যে একটা অদ্বৈত মতবাদের প্রতি ঝোঁক ছিল সেটা দৃষ্টি এড়িয়ে যাবার মত নয়। অনুমান করতে অসুবিধা নেই যে, প্রাচীন আর্য জনবসতির মধ্যে আরাধনার বিশেষ বিশেষ কেন্দ্র ছিল, যাকেই মন্দিরের ভ্রূণাবস্থা বলা যেতে পারে। প্রথম দিকে হয়তো এই ধর্ম-কেন্দ্রগুলিতে তেমন অলংকরণের ব্যবস্থা ছিল না। তাই বলে সেগুলি যে নগ্ন ছিল তাও বলা যায় না। ঋগ্বেদ রচনার কাল যদি খ্রীঃ পূঃ চার হাজার বৎসরও হয়—তবে বলতে দ্বিধা নেই যে এখানেই প্রাচীনতম সংস্কৃত মানুষের মন্দির নির্মাণশৈলীরও ভিত্ স্থাপিত হয়েছিল।

বৈদিক ধর্মের প্রতীকত্বের সঙ্গে প্রাচীন প্রতিমাব্যঞ্জক মিশরীয় ও মেসোপোটোমিয় ধর্মের অনেক মিল লক্ষ্য করা যায়। মানুষ ও পশুর প্রতীক-গুলোকে যদি আরো ভাল ভাবে বুঝতে হয় তবে ব্যাপকতর অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে। এসব যে কোন গোঁড়ামির অন্তর্ভুক্ত তা নয়, তবে দেখা যায় যে, বেদে দিব্যজগতের প্রতি প্রতিমাত্মক ও নৈর্ব্যক্তিক উভয় ধরনের মনোভাব ছিল। বহু-দেবতার অন্তরালে ফল্গুধারার মত যে অদ্বৈতবাদের সুর প্রবাহিত ছিল প্রতিমাত্মকতা ছিল তারই অঙ্গ। প্রাচীন মিশরীয়দের মত বৈদিক ঋষিরাও বাক্য থেকে জগৎ সৃষ্টি এটা বিশ্বাস করতেন। আবার দেবতাও যে জগৎ সৃষ্টির উৎসে রয়েছেন এটাও মনে করতেন। বস্তুতঃ আধুনিক জগতে অব-অণু পর্যায় সম্পর্কে অধ্যয়ন করতে গেলে দেখা যায় যে, একটা বিরাট মহামানসের উপস্থিতি যেখানে রয়েছে। অব-অণু পর্যায়ে ফোটনের ব্যবহার লক্ষ্য করে বৈজ্ঞানিকরা তাই বলেছেন যে, ফোটন যেন সামনে পেছনে তাঁতের মাকুর মত চলে দুটি চার্জড পরমাণুর মধ্যে বার্তাবহের মত কাজ করে। যেন বলে দেয়—আর একটি চার্জড পরমাণু রয়েছে। এবং এই ভাবেই যেন তারা সাড়াও দেয়।[১৫]

---

১৫ Photons therefore, act rather like messengers hopping back and forth between charged particles telling them that the

বেদ লিখিত গ্রন্থ নয়। বাইবেলের মত, জরথুস্ত্রের জেন্দ অবেস্তর গাথার মত প্রত্যাদিষ্ট। বেদ অর্থ জ্ঞান। অবেস্ত অর্থও জ্ঞান। জেন্দ অর্থ ভাষ্য। জেন্দ অবেস্ত অর্থ জ্ঞানভাষ্য। বর্তমানে প্রতিমা পূজা হিন্দুধর্মে স্থান পেয়েছে। এটাকে ধর্মের অধঃপতন বলে অনেকে মনে করেন। বস্তুতঃ সকল অর্থই স্পষ্ট হবে কেউ যদি মানসস্তরে দিব্যজগতের শ্লোক প্রত্যক্ষ করতে পারেন। দেবতাদের উপস্থিতি আছে ভিন্ন গ্রহে ও দেশে (space)। তবে যদি অত গভীরেও না যাওয়া যায় তবু মূর্তিকল্পনা অধ্যাত্মতার পক্ষে অবমাননাকর কিছু নয়। প্রাচীন কালে প্রতীমাত্মক ধর্মের ভাষার অবিচ্ছেদ্য অঞ্চল ধরেই আসা সম্ভব। যেটুকু লক্ষ্য করার মত তা এই যে, বেদে বহু রূপকল্পনার দেবতাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নেই। এদের বিরুদ্ধে একেশ্বর-বাদের কথা নেই। সেখানে বহুর মধ্যে একটা ঐক্য রয়েছে। সমগ্র বৈচিত্র্য ও প্রকৃতি সেখানে দিব্য ঐক্যে মিলে গেছে। বর্তমান পদার্থবিজ্ঞানের super string তত্ত্বর মত বৈদিক ঋষিরাও বহুর মধ্যে এক এবং একের মধ্যে বহুকে জেনেছিলেন—"There are parts in a whole and a whole in parts." ভারতবর্ষের ভৌগোলিক পরিবেশের মধ্যেই বহুর মধ্যে এই ঐক্যের সুর প্রতি-ধ্বনিত। তাই ঐতিহাসিকেরা বলেছেন, "There is unity in the midst of diversity." 'বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান।' ঋগ্বেদে বহু সূক্তের প্রতীককে সহজেই দৃষ্টিগোচর রূপের মধ্যে ধরে আনা যায়। ঋগ্বেদের ধর্ম এমন এক যুগ থেকে এসেছে যখনও বিস্তৃত অলংকরণের প্রতীক আসেনি—যে ধরনের প্রতীক মধ্য প্রাচ্যে উপস্থিত ছিল। এর ফলেই অর্থাৎ বৈচিত্র্যের মধ্যে অন্তরালবর্তী একটা ঐক্যের সুর ছিল বলেই বৈদিক ধর্মে একেশ্বরবাদ অকস্মাৎ বজ্রপাতের মত নেমে আসেনি। কারণ এ ধরনের একেশ্বরবাদের প্রতি ধাবমান হবার প্রয়োজন বেদে ছিল না। ঋগ্বেদ এমনই এক ধর্মগ্রন্থ যার মধ্যে রূপ ও আকৃতিহীন দিব্য অস্তিত্ব উভয়ই ছিল। সেই জন্য ঐতিহাসিক গতির আঁচল ধরে ভারতে কখনও সাকার কখনও নিরাকার ভজনা এসেছে।

তিন

ভারতবর্ষে আর্যরা এমন এক মহান প্রকৃতির মধ্যে বাস করতেন যে তাঁদের মানসিকতায় একটা অতীন্দ্রিয় শিহরণ স্বভাবতই জেগেছিল। হিমালয়ের তুষারমৌলি শৃঙ্গ, সবুজ উপত্যকা, বেগবতী স্রোতস্বিনীর আদিগন্ত বিস্তৃত তিনদিকের সমুদ্রের নীলাভ নৃত্য, ষড়ঋতুর রঙের বিচিত্র রূপ পরিবর্তন এ সবকিছু স্থায়ী একটা প্রভাব ফেলেছিল তাঁদের মনের উপর। এমন বৈচিত্র্য পৃথিবীর অন্য কোন দেশে আর নেই। এই প্রকৃতির প্রভাবে সেই অতি প্রাচীন কাল থেকেই তাদের মনে অদ্ভুত একটা কাব্যের শিহরণ আর

other charged particle is there, and inducing a response.
God and New Physics—Paul Davies p. 149

অনন্ত এক অধ্যাত্ম কৌতূহল জেগেছিল। ঋগ্বেদের ভারতীয় মানসে কাব্যের একটা অনুরণন ছিল। এই লোকোত্তর প্রাকৃতিক পরিবেশের পেছনে নিশ্চয়ই কোন দিব্যসত্তার প্রসাদ রয়েছে, স্বাভাবিক ভাবেই তাঁরা সেই ধরনের চিন্তা করতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। সেই অগোচর সত্তার উদ্দেশে নানা ভাবে তাদের হৃদয় অনুরূপ কাব্যের ঝঙ্কারে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনে বাধ্য হয়েছিল। সেই জন্য মিত্র বা সূর্য, বরুণ বা ঊর্দ্ধ আকাশের দেবতা, দ্যৌ ও পৃথিবী অর্থাৎ আকাশ ও মৃত্তিকা, অগ্নি প্রভৃতি সেই প্রাগবৈদিক যুগ থেকেই নানা ভাবে, নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ভারতীয় মানসের সশ্রদ্ধ আরাধনা লাভ করে। ঋগ্বেদে এই সব দিব্য সত্তাই চূড়ান্ত সিদ্ধি লাভ করেছে সূক্তে সূক্তে। দ্যৌ ও পৃথিবীর উপর ভাবতে ভাবতে অসীমের একটা দ্যোতনা লাভ করে অপার বিস্ময়ে তাঁরা এর নাম দিয়েছেন অদিতি। তিনিই সকল দেবতার মাতা। অদিতিই বোধহয় প্রাচীনতম শব্দ যা দিয়ে অসীমকে বোঝাবার চেষ্টা হয়েছে। তবে এই অসীমের দ্যোতনা যে তাঁদের নৈর্ব্যক্তিক চিন্তা থেকে এসেছে তা নয়, এসেছে দৃষ্টির মধ্যে বিশাল ব্যাপ্তকে ধরতে গিয়ে যখন তার সীমা খুঁজে পাওয়া যায়নি তখনই। নগ্ন চোখে সেই সুবিশাল ব্যাপ্তি পৃথিবী ছাড়িয়ে, মেঘ ছাড়িয়ে, আকাশ ছাড়িয়ে কোথায় যে গিয়েছে তাঁরা হদিশ করতে পারেন নি বলেই অদিতি নাম দিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। অদিতি অর্থ অপরিচ্ছিন্ন, অবিচ্ছেদ্য, অসীম। সত্যি এটা তো অবাক হবার মতই যে, সেই সুপ্রাচীন কালেই বৈদিক ঋষিরা তাঁদের অন্তরে অবিচ্ছেদ্য 'এক' যা থেকে সব অবতারিত হয়েছে এমন ভাবতে পেরেছিলেন। এ যে অতি সত্য এটাও বুঝতে পেরেছিলেন। বুঝতে পেরেছিলেন—তা থেকেই সব কিছু জাত। সেই অসীমের, সকল কিছুর উৎসের কল্পনা করতে গিয়ে বিজ্ঞানও আজ বলছে কিছু নয়, এই ধরনের মহাব্যোম থেকেই সব কিছুর উৎপত্তি— 'The entire universe came from a quantum transition from nothing (i.e. from pure space-time, without matter and energy) —Beyond Einstein—M. Kaku and J. Trainer p. 190. আবার তাঁর থেকে জাত সব কিছুর নামই আদিত্য। বেদে এমন কথাও আছে, অদিতি হলেন স্বর্গীয় গোলক। অদিতি হলেন অন্তরীক্ষ। অদিতি মাতা, অদিতি পিতা, অদিতি পুত্র। অদিতি সকল দেবতা, পঞ্চশ্রেণীর সত্তা। তিনি সৃষ্ট, আকার সৃষ্টিরও উৎস।

এই সত্যানুভূতি বিজ্ঞানেরও। তাই বিজ্ঞান বলেছে সমগ্র মহাজগৎ গোল। উৎসে দেশ ও কাল থাকে না। আবার দেশ ও কাল সৃষ্টি হলে দেশ ও কাল থেকেই সব কিছু সৃষ্টি হয়। তাই বিজ্ঞান বলেছে—"Hence space may grow out of nothing, and matter may come out of space." God and New Physics, Paul Davies p. 41. এই অদিতিই দেবতাদের জননী হিসেবে আরও পরবর্তী কালে পৌরাণিক উপাখ্যানের চরিত্রে পরিণত হয়েছেন।

ঋগ্বেদের ঋষিরা বিশ্বের তিনটি স্তরের অনুমান করেছিলেন। যেমন, সর্বোচ্চ লোক দ্যুলোক, এর পরবর্তী নিম্নলোক অন্তরীক্ষলোক ও স্থূললোক ভূলোক। প্রত্যেকটি অঞ্চলের একজন করে নিয়ন্ত্রণকারী দেবতা ছিলেন। যেমন, দ্যুলোকের সবিতৃ বা সূর্য। তবে মরমিয়া ঋষিরা জানেন যে এই সূর্য আমাদের সৌরমণ্ডলীয় সূর্য নয়, এ হল জ্যোতির অঞ্চল। অন্তরীক্ষলোকের দেবতা ইন্দ্র অথবা বায়ু। ভূলোকের দেবতা অগ্নি। এঁরা আবার ক্রমে ক্রমে সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হন তেত্রিশ। প্রত্যেকটি লোকে এগারজন করে দেবতা। ঋগ্বেদ ও বেদের অন্যান্য অংশে এই তেত্রিশজন দেবতার উল্লেখ আছে। শতপথ ব্রাহ্মণের মতে (৪/৫/৭/২) এঁরা হলেন অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র ও দ্বাদশ আদিত্য, দ্যু (আকাশ) ও পৃথ্বী। এই অষ্টবসুর নাম ধব, ধ্রুব, সোম, আপ, অনিল, অনল, প্রত্যূষ ও প্রভাস। দ্বাদশ ধাতৃ, মিত্র, অর্যমন, রুদ্র, বরুণ, সূর্য, ভগ, বিবস্বত, পূষণ, সবিতৃ, ত্বষ্টা ও বিষ্ণু। ঐ ব্রাহ্মণেই বলা হয়েছে এই দ্বাদশ আদিত্য হলেন বার মাসে সূর্যের বিভিন্ন নাম। একাদশ রুদ্রের নাম বেদে স্পষ্ট উল্লেখ নেই। যজুর্বেদ ও তৈত্তিরীয় আরণ্যকে নানাভাবে তাঁদের উল্লেখ রয়েছে। পরবর্তীকালে মহাভারতে একাদশ রুদ্রের নাম নিম্নরূপে দেওয়া হয়েছে। যেমন মৃগব্যাধ, সর্প, নিঋতি, অজয় কবাড, অহির্বুধ্ন্য, পিনাকিন্, ঈশ্বর, কপালিন, স্থানু ও ভগ। ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের নবম সূক্তের নবম শ্লোকে এদের সংখ্যাই আবার দেওয়া হয়েছে—৩৩৩৯. যেমন—

> "ত্রীণি শতা ত্রী সহস্রাণ্যগ্নিং ত্রিংশচ্চ দেবা নব চাসপর্যন্।
> ঔক্ষণ্ ঘৃতৈরস্তৃণন্বর্হিরস্মা আদিদ্ধোতারং ন্যসাদয়ন্ত।।"৯

অর্থাৎ "তিন হাজার তিনশ ঊনচল্লিশ সংখ্যক দেবতা অগ্নিকে পূজা করছেন, ঘৃত দ্বারা সবল করছেন ও তাঁর জন্য কুশ বিস্তার করেছেন। তাকে হোতারূপে কুশের উপর বসিয়েছেন।" আদি তিন দেবতা কি জগতের তিনটি মৌল উপাদান? ৩৩৩৯টি দেবতা কি তাঁদেরই বহু সংখ্যায় আত্মপ্রকাশ? শেষ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে ভারতে ৩৩৩৯—৩৩ কোটিতে পরিণত হয়েছেন। এঁরা প্রকৃতি ও প্রাণের নানা পর্যায়ের দেবতা। কিন্তু মূলতঃ বক্তব্য হল এই ঃ ছিল এক, এক থেকে তিন, তিন থেকে তেত্রিশ ও তেত্রিশ থেকে ৩৩৩৯। আসলে সবই হল অধ্যাত্ম শক্তির বিচিত্ররূপের প্রকাশ।

বৈদিক ঋষিরা প্রকৃতির নানা অবস্থা লক্ষ্য করে বুঝেছিলেন যে, প্রকৃতির প্রত্যেকটা অবস্থার পেছনেই রয়েছে স্বতন্ত্র কোন অধ্যাত্মশক্তি বা দেবতা। মিত্র ছিলেন প্রাকবৈদিক দেবতা, সূর্যও তাই। প্রকৃতির মধ্যে সর্বাপেক্ষা মহান প্রকাশ হল সূর্যের। সূর্যের উদয়ে জগৎ জাগ্রত হয়। সূর্য অস্ত গেলে সবই ঘুমিয়ে পড়ে। এ দেখেই বৈদিক ঋষিদের মনে হয়ে থাকবে যে, সূর্য জীবন ও শক্তির উৎস। বস্তুতঃ জ্যোতিসূর্যও তাই। জ্যোতিসূর্য থেকেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রূপ। এই জ্যোতিসূর্য ফুটে উঠে পরব্রহ্মণের অন্তস্থ শক্তি ইচ্ছার আবেগে বিস্ফোরিত হলে। এই হল আধুনিক বিজ্ঞানের **Big Bang.** এই জ্যোতিই হল প্লাজমা, প্রাণের আদ্যা অবস্থা। যাঁরা যোগনেত্রে এর স্বরূপ জানেন

তাঁরাই একথা বোঝেন। তাঁদের কাছে বেদের প্রাণ-শক্তি এই সূর্য, জ্যোতি ছাড়া আর কিছুই নয়। আর যাঁরা একথা না বোঝেন তাঁদের কাছে এই সূর্য সৌরমণ্ডলীয় সূর্য। আমাদের জ্ঞাত জগতের প্রাণশক্তির উৎস। জানি না এই জ্যোতিসূর্য মানস নেত্রে দর্শন করেই সমগ্র প্রাচীন জগৎ সূর্যের স্তবগানে মুখরিত হয়েছিল না সৌরমণ্ডলীয় সূর্য দেখেই তাঁরা মুগ্ধ হয়েছিলেন। এই সূর্য যিনিই হোন তিনি সামান্যতে সীমাবদ্ধ থাকেননি। কবিহৃদয়ের অনুরণনে মহিমাময় হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা লক্ষ্য করেছিলেন যে, এই আদিত্য বা সূর্যের দ্বাদশটি বিভিন্ন প্রকাশ আছে। তাঁর দ্বাদশ রূপের প্রকাশ ঘটে বার মাসের বিভিন্ন সময়ে। কারো মতে তাঁর রূপ পরবর্তিত হয় দিনের বার ঘণ্টার বিভিন্ন সময়ে। সূর্যের বিভিন রূপের মধ্যে মিত্র, বরুণ, ভগ, সবিতৃ, বিষ্ণু ও ইন্দ্র বিশেষ ভাবে খ্যাত। ঋগ্বেদে আমরা এই ছয়টি আদিত্যেরই পরিচয় পাই। তবে অন্যান্য বেদে এঁদের ভিন্ন নামও দেওয়া হয়েছে।

এই দেবতারা কিন্তু কেউই স্বয়ম্ভূ নন। তাঁদের একটি আরম্ভ আছে। তবে একবারেই যে সবাই অস্তিত্ব লাভ করেছিলেন তা নয়। ঋগ্বেদে প্রায়ই প্রথম দিকের দেবতার উল্লেখ আছে। অথর্ববেদ বলেছে দশটি দেবতার কথা যাঁরা অন্য সবার আগে এসেছিলেন। অনেক দেবতা পূর্ববর্তী অন্য দেবতাদের থেকে এসেছেন। আদিতে এই দেবতারা যে অমর ছিলেন তা নয়। মৃত্যুকে জয় করেন তাঁরা তপস্যাবলে। ঋগ্বেদে বলা হয়েছে দেবতারা অমর হয়েছিলেন সোমরস পান করে। অগ্নি ও সবিতৃ থেকেই তাঁরা এই সোম লাভ করেছিলেন। এখানে সহাস্রারস্থ সোমরসের সূত্র পাওয়া যায় যা জ্যোতিদর্শন থেকেই হয়। বেদের পরে কিন্তু তাঁদের এই অমরত্ব শুধুমাত্র মহাজগতের অস্তিত্ব পর্যন্তই স্থায়ী। মহাজগতের অস্তিত্ব লয় হলে তাঁদেরও লয়। এ ব্যাপারে নিশ্চয়ই ভাববার অবসর রয়েছে। দেবতাদের এই অমরত্ব লাভের তিনটি তত্ত্বই সত্য। তপস্যা হল সত্যকে জানার জন্য মানুষের সাধনা। মানুষ সাধনা দ্বারা জ্ঞান লাভ করলেই বুঝতে পারে যে, যাকে ক্ষণস্থায়ী বলে বোধ হচ্ছে তা ক্ষণস্থায়ী নয়। এই স্থূল অস্তিত্বের বাইরেও তার সূক্ষ্ম অস্তিত্ব আছে। এই সূক্ষ্ম অস্তিত্বের মধ্যেও আকৃতি থাকে। এই সূক্ষ্মাকৃতি দেহ plasma দিয়ে গঠিত। এই স্থূলজগতের উপাদান দ্বারা সে কাতর নয়। তাকে স্থূল অস্ত্রে আঘাত করা যায় না, স্থূলদেহে ধরা যায় না, স্থূল নয়নে দর্শন করা যায় না। তার অস্তিত্বের মূল ধারণকেন্দ্র হল ইচ্ছা। যতক্ষণ ইচ্ছা ততক্ষণ তার আকৃতি। ইচ্ছার লয় হলে আকৃতিরও লয় হয়। কিন্তু এই ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা সহজে লয় পায় না। এমন যে বড় বড় যোগী তাঁরাও বুঝতে পারেন না যে সত্যি সত্যি তাঁদের আকাঙ্ক্ষা লুপ্ত হয়েছে কিনা। স্বাতন্ত্রিক মানস অস্তিত্ব যেমন সূক্ষ্ম দেহে থাকে, তেমনই শুধুমাত্র মানস চৈতন্যরূপেও তা বহুদিন থাকে। একটি প্রবাহ হয়ে থাকে। এই সূক্ষ্ম দেহ যখন স্থূল দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হয় তখন বুঝতে পারে যে, তার জ্ঞাত বিশ্বের পরিধি থেকেও সৃষ্টি অনেক বড়।

গ্রহ-গ্রহান্তর ঘুরে ঘুরে নতুন নতুন জন্মের স্বাদ লাভ করে যতই সে এগোয় ততই আনন্দে পূর্ণ হয়ে ভাবে, কত ক্ষুদ্র সীমার মধ্যেই না এত দিন সে সীমাবদ্ধ ছিল! তখনই তার দিব্য জ্ঞান জন্মে। ইচ্ছার অস্তিত্ব যতদিন তাঁর থাকে ততদিন সে মৃত্যুহীন। ইচ্ছা লয় পেলে ইচ্ছার উৎসে সে ফিরে যায় --যাকে বলে পরব্রহ্মণ। আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায় **Supervoid or Singularity.** কিন্তু তখনও সে হারিয়ে যায় না, বীজের আকারে থাকে। এই বোধই অমরত্বের বোধ। কিন্তু এ-সবই মরমিয়া অভিজ্ঞতা। অন্তর প্রসারিত করে যাঁরা তা ধরতে পারেন নি তাঁদের তা বুঝিয়ে বলা যাবে না। ইদানিং কিছু ফটোগ্রাফী জীবের সূক্ষ্ম দেহের ছবি তুলেছে বলে দাবি করে। কিন্তু সন্দেহাতীত ভাবে ফলিত বিজ্ঞানে তা ধরা পড়ে নি। তবে ইলেকট্রনিকস্-এর অভূতপূর্ব উন্নতি এমন পর্যায়ে এসে পৌঁচেছে যে, সূক্ষ্ম কিছুকে ধরা যাবে না এমন বিশ্বাসকে আর ধ্রুব সত্য হিসাবে আমল দেওয়া চলবে না। কিরলিয়ান ফটোগ্রাফী এদিকে অনেকটাই মানুষকে এগিয়ে দিয়েছে।

দ্বিতীয় অমরত্ব সম্পর্কে যে বলা হয়েছে—অগ্নির কাছ থেকে 'সোম' লাভ করার পরই দেবতারা অমর হন—সে কথার সূক্ষ্ম তাৎপর্য এই যে, সোম হল জ্যোতির্লোকের স্নিগ্ধ জ্যোতি। যাঁরা অন্তর্জগতে ডুব দিয়ে এই স্নিগ্ধ জ্যোতি প্রত্যক্ষ করেছেন—তাঁরা বিশ্বের স্বরূপ জেনে বুঝেছেন যে, চিৎসত্তার মৃত্যু নেই, আছে ক্রমবিকাশ না ক্রম অধঃপতন। উত্থানে পতনে চিৎসত্তার শেষ নেই। অপর পক্ষে যাঁরা স্বাতন্ত্রিক সত্তার অনিবার্য শেষ কল্পনা করেছেন কল্পক্ষয়ে, তাঁরাও এক অর্থে ভ্রান্ত নন। এই কল্পক্ষয়কেই বলা হয়েছে বিজ্ঞানের ভাষায় **Big Crunch.** তখন দেশ ও কাল পর্যন্ত লুপ্ত হবে। দেশ ও কালের উপরই সৃষ্টি। সুতরাং যাঁরা দেশ ও কাল জাত তাঁরা থাকবেন না। সৃষ্ট-জীবের অমরত্বের পরিধি দেশ ও কাল পর্যন্ত। প্রলয়ের পর থাকবে না। কিন্তু ঔপনিষদিক চেতনাতে পরমাত্মাতে লীন হলেও বীজ আকারে সবই থেকে যাবে। মানুষ অমৃতের পুত্র, চিরকালই অমর থাকবে। দেবতারা এই বোধ থেকেই অমর। তাঁদের ইচ্ছা-শক্তি বহু কিছু নিয়ন্ত্রণ করতেই সক্ষম। আবার ভিন্ন লোকে প্রচণ্ড ক্ষমতা-সম্পন্ন মানবাকৃতি জীব দেখা যায়। তাঁদের অনেকের সঙ্গে হিন্দু দেবদেবীর অনেক মিল দেখা যায়। ঋগ্বেদের দেবতা কল্পনা প্রকৃতির বিভিন্ন দিকের ব্যক্তিরূপ আরোপ না যথার্থই সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখা কিছু, আজ তা বলার উপায় নেই। অতীন্দ্রিয় জগতের সত্য উদঘাটনে মানুষকে আরো অনেক এগুতে হবে।

দেবতাদের বর্ণনা ঋগ্বেদে যেমন ভাবে দেওয়া হয়েছে তা থেকে মনুষ্যাকৃতিতে তাঁদের কল্পনা করা কষ্টকর নয়। তবে অনেক সময় তাঁদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তাতে সেগুলিকে আলংকারিক অর্থেরও উপরে ধরে নিতে হবে। যেমন সূর্যের বাহু বলতে তার রশ্মিকে ধরতে হবে। তাঁর জিহ্বা হল অগ্নিশিখা। কিছু কিছু দেবতাকে দেখা যাচ্ছে যোদ্ধা হিসেবে চিত্রিত, যেমন ইন্দ্র। কেউ কেউ বা পুরোহিত হিসাবে প্রতিভাত

যেমন—অগ্নি ও বৃহস্পতি। প্রত্যেককেই দেখা যাচ্ছে বায়ুতে ভর করে উজ্জ্বল যানে ভ্রমণ করছেন। সেই যান টানছে মুখ্যতঃ অশ্ব। কখনও বা ভিন্ন কোন পশু। এখানে পশু বলতে পশু হিসেবে ধরলে চলবে না, তাদের শক্তিকে ধরতে হবে। যে জন্য আজও আমরা অশ্ব-শক্তিসম্পন্ন মেশিন বলি। তাই বলে মেশিন যে অশ্বদ্বারা চালিত তা নয়।

খাদ্য হিসাবে দেখা যাচ্ছে মানুষের যা প্রিয় খাদ্য—দেবতাদেরও তাই। (অভিজ্ঞতার বাইরে মানুষ যেতে পারেনি বলেই হয়তো এমন কল্পনা করেছেন)। যেমন দুধ, ঘি, শস্যদানা, মেষ, ছাগল, গবাদি গৃহপালিত পশু ইত্যাদি। যজ্ঞে এই সবই দেবতাদের দেওয়া হচ্ছে। এই খাদ্য দেবতাদের কাছে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে অগ্নিশিখা বা ধুঁয়া। এতে মনে হচ্ছে, দেবতাদের সূক্ষ্মদেহী অস্তিত্ব সম্পর্কে ঋগ্বৈদিক ঋষিদের কল্পনা ছিল। দেবতারা হয় রথে চেপে তাঁদের খাদ্য গ্রহণ করতে আসছেন বা তাঁদের উদ্দেশে যে কুশের আসন বিছানো হত সেই আসনে বসে সেই খাদ্য গ্রহণ করছেন। পানীয় হিসাবে সর্বাপেক্ষা প্রিয় সোমরস। এই সোম সম্পর্কে পরে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা যাবে—কারণ সোম পৌরাণিক কাহিনীর একটি চরিত্র হিসেবে গণ্য হয়ে গেছেন।

দেবতাদের যথার্থ বাসস্থান দেখা যাচ্ছে দ্যুলোকে, সেখানে তাঁরা সোমরস পান করে আনন্দে জীবন যাপন করছেন।

দেবতাদের সবচেয়ে বড় গুণ তাঁদের শক্তি। এই জন্যই তাঁদের উদ্দেশে বার বার 'মহান', 'প্রবল' ইত্যাদি বিশেষণ প্রয়োগ করা হচ্ছে। প্রকৃতির শৃঙ্খলা তাঁরাই রক্ষা করছেন। অশুভ শক্তিকে দমন করছেন। এই জন্যই দেবতাদের **Particle** হিসাবে কল্পনা করেছেন কেউ কেউ। অশুভ শক্তিকে **Anti-particle** হিসেবে। জেমস ওয়ালেস তাঁর Brahman→E=mc² গ্রন্থের ১৮২নং পৃষ্ঠাতে বলেছেন "Now if a particle could be equated with a Sura (god) and an antiparticle with an Asura (anti-god) it becomes clear from various legend that the ancient Hindu mystics were more than aware of the properties of these opposing energy-forms." উপরোক্ত চিন্তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলের ৩৫নং সূক্তের দ্বিতীয় শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ

"ইমং স্বস্মৈ হৃদ আ সুতষ্টং মন্ত্রং বোচেম কুবিদস্য বেদৎ।
অপাং নপাদসুর্যস্য মহা বিশ্বান্যর্যো ভুবনা জজান॥"২

অর্থাৎ "আমরা তাঁর জন্য হৃদয় থেকে সুরচিত এই মন্ত্র উত্তমরূপে উচ্চারণ করব। তিনি তা বার বার জানুন। স্বামী অপাং নপাৎ (কারণ-সলিল) নিজশক্তি মহিমায় সকল ভুবন উৎপন্ন করেছেন।"

ঐ সূক্তেরই অষ্টম শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ

"যো অপ্স্বা শুচিনা দৈব্যেন ঋতাবাজস্র উর্বিয়া বিভাতি।
বয়া ইদন্যা ভুবনান্যস্য প্র জায়ন্তে বীরুধশ্চ প্রজাভিঃ॥"৮

অর্থাৎ "হে অপাং নপাৎ! সত্যবান সর্বদা একরূপে বর্তমান এবং অত্যন্ত বিস্তীর্ণ। যিনি জলমধ্যে পবিত্র দৈব তেজ দ্বারা প্রকাশ পান ভূতজাত সবকিছু তার শাখা মাত্র। পুষ্পফলাদির সঙ্গে সঙ্গে ঔষধি সকল তোমা থেকেই উৎপন্ন হয়।"

Particle-এর চরিত্র বোধহয় নবম শ্লোকে আরও বিশদ ভাবে প্রকাশ পেয়েছে, যখন বলা হয়েছে ঃ

"অপাং নপদা হ্যস্থাদুপস্থং জিহ্মানামূর্ধ্বো বিদ্যুতং বসানঃ।
তস্য জ্যেষ্ঠং মহিমানং বহন্তী হিরণ্যবর্ণাঃ পরি যন্তি যহ্বীঃ॥"৯

অর্থাৎ "অপাং নপাৎ কুটিলগতি মেঘের মধ্যে স্বয়ং উধর্ব ভাবে অবস্থিত হয়েও বিদ্যুৎ পরিধান করে অন্তরীক্ষে আরোহণ করেছেন। তাঁর উৎকৃষ্ট মাহাত্ম্য সর্বত্রকীর্তন করে মহতী হিরণ্যদ্যুতি নদীগুলি প্রবাহিত হচ্ছে।" এখানে যে মনুষ্যাকৃত কোন দেবতাকে উল্লেখ করা হয়নি তা বলাই বাহুল্য। উপরোক্ত সূক্ত ঋগ্বেদের দেবতাদের সম্পর্কে নতুন করে ভাবনার অবসর দেয়। দেবতাদের কি ঋগ্বেদের ঋষিগণ সূক্ষ্ম জগতের অণুপরমাণু রূপে কল্পনা করেছিলেন? কিছুটা বিজ্ঞানের রহস্য, কিছুটা মরমিয়া রহস্য এর মধ্যে থেকেই যায়। ঋগ্বেদীয় বিজ্ঞান যাঁদের কাছে পরিচিত নয় তাঁরা এটা বুঝবেন না—যেমন সাধারণ মানুষ $E=mc^2$-এর তাৎপর্য বুঝবেন না। $E=mc^2$-এর তাৎপর্য বুঝতে গেলে যেমন পদার্থবিদ্যায় পারদর্শী হতে হবে, তেমনই ঋগ্বেদীয় বিজ্ঞান বা অধি-বিজ্ঞান যা-ই হোক না কেন, তা বুঝতে গেলে সেই মানসস্তরে গিয়ে আধুনিক মানসকে পৌঁছুতে হবে। এর পক্ষে বা বিপক্ষে সহজে বলা যাবে না।

ঋগ্বেদের দেবতাদের দেখা যাচ্ছে যে, সকলের উপর তাঁদের অপরিসীম কর্তৃত্ব রয়েছে। কেউ তাঁদের বিধানের বাইরে যেতে পারে না। তাঁদের দ্বারা নির্ধারিত সময়কেও কেউ অতিক্রম করতে পারে না। মানুষের ইচ্ছা পূর্ণ হবে কিনা তা তাঁদেরই মর্জির উপর নির্ভর করে। তাঁদের সার্বিক দৃষ্টির উল্লেখ কম আছে। তবে বরুণের ক্ষেত্রে তিনি মহামহীয়ান হয়ে উঠেছেন। বৈদিক দেবতারা মূলতঃ কল্যাণপ্রদ জীব। একমাত্র রুদ্রের মধ্যেই কিছুটা ক্ষতিকর দিক লক্ষ্য করা যায়। পার্থিব অর্থে তাঁরা অত্যন্ত সুনৈতিক। তাঁদের মধ্যে প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করতে কাউকে দেখা যায় না। সৎ ও সত্যপথের পথিকদের তাঁরা রক্ষক। কিন্তু পাপীকে ক্ষমা করেন না। তবে শত্রুর বিরুদ্ধে কৌশল প্রয়োগ করতে তাঁরা কুণ্ঠা বোধ করতেন না। প্রতারণার আশ্রয়ও নিতেন।

বৈদিক দেবতাদের দৈহিক একটা অবস্থা থাকলেও মনে রাখতে হবে তাঁদের অবয়ব সবটাই স্পষ্ট নয়। স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠেনি। শক্তি, দীপ্তি, কল্যাণ, জ্ঞান এসব নানা গুণ তাঁদের মধ্যে দেখা গেলেও কোন বিশেষ ব্যক্তিগুণ নিয়ে যেন ফুটে উঠতে পারেন নি। এই অস্পষ্টতা আরো বেশি করে ফুটে উঠেছে যখন যুগ্ম দেবতা রূপে তাঁদের আরাধনা করা হয়েছে। এতে

দেখা যায় যেটা শুধুমাত্র একজনেরই গুণ হওয়া উচিত তা দুজনের মধ্যেই সমানভাবে বর্তেছে। প্রত্যেকের গুণেই যেন অপরের মধ্যে বিদ্যমান। তাতে একের সঙ্গে অপরের মিল খুঁজে পাওয়াটা সহজ হয়েছে। দেবতাদের মধ্যে এরকম অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায়। শেষ পর্যন্ত এ ভাবও প্রকাশ পেয়েছে যেন নানা দেবতা একই দৈবী-সত্তার নানা দিক। বেদে এর স্পষ্ট উল্লেখও আছে। বেদের ১ম মণ্ডলের ১৬৪নং সূক্তের ৪৬নং শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ

"ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্।
একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ॥"৪৬

অর্থাৎ "এই আদিত্যকে মেধাবীগণ ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ ও অগ্নি বলেন। ইনি স্বর্গীয়, পক্ষবিশিষ্ট ও সুন্দর ভাবে গমনশীল। ইনি এক হলেও এঁকে বহু বলে বর্ণনা করা হয়। এঁকে অগ্নি যম ও মাতরিশ্বা বলে।" তবে এ ধরনের বোধ থাকা সত্ত্বেও একেশ্বরবাদের উদ্ভব হয়নি। কারণ দেখা যায়, কোন যজ্ঞেই বিশেষ কোন দেবতার উদ্দেশেই শুধু আহুতি দেওয়া হচ্ছে না। পরে অবশ্য স্পষ্ট করেই অদিতি ও প্রজাপতিকে শুধু সকল দেবতার সঙ্গে এক করেই দেখানো হয়নি প্রকৃতির সঙ্গেও একাত্ম কবে দেখানো হয়েছে। এই জন্য ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৬৩নং সূক্তের ২নং শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ

"বিশ্বা হি বো নমস্যানি বন্দ্যা নামানি দেবা উত যজ্ঞিয়ানি বঃ।
যে স্থ জাতা অদিতেরদ্ভ্যস্পরি যে পৃথিব্যাস্তে ম ইহ শ্রুতা হ বম্॥"২

অর্থাৎ "হে দেবগণ! তোমাদের সকল নামই নমস্কারযোগ্য, বন্দনীয় ও যজ্ঞে উচ্চারণ যোগ্য। যারা অদিতির গর্ভে জন্মেছেন কিংবা জলে বা পৃথিবী থেকে জন্মেছেন তাঁরা সকলে আমার এই আহ্বান শুনুন।"

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১২৯নং সূক্তে বলা হয়েছে ঃ

"নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্মন্নম্ভঃ কিমাসীদ্গহনং গভীরম্॥১
ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিং চনাস॥২
তম আসীত্তমসা গূঢ়হমগ্রেহপ্রকেতং সলিলং সর্বমা ইদম্।
তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং যদাসীত্তপসস্তন্মহিনাজায়তৈকম্॥৩
কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।
সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্ হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা॥৪
তিরশ্চীনো বিততো রশ্মিরেষামধঃ স্বিদাসীদুপরি স্বিদাসীৎ।
রেতোধা আসন্মহিমান আসন্ত্ স্বধা অবস্তাৎ প্রযতিঃ পরস্তাৎ॥৫
কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্র বোচৎকুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।
অর্বাগ্দেবা অস্য বিসর্জনেনাথা কো বেদ যত আবভূব॥৬
ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব যদি বা দধে যদি বান।
যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ত্ সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ॥"৭

অর্থাৎ "তখন 'যা ছিল না'—তাও ছিল না, যা আছে তাও ছিল না।

পৃথিবী ছিল না। অতি দূরে বিস্তৃত আকাশও ছিল না। আবরিত করতে পারে এমন কিছু কি কি ছিল ? কোথায় কার স্থান ছিল ? দুর্গম ও গম্ভীর জল ছিল কি ? তখন মৃত্যু ছিল না, অমরত্বও ছিল না। দিন ও রাত্রির প্রভেদ ছিল না।

কেবল সেই 'এক' বায়ুর সাহায্য ব্যতীতই আত্মা মাত্র অবলম্বন করে শ্বাসপ্রশ্বাস যুক্ত হয়ে ছিলেন। তিনি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। অন্ধকার অন্ধকার দ্বারা আবৃত ছিল। সবই ছিল চিহ্নবর্জিত। চতুর্দিক জলমগ্ন ছিল। তিনি অবিদ্যমান বস্তু দ্বারা সর্বত্র আচ্ছন্ন ছিলেন। তপস্যার প্রভাবে সেই 'এক' থেকে বস্তু জন্মাল। সর্বপ্রথম মনের উপর কামের আবির্ভাব হল। তা থেকে প্রথম উৎপত্তির কারণ নির্গত হল। বুদ্ধিমানেরা বুদ্ধিদ্বারা আপনার মনে বিচার করে অবিদ্যমান বস্তুতে বিদ্যমান বস্তুর ক্ষেত্র নিরূপণ করলেন। রেতধা পুরুষের উদ্ভব হল। মহিমা সকল উদ্ভূত হলেন। তাঁদের রশ্মি দুই দিকে এবং নিম্ন ও ঊর্ধ্ব দিকে ছড়িয়ে পড়ল। নিচে রইল স্বধা ঊর্ধ্বে প্রয়তি। সত্য কে জানে ? বর্ণনা করবেন কে ? কোথা থেকে সব এল ? কোথা থেকে এইসব সৃষ্টি হল। দেবতারা এই সবকিছু সৃষ্টির পরে হয়েছেন। কোথা থেকে এসব কিছু হল কে জানে ? এই নানা সৃষ্টি যে কোথা থেকে হল ; কেউ সৃষ্টি করেছেন কি করেনি, তিনি, সেই তিনিই জানেন যিনি প্রভুস্বরূপ পরম ধামে রয়েছেন। কিংবা তিনিও জানেন না।"

(পরমাত্মাদেবতা। প্রজাপতিঋষি। ত্রিষ্টুপছন্দ।)

অদ্ভুৎ বোধ ! যা বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক বোধের সঙ্গে মিলে যায়। এতে এও স্পষ্ট যে বহু বিচিত্র সেই 'এক' থেকেই এসেছে। জড়, প্রাণ, মন, আত্মা সব। সকল কিছুর উৎসেই রয়েছেন সেই পরম 'এক'। সুতরাং জগতের সব কিছুর মধ্যে তিনিই ছড়িয়ে রয়েছেন। এই বোধই পরবর্তী কালে সর্বেশ্বরবাদের উৎস হিসাবে কাজ করেছে।

যখন যে দেবতাকে আহ্বান করা হচ্ছে সেই দেবতাকেই মহান মহীয়ান রূপে দেখার ঋগ্বেদে যে একটা প্রবণতা আছে তা থেকে অনেকে, যেমন ম্যাক্সমুলার আর্যদের মধ্যে **henotheism** অর্থাৎ অন্যান্য দেবতাদের অস্বীকার না করেও বিশেষ এক দেবতার পূজাপদ্ধতি চালু ছিল বলে মনে করেছেন। যখন যে দেবতাকে আহ্বান করা হচ্ছে তখন আরাধকের চিত্ত জুড়ে যেন একমাত্র তিনিই থাকছেন। তবে এ দেখে আর্যদের ধর্মীয় প্রবণতার যথার্থ চরিত্র নির্ণয় করা সম্ভব নয়।

ঐতিহাসিক ভাবে ধরতে গেলে প্রাচীনতম দেবতা দ্যৌ ইন্দো-ইউরোপীয়ান যুগের সঙ্গে সংপৃক্ত হয়ে আছেন, যেমন জিউস। তবে প্রশ্ন যেটা সেটা এই ঃ—আগে দ্যৌ না জিউস ? বর্তমানে ক্রমশই যেন ধরা পড়ছে আর্যরা ভারতবর্ষে বহিরাগত নন। বরং ভারত থেকে বাইরে যেতে পারেন। এ বিষয়ে কৌতূহলী পাঠক **David Frawley**-এর **God, Sages and Kings** গ্রন্থটি পাঠ করে দেখতে পারেন। দ্যৌ পিতারূপে দেখা দিয়েছেন। তিনি পৃথিবীর সঙ্গে

যন্ত্র। এঁরা যুগ্ম ভাবে পিতা-মাতা। এই দ্যৌই আধুনিক বিজ্ঞানের Supervoid। আর পৃথিবী মানে শুধুমাত্র আমাদের এই সৌরমণ্ডলীয় গ্রহটি নয়—পৃথিবী হল স্থূল বস্তুসত্তা। এ হল শূন্যতা ও বস্তু-সত্তার সম্পর্ক। যাকেই বলা হয়েছে পুরুষ ও প্রকৃতি। শূন্যতা তো শুধু শূন্যতা নয় বিজ্ঞানের ভাষায় false vacuum. আরো উপরের শূন্যতাও 'কিছু নয়' এমন কোন ব্যাপার নয়। কারণ তার মধ্যেই সব ছিল এবং তা থেকেই সব এসেছে। রবীন্দ্রনাথ অন্তরের অনুভূতি দিয়ে এই সত্যটুকু উপলব্ধি করেছিলেন বলেই, বলেছিলেন ঃ

"তবু শূন্য শূন্য নয়,
ব্যথাময় অগ্নিবাষ্পে পূর্ণ সে গগন
একা একা সে অগ্নিতে
দীপ্ত গীতে সৃষ্টি করি স্বপ্নের ভুবন।"

ঋগ্বেদে দ্যৌকে কখনও বজ্রপাণি হিসেবেও বর্ণনা করা হয়েছে। কখনও কখনও তাঁর বর্ণনা রয়েছে এই রকম যে, যেন মেঘের মধ্য দিয়ে হাসি ছড়িয়ে দিচ্ছেন। এতে বজ্রের সঙ্গে তাঁর একটি নিকট সম্পর্ক সহজেই ধরা পড়ে।

আর একটি এবং আরো বেশি স্পষ্টরূপে ব্যক্ত ঋগ্বেদীয় দেবতা হলেন বরুণ। ইন্দ্র বাদে তিনিও হলেন আর একটি প্রধান ঋগ্বৈদিক দেবতা। অবেস্তর অহুর মজদ-এর সঙ্গে তাঁর বেশ মিল রয়েছে। মহাজাগতিক ছন্দ (cosmic dance) ও মনোজগতের নৈতিকতা উভয়েরই তিনি নিয়ন্ত্রণকারী দেবতা। তাঁরই নির্দেশে স্বর্গ ও মর্ত্য পৃথক হয়েছে। সূর্য চন্দ্র নক্ষত্রাদির গতিবিধি তিনিই নিয়ন্ত্রণ করেন। নদী বয় তাঁরই নির্দেশে, বৃষ্টিপাত হয় তাঁরই মর্জিতে, তিনি শুধু সর্বদ্রষ্টা নন অন্তর্দ্রষ্টাও। মানুষের মনে কোথায় কৃত্রিমতা, কোথায় অকৃত্রিমতা—তাঁর কাছে কিছুই অজ্ঞাত নয়। পাপীর প্রতি তিনি নির্মম। তাঁর শৃঙ্খলে তিনি তাদের বেঁধে ফেলেন। কিন্তু অনুতপ্ত যারা, তাদের প্রতি সদয়। মানুষকে তিনি শুধু নিজস্ব পাপ থেকেই মুক্ত করেন না—প্রাক্তন পুরুষদেরও অপরাধ থেকেও অব্যাহতি দেন। বরুণ-স্তবে সেইজন্য দেখা যায় পাপ থেকে মুক্ত হবার জন্য আকুতি রয়েছে। এতে নৈতিকতার গন্ধ অত্যন্ত প্রবল। বরুণ-এর গুরুত্ব কমে যায় প্রজাপতির উদ্ভবের পরে। বেদোত্তর যুগে তিনি মুখ্যত জলের দেবতা হয়ে আছেন। তবে আদিতে তাঁর বিরাট অপরিচ্ছিন্ন ব্যাপ্তি লক্ষ্য করে মনে হয় দ্যুলোকের দেবতা হিসাবে বরুণ হলেন আধুনিক কোয়াণ্টাম ফিজিক্সের space বিশেষ। ঋগ্বেদে এক জায়গায় বলা হয়েছে—"নিবিড় নীলিমার ওপারেও কেউ যদি চলে যায়—সেখানেও দেখবে বরুণ।" এতেই মনে হয় তিনি space. স্পেশ বা দেশের দুধরনের অবস্থা—Kinetic energy পূর্ণ দেশ ও Potential energy পূর্ণ দেশ। বরুণ সর্বপ্রথম চিৎসত্তাও। এইজন্য তিনি স্বর্গীয় পিতা হিসাবেও চিহ্নিত। দিব্যপিতা হিসাবে বরুণ আর্য হিন্দুধর্মের বাইরের দিকের শক্তি। ইন্দ্র এক্ষেত্রে অন্তঃশক্তি। বরুণ হিসেবে প্রাচীন আর্যদের কাছে তিনি ছিলেন একেশ্বর।

কিন্তু ইন্দ্র হিসাবে তিনি অদ্বৈত অবস্থার প্রতিধ্বনি। বরুণ হলেন ব্রহ্মাণ্ডের শাসক। ইন্দ্র আত্মনের। অধ্যাত্ম সত্যের বাইরের দিক বরুণ, গুহ্যদিক ইন্দ্র। তবে ঋগ্বেদে বরুণের আত্মশক্তির নিয়ন্ত্রক রূপও আছে। আবার পৌরাণিক কালে ইন্দ্রই হয়েছেন অধ্যাত্ম সত্যের বাইরের দিক, তবে বরুণ যখন কঠোর শাসক তখন তিনি রুদ্রেরই মত ভয়ঙ্কর।

বরুণের সঙ্গে আর একজন যিনি রয়েছেন তিনি মিত্র। সাধারণ অর্থে মিত্র হলেন সৌরশক্তির কল্যাণকর দিক। কেউ কেউ একে ইরাণীয় মিথ্রদেবের সমার্থক করে দেখেছেন। কিন্তু মিথ্রদেবের মধ্যে কিছুটা জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক ইঙ্গিত আছে। মিত্র কিন্তু দিব্য আলোকের প্রতীক। অনেকে একে খ্রীষ্টের সঙ্গে তুলনা করেন। খ্রীষ্টও বৈদিক মিত্রের মত দিব্য পুত্র-সূর্য।[১৬] তবে ঋগ্বেদে মিত্র তার স্বাতন্ত্রিক সত্তা হারিয়ে বরুণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছেন। বরুণকে বাদ দিয়ে তাঁকে কদাচ প্রার্থনা জানানো হয়েছে।

সূর্যও মিত্রেরই গোত্রীয়। তবে সাধারণ অর্থে তিনি আমাদের সৌর-মণ্ডলীয় সূর্য। তাঁকে দেখানো হয়েছে ঊষার স্বামীরূপে। দেখা যাচ্ছে তাঁর রথ বাহিত হচ্ছে সপ্তাশ্ব দ্বারা। এর দ্বারা সূর্যের সাতরঙকে যে বোঝানো হচ্ছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু যোগপথের যারা পথিক তাঁরা এই সূর্যকে আত্মসূর্য হিসেবেই বেশি মনে করতে চান। স্থাবর জঙ্গম সবকিছুরই প্রাণসূর্য তিনি। সূর্যের সর্বদৃষ্টির কথা বলা হয়েছে—'এইজন্য তাঁকে আত্মসূর্য বলেই ধরে নেওয়া হবে। সূর্যই মিত্র ও বরুণের কাছে মানুষের নিষ্পাপ অবস্থার কথা ঘোষণা করেন। যোগে অগ্নিকে বলা হয়েছে কুল-কুণ্ডলিনী, সোমকে ব্রহ্মরন্ধ্র নিঃসৃত রস, সূর্যকে চিৎসূর্য এবং ইন্দ্রকে প্রাণশক্তি।

সবিতৃ হলেন উদ্দীপনা স্বরূপ। সৌরশক্তিকে যিনি উদ্দীপ্ত করেন। এই সবিতৃজ্ঞান পূর্ণ হলেই মানুষ ও দেবতা সকলেই অমরত্ব লাভ করেন। মৃতের আত্মাকে যথার্থ শুদ্ধ আত্মা হলে তাঁর যথার্থ স্থানে নিয়ে গিয়ে স্থাপন করেন। ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের ৬২নং সূক্তের ১০নং শ্লোকে তাই বলা হয়েছে ঃ

"তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥"১০

অর্থাৎ "যিনি আমাদের ধীশক্তি প্রেরণ করেন আমরা সেই সবিতাদেবের বরণীয় তেজ ধ্যান করি।" বেদ পাঠের প্রারম্ভে এই ভাবে সবিতাদেবের ধ্যান করেই আরম্ভ করা হত। আজও ব্রাহ্মণেরা প্রাতঃকালে সবিতৃ মন্ত্র জপ করেন। এই সবিতৃ মূলতঃ জ্যোতিসমুদ্র—যোগিরা ব্রহ্মরন্ধ্রের কূটস্থানে নিস্তব্ধ হবার আগে সে জ্যোতি প্রত্যক্ষ করেন। এই জ্যোতি আত্ম-মুক্তির কারণ। এই জ্যোতি বায়োপ্লাজমার অতি সূক্ষ্মস্তরপূর্ণ চেতনাময়। এই প্লাজমাই ঘনীভূত হয়ে ছায়াপথ, গ্রহনক্ষত্রাদি সৃষ্টি করে, যা থেকে প্রাণমন ইত্যাদির আবির্ভাব

১৬ **Christ is the Divine Son-Sun like Vedic Mitra—God, Sages and Kings—David Frawley p 282.**

হয়। এই সবিতৃ স্তোত্র আরও প্রমাণ করে যে, ঋগ্বেদীয় ঋষিরা যোগপারঙ্গম ছিলেন।

পূষণ শব্দের অর্থ উন্নতিকারক। সূর্যের কল্যাণকর দিককেই এখানে রূপদান করা হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় পশুচারকদের দেবতা—যিনি পশুপালকে রক্ষা করেন। তাদের হাতের অঙ্কুশ দিয়ে তিনি পশুদের নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি মৃতের আত্মাদেরও পিতৃযানে পরিচালিত করেন। সূর্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের সঙ্গে এই পূষণের একটা সম্পর্ক রয়েছে। সেইজন্য ঋগ্বেদের চতুর্থ মণ্ডলের ৫৮নং সূক্তের ৪নং শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ দুধরনের দিন তোমার। একটি শাদা আর একটি পবিত্র। তুমি স্বর্গের মত। পূষণ তোমার আশীর্বাদ বর্ষিত হোক। তৈত্তিরিয় আরণ্যকে এই দুই দিনকে সূর্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন বলা হয়েছে। ঋগ্বেদেও বলা হয়েছে বৎসরের দুটি অর্ধ আছে—একটি ফর্সা আর একটি অন্ধকার। বৎসরের এই দুই দিক সূর্যের অয়নান্তেরও ইঙ্গিতবহ, অর্থাৎ কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তি। এর ইঙ্গিত রয়েছে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১৭নং সূক্তের ৬নং শ্লোকে। বলা হয়েছে ঃ

"প্রপথে পথামজনিষ্ট পূষা প্রপথে দিবঃ প্রপথে পৃথিব্যাঃ।
উভে অভি প্রিয়তমে মধস্থে আ চ পরা চরতি প্রজানন্ ॥"৬

অর্থাৎ "সেই পূষা সকল পথে শ্রেষ্ঠ পথে দর্শন দিলেন। তিনি স্বর্গ ও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠপথে দর্শন দিলেন। তাঁর যে দুই প্রেয়সী অর্থাৎ দ্যৌ ও পৃথিবী আছে, যারা এক সঙ্গে থাকে তিনি উভয়েরই মনোরঞ্জন করেন।"

ঋগ্বেদে বিষ্ণু উপরোক্ত চার দেবতা থেকে একটু কম গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেলেও যথার্থই কম নন। তার উল্লেখ এদের মত নেই। তথাপি তিনি গুরুত্বপূর্ণ। তিনিও অন্যতম আদিত্য। পুরাণ কাহিনীতে গিয়ে বিষ্ণুর তিন পদক্ষেপ একটি রহস্য সৃষ্টি করেছেন। এই তিন পদক্ষেপ হল মহাবিশ্বের তিনটি স্তর। তাঁর এই পদক্ষেপ মানুষেরই কল্যাণের জন্য। ব্রাহ্মণ্য পুরাণ কাহিনীতে এই বিষ্ণুই বামন অবতার রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। যাস্কের মতে তাঁর এই তিন পদক্ষেপ হল দ্যুলোক, অন্তরীক্ষলোক ও ভূলোক। কারো কারো মতে তিনলোকে সূর্যের বিভিন্ন অবস্থাই তাঁর তিন পদক্ষেপ। পৃথিবীতে তিনি অগ্নি, অন্তরীক্ষলোকে বিদ্যুৎ ও দ্যুলোকে ভগবান সবিতৃ। কিন্তু বিষ্ণু শব্দের মূল অর্থ কিন্তু তাঁকে আরও মহীয়ান করে তুলেছে। এর মূল অর্থ 'স্বয়ংপ্রকাশ'। তাঁর তিন পদ সত্ত্ব, রজ ও তমঃ-ও হতে পারে। আপনাতে আপনি প্রকাশিত এই বিষ্ণু সীমার বন্ধন অতিক্রম করে অসীম এক ব্যাপ্তি ধারণ করেছেন। তখন বিষ্ণু হয়েছেন পরমপুরুষ। শুধুমাত্র আদিত্য নন আদিত্যদেরও স্রষ্টা। এই স্বয়ংপ্রকাশ অর্থ থেকেই বোধহয় দ্রাবিড়েরা আকাশকে বলেছেন 'বিন্'। অনেকের মতে এই 'বিন্' শব্দ থেকেই বিষ্ণু শব্দ এসেছে। এই জন্য পৌরাণিক কাহিনীতে তাঁর বর্ণও নীল করে দেখানো হয়েছে।

দীর্ঘতমস ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ১৫৫নং সূক্তের ৬নং শ্লোকে বলেছেন ঃ

"চতুর্ভিঃ সাকং নবতিং চ নামভিশ্চক্রং ন বৃত্তং ব্যতীঁরবীবিপৎ।
বৃহচ্ছরীরো বিমিমান ঋক্বভির্যুবা কুমারঃ প্রত্যেত্যাহবম্ ॥"৬

অর্থাৎ "বিষ্ণু গতি দ্বারা বৎসরের চতুর্নবতি দিবস চক্রের ন্যায় বৃত্তাকারে চালিত করেছেন। বিষ্ণু বৃহৎ শরীরবিশিষ্ট ও স্তুতিদ্বারা পরিমাপযোগ্য। তিনি নিত্য তরুণ ও অকুমার। তিনি আহবে গমন করেন।" এর দ্বারা সৌরচক্রের ৩৬০টি ভাগ বোঝায়—যা নাকি ঋতু ও বিষুব দ্বারা চার ভাগে বিভক্ত হয়েছে।

সূর্য দেবতা বিষ্ণু পরে সূর্য নারায়ণ নামে অন্যান্য সূর্যদেবতাকে নিজের মধ্যে গ্রাস করে নেন। সকল সূর্যমন্ত্র প্রকৃতপক্ষে তাঁর উদ্দেশেই নিবেদিত হয়। মরুৎদের নেতা হিসেবেও তিনি এভম্মরুৎ। ইন্দ্রের সঙ্গেও তাঁকে দেখা যায়। পরে সকল দেবতাই তাঁর মধ্যে নিজেদের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেন। এই কারণে ঋগ্বেদে তার উল্লেখ কম হলেও গুরুত্ব কম নয়। বিষ্ণু যজ্ঞেরও প্রতীক। এই কারণে ভগবদ্‌গীতাতে তাঁকে যজ্ঞ হিসেবেই বলা হয়েছে। যজ্ঞে তিনিই আলো। এই জন্য তাঁর শক্তি হিসাবে লক্ষ্মীকে পবিত্র অগ্নিতেই প্রথম দিকে পূজা করা হোত।

বিষ্ণুর মাহাত্ম্য ঋগ্বেদোত্তর যুগে আরও বেড়েছে। বৈজ্ঞানিকেরা দ্রাবিড়দের মত বিষ্ণুর মধ্যে দেশীয় (spatial) গুণ দেখতে পেয়েছেন। ঋগ্বেদও তাঁকে স্বর্গ ও মর্ত্যস্রষ্টারূপে দেখিয়েছে। ঋগ্বেদের বিষ্ণু বিষ্ণুপুরাণে এসে আরও বড় হয়েছেন, যখন বলা হচ্ছে "বিশ্বজগৎ বিষ্ণু থেকেই জাত, বিষ্ণুতেই ধৃত। জগতের গতি ও গতিরোধের কারণও তিনিই। তিনিই মহাবিশ্বজগৎ।" পদ্মপুরাণে দেখা যাচ্ছে শিব বিষ্ণুকে 'অনাদি অনন্ত' বলে বর্ণনা করছেন। মহাভারতে বিষ্ণুর স্বর্গকে মণিমুক্তাখচিত বলে বর্ণনা করা হচ্ছে।

বিষ্ণুকে কৃষ্ণকায় হিসেবেও পরে দেখানো হয়েছে। এখানে তিনি হলেন অন্তরীক্ষলোকেরও ঊর্ধ্বের দেবতা, কারণ অন্তরীক্ষলোকের উপরের দেশ (space) অন্ধকারাচ্ছন্ন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর ত্রয়ীর কল্পনা বৈজ্ঞানিক দিক থেকেও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ব্রহ্মা হলেন প্রকাশতত্ত্ব। শিব রুদ্র বা মহেশ্বর গতিতত্ত্ব ও বিষ্ণু হলেন দেশতত্ত্ব। প্রকাশ ও গতির মধ্যেই দেশ (space) বর্ধমান হচ্ছে। এই কারণে ব্রহ্মা ও মহেশ্বর বা রুদ্রের মাঝখানে বিষ্ণুকে স্থান দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী কালে পুরাণ কাহিনীতে বলা হচ্ছে যে, বিষ্ণুর নাভি থেকে ব্রহ্মার উৎপত্তি। এর দ্বারা দেশে (space) সৃষ্টির প্রকাশকেই বোঝায়। এই ভাবে পুরাণের বহু গল্পের বীজই ঋগ্বেদের বিষ্ণুর মধ্যেই লুক্কায়িত ছিল। বর্তমানে পদার্থবিদেরা এর মধ্যে গল্পের আকারে বহু প্রাচীন ঘটনার বৈজ্ঞানিক পশ্চাৎপট খুঁজে পাচ্ছেন।

রুদ্রও বিষ্ণুর মত ঋগ্বেদে অন্যান্য দেবতার নিচেই স্থান পেয়েছিলেন। পরবর্তী কালে বিষ্ণুরই মত মহান হয়ে উঠেছেন। বিজ্ঞানের মতে রুদ্র হলেন গতি তত্ত্ব, Big Bang-এ যে গতি ছুটে গিয়ে দেশ (বিষ্ণু) সৃষ্টি করেছে। তিনি মহাদেশ (supervoid) থেকে নিজেও সৃষ্ট হয়েছেন। ব্রহ্মা (প্রকাশতত্ত্ব),

বিষ্ণু (দেশতত্ত্ব) ও রুদ্র বা শিব মহেশ্বর (গতিতত্ত্ব)—তাই পরবর্তীকালে একাত্ম হয়ে ত্রিত্ব গঠন করেছেন। রুদ্রকে প্রধানতঃ দেখা যায় তীর ধনুকে সজ্জিত। কখনও কখনও তাঁর সঙ্গে বজ্র বিদ্যুৎও দেখা যায়। গতিতত্ত্ব হিসেবে তিনি ভয়ঙ্কর। **Big Crunch** হিসেবে তিনি লয়তত্ত্বও। বেদে তিনি ক্ষতিকর দেবতা হিসেবেই যেন চিহ্নিত। তবে এই ক্ষতির দিকটিই একমাত্র দিক নয়। তিনি আরোগ্যেরও কারণ। এই জন্য শ্রেষ্ঠতম বৈদ্য হিসেবেও তিনি চিহ্নিত। তাঁকে যেমন বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য স্তব করা হচ্ছে, তেমনই মানুষ ও পশুর জন্য কল্যাণপ্রদায়ক হিসেবেও আহ্বান করা হয়েছে। এই জন্য রুদ্র শেষ পর্যন্ত শিব বা কল্যাণের দেবতা হয়েছেন। ঋগ্বেদেই এই কল্যাণপ্রদ দিকের আরম্ভ। পরে তা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এই জন্য বেদোত্তর যুগে রুদ্র শেষ পর্যন্ত শিব নামেই পরিচিত হয়েছেন। রুদ্র নামটি ক্ষতিকর দিকের ইঙ্গিত বহন করেছে। তবে রুদ্রের যথার্থ উৎপত্তি কোথা থেকে তা স্পষ্ট নয়। ঋগ্বেদ পাঠ থেকে মনে হয় তিনি আদিতে বজ্রঝঞ্ঝার ধ্বংসাত্মক দিকটিরই প্রতিনিধিত্ব করতেন। তাঁকে পর্বতশৃঙ্গ ও অরণ্যের সঙ্গেও যুক্ত করা হয়েছে—কারণ, বিশ্বাস ছিল ঝড় ঝঞ্ঝা রোগাদি নেমে আসে পর্বতশৃঙ্গ ও অরণ্য থেকেই।

পরবর্তী কালে শিবরূপে তিনি পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের রূপ পেয়েছেন। তাঁর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রূপ হল নটরাজ রূপ। নটরাজ রূপে তিনি সৃষ্টি করছেন, ধ্বংস করছেন আবার বিশ্বনৃত্যে (cosmic dance) সৃষ্টিকে ধরেও রেখেছেন। মহারাষ্ট্রের এলিফ্যান্টা গুহায় শিবের মূর্তিতে তিনটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছে। দক্ষিণ দিকে তাঁর মুখ পুরুষের মুখ—বিজ্ঞানের **proton**-এর প্রতীক। বাম দিকে মহিলার মুখ, বিজ্ঞানের **electron**-এর প্রতীক। মাঝখানে দুইয়ের সাম্যাবস্থা বা neutron-এর প্রতীক। এত বড় একটা বৈজ্ঞানিক সত্যের বীজ ঋগ্বেদের রুদ্রের মধ্যেই কিন্তু নিহিত ছিল।

রুদ্র যে বেদের খুব গৌণ দেবতা তা নন। ঋগ্বেদে কোন্ দেবতার প্রতি কত স্তুতি করা হয়েছে তা দিয়ে কারো গুরুত্ব প্রমাণ হয় না। এই প্রাচীন ধর্মগ্রন্থটির অনেক কিছুই সূক্তগুলির অন্তরালে লুকিয়ে আছে। দেবতাদের বিচার করতে হবে তাঁরা যে ধরনের কাজ করেন তাই দিয়ে। এদিক থেকে রুদ্র ঋগ্বেদে একটি পিতৃপ্রতিম চরিত্র। অন্যান্য দেবতার তিনি পিতা। সেই জন্য সকল দেবতাকেই রুদ্র বলা যেতে পারে। বিশেষ করে ঝড়ের দেবতা, মরুৎ-দেবতারা তো রুদ্রেরই সন্তান। এখানে কিন্তু রুদ্র উগ্র নন। তাই ঋগ্বেদের ৬ষ্ঠ মণ্ডলের ৬৬নং সূক্তের ৩নং শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ

"রুদ্রসা যে মীড়্হুষঃ সন্তি পুত্রা যাংশ্চো নু দাধৃবিভর্ধ্যৈ।
বিদে হি মাতা মহো মহী যা সেৎ পৃশ্নিঃ সুভ্বে গর্ভমাধাৎ॥"৩

অর্থাৎ "অভিলাসপূরণকারী রুদ্রের যে পুত্র মরুৎগণ রয়েছেন এবং যাদের অন্তরীক্ষ ধারণ করতে সক্ষম সেই মহান মরুৎগণের মাতা মহতী। ঐ অন্তরীক্ষ মানুষের উৎপত্তির জন্য গর্ভে জল ধারণ করেন।"

অনেক রুদ্রকে জ্যোতির্বিজ্ঞানীয় একটি ব্যাপার বলে মনে করেছেন, যেমন বৃষরাশির শেষে রোহিণী নক্ষত্র রয়েছে। মৃগব্যাধ নক্ষত্রই এই রুদ্র।

অনেকের মতে রুদ্র-শিব মূলতঃ বৈদিক দেবতা নন। তিনি ব্রাত্য। সেই হিসেবে অবশ্য ইন্দ্রও বহু বিশ্বজাগতিক নিয়ম ভঙ্গ করার জন্য ব্রাত্য হয়েছিলেন। সেই জন্য বৃত্রবধের সময় অন্যান্য দেবতা তাঁকে পরিত্যাগ করেছিলেন। রুদ্রকে ব্রাত্য বলার কারণ পুরাণ কাহিনী, যেখানে রুদ্র দক্ষযজ্ঞ নাশ করেছিলেন। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে তাঁকে যজ্ঞনাশকারী হিসেবেই প্রতীয়মান হয়। দক্ষ রুদ্র বা শিবকে পূজা করতে অস্বীকার করেছিলেন এই কারণে যে, শিব ছিলেন বেদবাহ্য। এ থেকেই শিবকে অনার্য বলে ভাবা হয়েছে। কিন্তু দক্ষদুহিতা সতী শিবকে 'স্বয়ং যজ্ঞ' বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁকে 'বেদ' বলেও চিহ্নিত করা হয়েছে। দক্ষ যজ্ঞনাশ শেষে আবার তাঁকে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। আসলে প্রজাপতি বা ত্বষ্টা হলেন স্বয়ং যজ্ঞ। সময়ের দেবতা হিসেবে রুদ্রকে তাঁকে হত্যা করতে হবেই। এর একটি তান্ত্রিক বা যৌগিক গুরুত্ব এই ধরনের : প্রজাপতি জগতের অধীশ্বর। অহং ত্যাগ করে অর্থাৎ যজ্ঞ করে আত্মস্থ হয়ে আছেন। তাঁকে হত্যা করতে না পারলে জগৎ প্রকাশ পাবে না। আত্মস্থ প্রজাপতিই সৎ। তাঁর আত্মজা অর্থাৎ আত্মা থেকে জাত শক্তি হলেন সতী। কালের অধীশ্বর তাঁকেই কালের সঙ্গে বের করে নিয়ে আসেন। এইজন্য তাঁকে কালের সহধর্মিণী হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। সতী অর্থাৎ 'সৎ'-এর গুণ ৫১টি তরঙ্গে দেশে ছড়িয়ে পরেই জগতের উৎপত্তি। এই জন্যই কল্পনা করা হয়েছিল যে, দেশের দেবতা বিষ্ণু, যিনি এই তরঙ্গগুলিকে বহন করছেন কালচক্র (সুদর্শন চক্র, ছন্দময় নৃত্যায়িত বৃত্তায়িত চক্র) দ্বারা তাঁকে খণ্ড-বিখণ্ড করেন। এই গুহ্য তত্ত্ব জানা থাকলে রুদ্রকে অনার্য বলে বোধ হয় না। অপরপক্ষে বিশ্ব-যজ্ঞ অর্থাৎ Big Crunch-এ জগৎ নাশ করেও শিব বা ইন্দ্র প্রকাশিত যজ্ঞ অর্থাৎ প্রজাপতিকে নাশ করেন। এই অর্থে দক্ষ বা ত্বষ্টা হলেন দেবতার বহিরাবয়ব, ইন্দ্র বা শিব হলেন অন্তর্দেবতা—অধ্যাত্ম জ্ঞান। অধ্যাত্ম জগতে ইন্দ্র ও শিব সেই সকল ঋষিরই প্রতিনিধি যাঁরা বাহ্যিক নিয়ম বা অনুষ্ঠানের ধার ধারতেন না—বর্ণাশ্রম মানতেন না। সুতরাং ইন্দ্র ও শিবের যে কাহিনী তা হল আর্যদেরই কাহিনী যে আর্যরা বহিরানুষ্ঠানের উপর আন্তর সাধনাকে বেশি মূল্য দিয়েছিলেন। রুদ্রকে দেখা যাচ্ছে মরুতগণের পিতা হিসেবে। এই মরুতেরা ছিলেন ঋষি পুরুষ। এঁরা আন্তরসাধনার দ্বারা সত্য জ্ঞান লাভ করেছিলেন ঋগ্বেদে এমন উল্লেখ আছে। ইন্দ্রও এই হিসেবে সর্বজ্যেষ্ঠ মারুৎ হিসেবে রুদ্রেরই পুত্র।

সূর্যোদয়ের পূর্বের দেবী হলেন উষা। তিনি হলেন দৌ-এর কন্যা। এই একটি মাত্র দেবী ঋগ্বেদে যার কথা বার বার বলা হয়েছে। ঋগ্বৈদিক ঋষিদের এ এক অনবদ্য সৃষ্টি। তাঁর মধ্যে যত না ধর্মের ভাব ফুটে উঠেছে তা অপেক্ষা অনেক বেশি ফুটে উঠেছে কাব্যের ঝঙ্কার। আরও আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, অন্যান্য দেবতার মত তিনি সোম যজ্ঞে আমন্ত্রিতা নন।

উষা ডি. ডি. কোশাম্বির মতে অনেকটাই হোমারের Eos-এর মত। তবে তাঁর আরো বেশি নৈকট্য হল মেসোপটেমিয় ইশতারের সঙ্গে। ইন্দ্রের সঙ্গে সংগ্রামে তাকে দেখা যাচ্ছে পরাজিত হতে।

উষাকে ঋগ্বেদে দেখা যাচ্ছে অশ্বিদ্বয়ের পত্নী হিসেবে। যদিও ঋগ্বেদে দেবতাদের সহধর্মিনীর কথা তেমন নেই, কিন্তু উষার ক্ষেত্রে তাকে সহ-ধর্মিনীরূপে বর্ণনা করার প্রয়াস যথেষ্ট আছে। অশ্বিদ্বয়ের স্ত্রী হিসাবে ঋগ্বেদের ৬ষ্ঠ মণ্ডলের ৬৩নং সূক্তের ৫নং শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ

"অধি শ্রিয়ে দুহিতা সূর্যস্য রথং তস্থৌ পুরুভুজা শতোতিম।
প্র মায়াভির্মায়িনা ভূতমত্র নরা নৃতূ জনিমন্যজ্ঞিয়ানাম্ ।।"৫

অর্থাৎ "হে বহুজনের রক্ষক অশ্বিদ্বয়! সূর্যদুহিতা তোমাদের বহুরক্ষক রথ শোভিত করার জন্য তাতে অধিষ্ঠান করেছিলেন। তোমরা দেবগণের এজন্মের প্রজ্ঞার ফলে প্রাজ্ঞনেতা ও নৃত্যশালী হও।"

ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলের ৬৯নং সূক্তের ৩-৪নং শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ

"সশ্বা যশসা যাতমর্বাগ্ দস্রা নিধিং মধুমন্তং পিবাথঃ।
বি বাং রথো বধ্বা যাদমানোহন্তান্দিবো বাধতে বর্তনিভ্যাম ।।৩
যুবোঃ শ্রিয়ং পরি যোষাবৃনীত সূরো দুহিতা পরিতক্ম্যায়াম্।
যদ্দেবয়ন্তমবথঃ শচীভিঃ পরি ঘ্রংসমোমনা বাং বয়ো গাৎ ।।"৪

অর্থাৎ "তোমরা সুঅশ্ব ও অন্নের সঙ্গে আমার দিকে এস। হে দস্রদ্বয়। তোমরা মধুমান নিধি সোম পান কর। তোমাদের রথ বধূর সঙ্গে গমন করে চক্রের দ্বারা দ্যুলোক পর্যন্ত প্রদেশসমূহকে বাধা দান করে। রাত্রিতে যোষিৎ সূর্যদুহিতা তোমাদের রথ পরিবৃত করে। তোমরা যখন দেবতাভিলাষীকে কর্মদ্বারা রক্ষা কর তখন অন্ন রক্ষার জন্য লোকে তোমাদের পরিগমন করে।"

সহজ কথায় এর অর্থ—হে অশ্বিদ্বয়। পত্নীসহ তোমাদের রথ আকাশ পরিক্রমা করে এর শেষ প্রান্ত স্পর্শ করে। যখন রাত্রি ধূসর প্রত্যূষের দিকে যাত্রা শুরু করে তখন সূর্যদুহিতা তোমাদের জাঁকজমক দেখে মোহিত হন। এতে উষাকে সূর্যদুহিতা ও অশ্বিদ্বয়ের বধূ-হিসেবে দেখানো হয়েছে। এখানে উষার মধ্যে যতটা কাব্য মাধুর্য ফুটে উঠেছে ততটা অধ্যাত্ম কোন ইঙ্গিত আছে কিনা বলা শক্ত। সম্ভবতঃ যোগে কুণ্ডলিনী জাগরণের প্রথম মুহূর্তটিই এই উষা দ্বারা ব্যক্ত হয়েছে। অশ্বিদ্বয় কুলকুণ্ডলিনী জাগরণের বায়ু হতে পারে।

অশ্বিদ্বয়কে ঋগ্বেদে প্রত্যূষের যমজ ভ্রাতা হিসাবে দেখানো হয়েছে। এঁরা দ্যৌ-এর পুত্র। চির তরুণ ও সুন্দর। ঋগ্বেদে এঁদের উদ্দেশে অনেক সূক্ত আছে। তাঁদের প্রসঙ্গে বহুবার 'নাসত্য' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। নাসত্য শব্দের অর্থ সত্য। তাঁরা তাঁদের যানে বাহন যুক্ত করার সঙ্গে সঙ্গেই উষার জন্ম। তাঁদের পত্নী সূর্যদুহিতা সূর্ষা সঙ্গে সঙ্গে তাদের সহগামিনী হন। তাদের চরিত্র যে ভাবে আঁকা হয়েছে তাতে মনে হয় তারা উদ্ধারকারী দেবতা। সাধারণ দুঃখকষ্ট ও বিশেষ করে জলযান-বিপর্যয়ের হাত থেকে আরোহীকে

রক্ষা করেন। তাঁদের দৈবচিকিৎসক হিসাবেও দেখানো হয়েছে। গ্রীক পুরাণ কাহিনী জিউস দেবের অশ্বারোহী পুত্রদের সঙ্গে তাঁদের মিলও লক্ষ্য করার মত। তাঁরা অপর পক্ষে হেলেনের ভ্রাতা হিসাবেও চিহ্নিত। কি ভাবে যে ঋগ্বেদে এই অশ্বিদ্বয়ের আবির্ভাব ঘটেছে তা স্পষ্ট নয়। তাঁদের চিন্তা শুকতারা ও সন্ধ্যাতারা থেকেও আসতে পারে।

কারো কারো মতে অশ্বিদ্বয় ঘূর্ণায়মান বিশ্বের প্রতীক—যার অর্ধেক সবসময়ই দৃষ্টির আড়ালে থাকে। কখনও কখনও অদৃশ্য অংশ দৃষ্টিগোচর হয় ও দৃশ্যগোচর অংশ আড়ালে চলে যায়।

ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১১৬নং সূক্তের ৪নং শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ

"তিস্রঃ ক্ষপস্ত্রিরহাতিব্রজদ্ভি র্না সত্যা ভুজ্যুমূহথুঃ পতঙ্গৈঃ।
সমুদ্রস্য ধন্বন্নার্দ্রস্য পারে ত্রিভীরথৈঃ শতপদ্ভিঃ ষলশ্বৈঃ ॥"৪

অর্থাৎ "হে নাসত্যদ্বয়! তোমরা বলবান ও ক্ষিপ্রগতি অশ্বদ্বারা নীত ও দেবগণের উৎসাহে উৎসাহিত হয়েছিলে। তোমাদের রথবাহ গর্দভ যমের প্রিয় সহস্রযুদ্ধ জয় করেছিল।"

এর দ্বারা যে শুধু সমুদ্রযাত্রার কথাই বোঝাচ্ছে তা নয়। এর একটা ভিন্ন ধরনের ইঙ্গিত আছে। ভুজ্যু এখানে সূর্য। শতপদ ও ষট্ অশ্বযুক্ত যে তিনটি রথের কথা বলা হয়েছে তা হল বৎসরের ৩৬০ দিন। তিন দিন তিন রাত হল বছরের শেষ, যখন সূর্য নতুন করে আলো দান করে। সমুদ্রযাত্রা এখানে সৌরকাহিনীর সঙ্গে যুক্ত। সমুদ্র অতিক্রম করবার অর্থ বৎসরান্তে সূর্যের নতুন করে ফিরে আসা। বণিকদের জন্য এটি একটি প্রতীক স্বরূপ।

ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ১১৭নং সূক্তের ১৪নং শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ

"যুবং তুগ্রায় পূর্ব্যেভিরেবৈঃ পুনর্মন্যাবভবতং যুবা না।
যুবং ভুজ্যুমর্ণসো নিঃ সমুদ্রাদ্বিভিরূহথু ঋজ্রেভিরশ্বৈঃ ॥"১৪

অর্থাৎ "হে দুঃখনাশকারীদ্বয়। তুগ্র তোমাদের স্তোত্র দ্বারা যেভাবে স্তুতি করত পরে আবার তোমাদের যেমন অর্চনা করত, কারণ তোমরা তার পুত্র ভুজ্যকে বিক্ষুব্ধ সমুদ্র থেকে নৌকা ও দ্রুতগতি অশ্বদ্বারা এনে দিয়েছিলে।"

উপরোক্ত শ্লোক, ১ম মণ্ডলের ১১৮নং শ্লোক, ষষ্ঠ মণ্ডলের ৬২নং সূক্তের ৬নং শ্লোক, সপ্তম মণ্ডলের ৬৯নং সূক্তের ৭নং শ্লোক এবং অষ্টম মণ্ডলের ৫নং সূক্তের ২২নং শ্লোকে যে ভাবে অশ্বিদ্বয়কে বর্ণনা করা হয়েছে তাতে মনে হয়—আর্যদের পূর্বপুরুষেরা বোধহয় সমুদ্রের অপর পারে অন্য কোথাও ছিল। অশ্বিদ্বয় তাঁদের উদ্ধার করে এনেছিলেন। উপরোক্ত সূক্তগুলির তুগ্র ও তৌগ্র শব্দ দ্বারা তৌগ্র অর্থাৎ সূর্যজাত অর্থাৎ সূর্যবংশীয় তুর্বশ ও যদুদের বোঝায়। তুর্বশ ও যদু আর্য পঞ্চগোষ্ঠীভুক্ত—যেমন পুরু, যদু, তুর্বশ, অণু ও দ্রুহ্য। বৈজ্ঞানিক দিক থেকে অশ্বিদ্বয়কে এখানে বিশ্বের সম্প্রসারণশীল শক্তিকে বোঝায়। এই শক্তি চলে **quantum leap**-এ।

ঋগ্বেদের ২য় মণ্ডলের ১৮নং সূক্তের ১নং শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ

"প্রাতা রথো নবো যোজি সস্নিশ্চতুর্যুগস্ত্রিকশঃ সপ্তরশ্মিঃ।
দশারিত্রো মনুষ্যঃ স্বর্ষাঃ স ইষ্টিভির্মতিভী রংহ্যোভূৎ ॥"১

অর্থাৎ "প্রত্যূষে নতুন যান ব্যবহার করা হল অর্থাৎ যজ্ঞ আরম্ভ করা হল। এ যজ্ঞে প্রস্তর (যূপ) চারখানি। তিনপ্রকার স্বর (চাবুক), সাত প্রকার ছন্দ (রশ্মি) ও দশ ধরনের পাত্র (দাঁড়) আছে। এ মানুষের হিতকর ও স্বর্গ দাতা। মনোহর স্তুতি ও যাগাদি দ্বারা প্রোথিত হবে। অর্থাৎ চিন্তা ও ইচ্ছা দ্বারা একে পরিচালিত করতে হবে। উপরোক্ত শ্লোকটিতে স্পষ্ট চিৎশক্তি জাগরণের কথা বলা হয়েছে। প্রত্যূষ এখানে চিৎশক্তির স্ফুরণ। নতুন যান হল কুলকুণ্ডলিনী। চারটি যূপ হল ওঁ-এর চারটি পর্যায়—পয়া, পশ্যন্তি, মধ্যমা ও বৈখরী। এর দ্বারা চিৎশক্তির অনাহত চক্র অবধি ঊর্ধ্বগতি বোঝাচ্ছে। তিনটি চাবুক দ্বারা বিশুদ্ধ চক্র, আজ্ঞা চক্র ও সপ্তাতল বোঝাচ্ছে। দশটি দাঁড় দ্বারা দশমাত্রা বা দশমিক বিন্দু বা **Ten dimensional false vacuum** বোঝাচ্ছে। ফলে শ্লোকটি প্রমাণ করে যে, ঋগ্বেদের সব বক্তব্যেরই বাচ্যার্থের অন্তরালে একটা মরমিয়া বক্তব্য আছে। সেই ক্ষেত্রে অশ্বিদ্বয় আশ্চর্য জীব হলেও এঁদের বিশেষ একটা প্রতীকী অর্থ আছে। সেই অর্থ ধরা না গেলে বোধহয় সবটা পরিষ্কার হবে না।

অশ্বিদ্বয়ের এই রহস্যময় চরিত্রের জন্য তাঁদের মধ্য দিয়ে পার্থিব অপার্থিব নানা ভাব ব্যক্ত হয়েছে।

অশ্বিদ্বয় প্রসঙ্গে সে সমুদ্র ও জাহাজের চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে তার বিবিধ অর্থ আছে যেমন দেশীয় (spatial) সমুদ্র ও দেশীয় (spatial) জাহাজ— **cosmic ocean** ও **cosmic ship.** অপর পক্ষে অশ্বিদ্বয়ের জ্যোতির্বিদ্যা-বিষয়ক ইঙ্গিতও আছে। অশ্বিদ্বয় সম্ভবতঃ অশ্বিনী নক্ষত্রের নিয়ন্ত্রক। তার সঙ্গে যুক্ত অশ্বমস্তক সম্ভবতঃ অয়নান্তে সূর্যের প্রত্যাগমন বোঝায়। এতে অন্ধকারের উপর আলোর জয় সূচিত হয়। ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলের ৭১নং সূক্তের ৫নং শ্লোকে সে বর্ণনা আছে ঃ

"যুবং চ্যবানং জরসোহমুমুক্তং নি পেদব ঊহথুরাশুমশ্বম্।
নিরংহসস্তমসঃ স্মর্তমত্রিং নি জাহুষং শিথিরে ধাতমন্তঃ ॥"৫

অর্থাৎ "তোমরা চ্যবনকে জরা থেকে মুক্ত করেছিলে, পেদুর জন্য যুদ্ধে দ্রুতগামী অশ্ব প্রেরণ করেছিলে। অত্রিকে পাপ ও অন্ধকার থেকে পার করেছিলে। যাহুসকে হৃতরাজ্যে পুনঃস্থাপিত করেছিলে।" চ্যবনের জরা-মুক্তি দ্বারা এখানে সূর্যের মকরক্রান্তি থেকে অব্যাহতি বোঝাচ্ছে। এখানে পেদুকে যে শ্বেত অশ্ব দেওয়া হচ্ছে তা দ্বারা সূর্যকেই বোঝাচ্ছে। অধ্যাত্ম-জগতেও এই ধরনের মকরক্রান্তি আছে। তা থেকে জ্যোতিদর্শনেই মুক্ত হওয়া যায়। এই জ্যোতিকেই ঋগ্বেদে সবিতৃ বলা হয়েছে। অশ্বিদ্বয় এই অর্থে প্রাচীনতম আলোবর্ষী দেবতা ও দেবযানের প্রবর্তক। অনেকে অশ্বিদ্বয়কে ঋষিদের যোগ বিভূতি বা ক্ষমতা হিসেবেও বর্ণনা করছেন।

অশ্বিদ্বয়কে ঋগ্বেদের নানাস্থানেই পদ্মের সঙ্গে যুক্ত করে দেখানো হয়েছে।

এই পদ্মেরই এক নাম পুণ্ডরীক (শ্বেতপদ্ম)। পদ্ম যোগের ষট্চক্রের প্রতিটি চক্রের ভূমি স্বরূপ। পদ্মকে বিজ্ঞানে বলে **Neutron field**—যা থেকে আপনা আপনি প্রতি ১২-১৪ মিনিটে প্রোটন ও ইলেকট্রন বেরিয়ে আসে। অশ্বিদ্বয়ের ক্ষেত্রে এই পদ্ম দ্বারা মূলাধার থেকে সহস্রার পর্যন্ত পদ্মগুলিকেও বোঝানো হতে পারে। অশ্বিদ্বয়ের মধ্যে এই জন্য ঋগ্বেদে এমন ক্ষমতা লক্ষিত হয় যার দ্বারা তাঁরা অসাধ্য সাধন করেন, যেমন—মৃতকে প্রাণদান, অন্ধকে দৃষ্টিদান, বৃদ্ধকে যৌবন দান ইত্যাদি। এই ধরনের ক্ষমতা ভারতীয় যোগীদের মধ্যেও দেখা যায়। যিশু খ্রীষ্টেও এই ধরনের ক্ষমতা লক্ষ্য করা গেছে। সুতরাং অশ্বিদ্বয়ের একটা যৌগিক তাৎপর্যও থাকতে পারে। ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ১১৬ ও ১১৭নং সূক্তে এর ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। যেমন ১১৭নং সূক্তের ১৭নং শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ

"শতং মেষান্বৃক্যে মামহানং তমঃ প্রণীতম শিবেন পিত্রা।
আক্ষি ঋজ্রাশ্বে অশ্বিনাব ধত্তং জ্যোতিরন্ধায় চক্রথুর্বিচক্ষে ॥"১৭

অর্থাৎ "ঋজ্রাশ্ব বৃকীকে শত মেষ দেওয়ায় তাঁর ক্রুদ্ধ পিতা তাঁকে অন্ধ করে দিলে অশ্বিদ্বয় তাঁকে চক্ষু দান করেছিলেন। তোমরা দৃষ্টিলাভের জন্য অন্ধকে চক্ষু দিয়েছিলে।"

অন্তরীক্ষলোকের দেবতার মধ্যে ঋগ্বেদের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দেবতা হলেন ইন্দ্র। বরুণ যেমন নৈতিক শক্তির প্রধান দেবতা ইন্দ্র তেমনই সংগ্রাম-শক্তির মহান যোদ্ধা। বৈদিক ভারতীয়দের সর্বাপেক্ষা প্রিয় ও জাতীয় দেবতা হলেন ইন্দ্র। ঋগ্বেদের একচতুর্থাংশেরও বেশি এই ইন্দ্রের উদ্দেশে সূক্ত রচনাতেই ব্যয় হয়েছে। এর ফলে আর্য জগতে ইন্দ্রের গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়। ইন্দ্র বর্ণনার দিক থেকে অনেকটা মানুষের মতন। তবে তার উৎস কোথায় তা একেবারেই যে স্পষ্ট সে কথা বলা যায় না। তিনি বজ্রের দেবতা। বৃত্রের সঙ্গে তার সংঘর্ষই ইন্দ্র কাহিনীর অক্ষরেখার মত। সেই জন্য তাঁকে 'বৃত্র-হন্' উপাধি দেওয়া হয়েছে। বজ্রহস্তে সোম পানে উজ্জীবিত ইন্দ্র ঝড়ের দেবতা মরুৎদের সহায়তায় যুদ্ধে অবতীর্ণ। ইন্দ্রের সংগ্রাম ভয়াবহ, স্বর্গ মর্ত্য কেঁপে ওঠে। তাঁর অনবরত যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনী দেখে মনে হয় বজ্র-বিদ্যুৎ ঝড়েরই তিনি দেবতা। বৃত্রের সঙ্গে তাঁর সংগ্রামে দেখা যায়—মানুষের জন্য জলধারাকে তিনি মুক্ত করছেন। মেঘের আড়াল থেকে সূর্যের আলোকে মুক্তক রছেন। সেইজন্য ডঃ রাধাকৃষ্ণ কৃষ্ণসর্পরূপী বৃত্রাসুরকে ঘনকৃষ্ণ মৌসুমী মেঘ বলে মনে করেছেন। **James Hestings**-এর **Encyclopaedia of Religion and Ethics** গ্রন্থের অষ্টম খণ্ডের ৬০ পৃষ্ঠায় এই বৃত্র সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এই বৃত্র হল শীতের আকাশের মেঘ যে আকাশের মেঘে আর্দ্রতা থাকে না। নদনদীর উৎস পর্বতশৃঙ্গের তুষারে বরফাবৃত হয়ে থাকে। ডি. ডি. কোশাম্বির মতে ইন্দ্র হলেন একজন আর্যদলপতি যিনি সিন্ধু অঞ্চলে অনার্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের পরাজিত করে সিন্ধুনদের বাঁধগুলিকে ভেঙে জলধারাকে মুক্ত করেছিলেন। প্রাগ্বৈদিক সিন্ধুর অধিবাসিরা সিন্ধু-

নদে বাঁধ দিয়ে জলধারার সঙ্গে দেশের অভ্যন্তরে পলিমাটি নিয়ে গিয়ে জমি উর্বরা করতেন। তাঁরা লাঙলের সাহায্যে জমি চাষ না করে নাঙলার (Harrow) সাহায্যে কর্ষণ করতেন। এই বাঁধ ভেঙে যাওয়াতে সিন্ধুর উৎপাদন ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। প্রাগার্য সিন্ধুর অধিবাসীদের সভ্যতার পতন হয়। সিন্ধুর অধিবাসীরা নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা গড়ে তুলেছিলেন। ইন্দ্র সেই নগর বা 'পুর' ধ্বংস করে পুরন্ধর উপাধি পেয়েছিলেন। এই জন্য কেউ কেউ ইন্দ্রকে আর্যপ্রধান কোন বড় সেনাপতি বলে মনে করেছেন যিনি অনার্যদের বহু যুদ্ধে পরাজিত করে আর্য-জগৎকে নিরাপদ করেছিলেন। সেই জন্যই তিনি দেবতার মর্যাদা লাভ করে আছেন। এই জন্য তাঁকে কৃষ্ণবর্ণদের ধ্বংস করার কৃতিত্ব দেওয়া হয়েছে। তাঁর এক উপাধি 'শক্র' অর্থাৎ বলশালী। তবে তিনি যে অনৈতিকতার দায় থেকে মুক্ত তা নন। অনেক সময়ই খেয়াল খুশি মত নির্মম হয়ে উঠেছেন। নিজের পিতাকে হত্যা করেছেন, উষার রথ ধ্বংস করেছেন। সোম পানের প্রতিও তাঁর অতিরিক্ত পরিমাণে আসক্তি লক্ষ্য করা যায়। এসবই যোগের লক্ষণে ভারাক্রান্ত। যোগিরা মূলাধারস্থ কুল-কুণ্ডলিনীকে বায়ুদ্বারা আঘাত করে ঊর্ধ্বগতি করে যে সব অভিজ্ঞতা লাভ করে তাকে উপরোক্ত কাহিনীর আকারে বর্ণনা করা যায়।

ঋগ্বেদের যুগ শেষ হবার পর বরুণের মত দেবতা পেছনে পড়ে গেলেও ইন্দ্র কিন্তু স্বর্গের শাসক হিসেবে থেকে যান। ব্রাহ্মণ সাহিত্যেই তাকে স্বর্গাধিপতি হিসেবে দেখা যায়। পুরাণের যুগেও তাঁর সেই মর্যাদা নষ্ট হয় নি। তবে নিশ্চিত রূপেই ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের নিচে পড়ে যান।

ইন্দ্রের গুরুত্ব যোদ্ধা অপেক্ষাও প্রাচীন ভারতে বৃষ্টিদানকারী হিসেবে। প্রাচীনকালে কৃষক ও পশুচারকেরা বৃষ্টিকে বেশি মূল্য দিতেন। উষাকে জয় করে ও বৃত্রকে বধ করে সূর্যরশ্মি মুক্ত করার গুরুত্বও কম নয়। এ-দ্বারা প্রাচীন মানুষের আলো-শক্তি-পূজার ইঙ্গিতও পাওয়া যায়। তবে এই আলো শুধুমাত্র যে নৈসর্গিক আলো তা নাও হতে পারে। এক দলের মতে এই আলো অধ্যাত্ম আলো, যার দ্বারা আত্মজ্ঞান হয়। বালগঙ্গাধর তিলক অয়নান্তিক আলোর সঙ্গে একে যুক্ত করেছেন। এই আলো নিত্য দিনের সূর্যালোক নয়। এ হল সূর্যের দীর্ঘ অদর্শনের পরে জেগে ওঠা আলো। সূর্য দীর্ঘ দিন বৃষ্টির আড়ালে থাকে মেরুপ্রদেশে। সেই জন্য তিলক আর্যদের আদি বাসস্থান মেরুপ্রদেশ বলে মনে করেছেন। তবে যারা ঋগ্বেদে অধ্যাত্মতা পেতে চান তারা মনে করেন যে, বেদে সূর্য ও বৃষ্টির কোন গূঢ় ইঙ্গিত আছে। সূর্য হল আন্তরসূর্য। বেদের কাহিনীর অন্তরালে যৌগিক সূত্র খুঁজে পাওয়া কষ্টকর নয়। যাঁরা যোগের দৃষ্টিতে ইন্দ্রকে দেখেন তাঁরা মনে করেন যে, এই বজ্রনিক্ষেপক ইন্দ্র হলেন মূলতঃ প্রাণশক্তি যা মূলাধারস্থ কুলকুণ্ডলিকে আঘাত করে তাকে ঊর্ধ্বগামিনী করে তোলে। ইন্দ্র সেই দিক থেকে জাগ্রত চিৎসত্তা। সপ্তধারা অথবা সপ্ত হিন্দু বা সপ্ত সিন্ধু হল সূক্ষ্ম দেহের সাতটি চক্র। ইন্দ্রের জাগ্রত চিৎসত্তার পরিচয় ঋগ্বেদে আছে। বলা

হয়েছে যে, চেতনা লাভ করে তিনি সাগরের দিকে তাকালেন—যে সাগর থেকে তিনি চিত্তকে জাগিয়ে তুললেন। এই সাগর কারণ-সমুদ্র। সহস্রারস্থ কূটস্থানের শূন্যতা। ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলের ৬নং সূক্তের ২৮-২৯ শ্লোকে এই ধরনের উক্তি রয়েছে। ইন্দ্রের বজ্র হল পরমার্থ জ্ঞান, কারণ বজ্রের অর্থ শূন্যতা যা ভেদ্য নয়। এই জন্য একে হীরকের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। বৌদ্ধ বজ্রযান তত্ত্ব এই বজ্র থেকেই এসেছে।

ইন্দ্র যে শুধু অন্তরীক্ষ লোকেই অধিষ্ঠিত তা নয়। তার অধিষ্ঠান ক্ষেত্র সর্বত্র। তাই ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলের ৯৭নং সূক্তের ৫ম শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ

"যদ্বাসি রোচনে দিবঃ সমুদ্রস্যাধি বিষ্টপি।
যৎপার্থিবে সদনে বৃত্রহন্তম যদন্তরিক্ষ আ গহি ॥"৫

অর্থাৎ "হে ইন্দ্র যদি স্বর্গের দীপ্তস্থানে থাক, যদি সমুদ্রের মধ্যে কোন স্থানে থেকে থাক, হে বৃত্রহন্! যদি পৃথিবীর কোথাও থাক বা অন্তরীক্ষে থাক তবে এস।" এখানে ইন্দ্রের চরিত্র কোন সীমিত অঞ্চল, যেমন অন্তরীক্ষ-লোক ত্যাগ করে আরো ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁর এই সর্বব্যাপ্তি তাঁকে ভিন্নভাবে ভাবতে বাধ্য করে। তখনই মনে হয় যথার্থই তাঁর মধ্যে কোন অধ্যাত্মতার ইঙ্গিত আছে।

বৈদিক সংগ্রাম যে শুধুমাত্র আলোর জন্য সংগ্রাম তা নয়, এই সংগ্রাম জলের জন্যও। তবে এই জলও যে পার্থিব অর্থে জল তা নয়। এ হল প্রাণ-প্রবাহিনী স্রোতস্বিনী। এই সলিল হল কারণ-সলিল। একমাত্র জাগ্রত চিৎসত্তাদ্বারাই এই কুলকুণ্ডলিনী রূপ স্রোতস্বিনীকে সাগরের দিকে অর্থাৎ পরমাত্মার দিকে প্রবাহিত করা যায়। ইন্দ্র মহান বৃষ হিসাবেই এ কাজ করেন। বৃষ প্রাচীন মেসোপটেমিয়াতে মহান দেবতা হিসেবেই চিহ্নিত। ইন্দ্র এই জন্য নিজেকে 'বৃষ' বলেছেন। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৪৯নং সূক্তের ৯নং শ্লোকে তাই বলা হয়েছে ঃ

"অহং সপ্ত স্রবতো ধারয়ং বৃষা দ্রবিত্ন্বঃ পৃথিব্যাং সীরা অধি।
অহমর্ণাংসি বি তিরামি সুক্রতুর্যুধা বিদং মনবে গাতুমিষ্টয়ে ॥"৯

অর্থাৎ "আমি বৃষ হিসাবে জল বর্ষণ করি। যে সপ্তসিন্ধু দ্রবময় মূর্তিতে পৃথিবীতে প্রবাহিত হয় আমিই তাদের নিজ নিজ স্থানে স্থাপন করেছি। আমার সকল কর্মই শুভকর। আমিই জল বিতরণ করি। আমি যুদ্ধে যজ্ঞকর্তার জন্য পথ পরিষ্কার করে দিয়েছি।"

ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ৩২নং সূক্তের ১০নং শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ

"অতিষ্ঠন্তীনামনিবেশনানাং কাষ্ঠানাং মধ্যে নিহিতং শরীরম্।
বৃত্রস্য নিণ্যং বি চরন্ত্যাপো দীর্ঘং তম আশয়দিন্দ্রশত্রুঃ ॥"১০

অর্থাৎ "স্থিতিরহিত (অপরিচ্ছিন্ন) বিশ্রামরহিত জলের মধ্যে নিহিত নামশূন্য শরীরের উপর দিয়ে জল প্রবাহিত হচ্ছে। ইন্দ্রের শত্রু দীর্ঘ নিদ্রায় পতিত রয়েছে।" এই স্থিতি রহিত বিশ্রামরহিত জল হল দেশ (space)। বৃত্র হল কুলকুণ্ডলিনী। ইন্দ্র জাগ্রত চেতনা। জাগ্রত চেতনা মোক্ষলাভ করলে

কুলকুণ্ডলিনী মৃতপ্রায় হয়েই থাকেন। এই শ্লোকটির মধ্যে যে একটা গূঢ়ার্থ রয়েছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

কুলকুণ্ডলিনী এক দিক থেকে অসুর। কারণ অসুরের অর্থ মহান শক্তি। পরে সুর বা দেবতা বিরোধী বলে গণ্য হয়েছেন। এরা দুইয়েই জল থেকে জাত। এই জন্য ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলের ৩৫নং সূক্তের ২নং শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ

"ইমং স্বস্মৈ হৃদ আ সুতষ্টং মন্ত্রং বোচেম কুবিদস্য বেদৎ।
অপাং নপাদসুর্যস্য মহা বিশবান্যর্যো ভুবনা জজান।।"২

অর্থাৎ "আমরা তাঁর জন্য হৃদয় থেকে সুরচিত এই মন্ত্র উত্তমরূপে জপ করব। তিনি তা বারংবার জ্ঞাত হোন। স্বামী অপাং নপাৎ (জল) নিজ মহিমায় সকল ভুবন উৎপন্ন করেছেন। অর্থাৎ সুর ও অসুর সবই তাঁর থেকে উৎপন্ন হয়েছে। সুর হল পার্টিকুল, অসুর অ্যাণ্টি-পার্টিকুল। সবই শূন্যতা-রূপী দেশজাত।

ইন্দ্রের যে একটা সর্বব্যাপ্ত ভাব আছে তা আগেই বলেছি। এই অমলিন চিৎসত্তা চার ধরনের সমুদ্রসদৃশ রত্নসমর্থক। এই চার সমুদ্রকে 'ওঁ'-এর চারটি পর্যায় বলা যেতে পারে। ঋগ্বেদে এই চাব সমুদ্রের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৪৭নং সূক্তের ২নং শ্লোকে তাই বলা হয়েছে ঃ

"স্বায়ুধং স্ববসং সুনীথং চতুঃ সমুদ্রং ধরুণং রয়ীণাম্।
চর্কৃত্যং শংস্যং ভূরিবারমস্মভ্যং চিত্রং বৃষণং রয়িং দাঃ।।"২

অর্থাৎ "হে ইন্দ্র! তুমি উৎকৃষ্ট অস্ত্রধারণকারী। উত্তমরূপে রক্ষা করতে পার। সুন্দরভাবে পরিচালকের মত কাজ কর। তোমার কীর্তিতে চার সমুদ্র উজ্জ্বল (অর্থাৎ তুমিই চার ধরনের সমুদ্র—পরা, পশ্যন্তি, মধ্যমা ও বৈখরী)। তুমি নানা রত্ন ধারণ কর। তুমি মুহুর্মুহু স্তব পাবার যোগ্য। সকলেই তোমাকে প্রার্থনা করে—আমরা এমনই জানি।"

ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলের ৯৩নং সূক্তের ২নং শ্লোকে আছে ঃ

"নব যো নবতিং পুরো বিভেদ বাহ্বোজসা। অহিং চ বৃত্রহাবধীৎ।।"২

অর্থাৎ "যিনি বাহুবলে নিরানব্বইটি পুরী ভেদ করে বৃত্রহা অহিকে বধ করেছিলেন।" শত হল পূর্ণতা। নিরানব্বই হল বস্তুসত্তা অর্থাৎ কুল-কুণ্ডলিনীর (অহির) রাজ্য। এই নিরানব্বই স্তর ভেদ করে তিনি মায়াব জগৎ অতিক্রম করেছিলেন। সুতরাং এখানেও ইন্দ্র জাগ্রত চিৎসত্তারই প্রতীক।

ঋগ্বেদের চতুর্থ মণ্ডলের ২৬নং সূক্তের ১-৩নং শ্লোকে ইন্দ্রকে দেখা যাচ্ছে দিবোদাসকে সাহায্য করছে না। দিব্য শক্তি বা শুভশক্তির যিনি অধীন তিনিই দিবোদাস। এই ধরনের ব্যক্তির চিৎসত্তাই জাগ্রত। এখানেও দেখা যায় সম্বরের ৯৯ নগর ধ্বংস করে দিবোদাস শততমে পৌঁছচ্ছেন। এ ধরনের সূক্ত গূঢ় অধ্যাত্ম সাধনার ইঙ্গিতই বহন করে।

ঋগ্বেদে প্লাবনের কাহিনী পর্বতাশ্রিত সর্পহত্যার কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত। এই সর্পদের দুর্গ হল পর্বত। পর্বত হল মেরুদণ্ড। এই পর্বতশৃঙ্গে

অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্রে তারা জল (অমৃত) ও গাভী (জ্যোতি) ধরে রাখে। এই দুর্গ ভেঙেই ইন্দ্র বজ্রের সাহায্যে জলধারা বর্ষণ করেন। এই বজ্র হল শূন্যতা। চিৎশক্তি শূন্যতায় গেলেই বজ্র নিজের কাজ করে। জ্ঞানের অমৃত ধারা ও আলোতে সব প্লাবিত হয়ে যায়।

ইন্দ্র যে সর্বজ্ঞ ও ঋষি ঋগ্বেদের ৭ন মণ্ডলের ১৮নং সূক্তের ২নং শ্লোকে তার উল্লেখ আছে। যেমন,

"রাজেব হি জনিভিঃ ক্ষেয্যেবাব দ্যুভিরভি বিদুষ্কবিঃ সন্।
পিশা গিরো মঘবন্‌গোভিরশ্বৈ স্ত্বায়তঃ শিশীহি রায়ে অস্মান॥"২

অর্থাৎ "হে ইন্দ্র তুমি জায়াগণের (গুণ) সঙ্গে রাজার মত প্রদীপ্ত হয়ে অবস্থান কর। হে ভগবন্ তুমি বিদ্বান (জ্ঞানী) ও কবি (ত্রিকালজ্ঞ) স্তোতাদের রূপ দান কর এবং গো (আলো) ও অশ্ব (গতি) দ্বারা রক্ষা কর।" আমরা তোমাকে কামনা করি। তুমি আমাদের ধনলাভের জন্য শোধন কর।"

ইন্দ্র এই জন্য ঋগ্বেদে বরুণ অপেক্ষাও বড় মর্যাদা পেয়েছেন। ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলের ৮২নং সূক্তের ২নং শ্লোকে তাই বলা হয়েছে ঃ

"সম্রালন্যঃ স্বরালন্য উচ্যতে বাং মহান্তাবিন্দ্রাবরুণা মহাবসূ।
বিশ্বে দেবাসঃ পরমে ব্যোমনি সং বামোজো বৃষণা সংবলংদধু॥"২

অর্থাৎ "হে ইন্দ্র ও বরুণ। তোমরা মহান ও মহা ঐশ্বর্য বিশিষ্ট। তোমাদের একজন সম্রাট আর একজন স্বরাট। 'হে অভীষ্টদানকারীদ্বয়' আকাশে বিশ্বদেবগণ তোমাদের তেজ ও বল প্রদান করেছিলেন।" বরুণ যদি বিশ্বশাসক, ইন্দ্র তবে এখানে আত্ম শাসক। নিজেকে যিনি শাসন করতে পারেন তিনিই স্বরাট।

ঋগ্বেদে ইন্দ্রের যে দুটি অশ্ব আছে (হরি) তাদের যোগতত্ত্ববিদগণ যৌগিক প্রাণায়ামের প্রাণ ও অপান বায়ু বলে মনে করেন। ইন্দ্রকে অর্থাৎ চেতনাকে তাঁরাই (অর্থাৎ প্রাণ ও অপান বায়ু) যজ্ঞের অর্থাৎ অহংত্যাগের কাছে নিয়ে আসে। বেদে অশ্ব হল প্রাণের প্রতীক, বায়ু হল প্রাণ-দেবতার প্রতীক এবং ইন্দ্র হলেন জাগ্রত আত্মিক সত্তার প্রতীক। ইন্দ্র হলেন দিব্য আত্ম সত্তা—আত্মন্। এই জন্য দেহের বহিরোপাদান গ্রহণের মাধ্যমকে ইন্দ্রিয় বলে—অর্থাৎ দেহের এমন জিনিস যার নিয়ন্ত্রক ইন্দ্র স্বয়ং। এক্ষেত্রে ইন্দ্র হলেন নির্ভেজাল দীপ্ত-মানস।

ঋগ্বেদে ইন্দ্রকে দেখা যায় তিনবার করে সপ্ত পর্বতশ্রেণী ভেদ করছেন। এর দ্বারা মনে হয় তিন তিনবার মেরুদণ্ডের সপ্ত চক্র ভেদ করার কথা বলা হয়েছে। অথবা তিন বলতে ইড়া, পিঙ্গল ও সুষুম্না নাড়ি বোঝাচ্ছে।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১৩৮নং সূক্তের ৩নং শ্লোকে তিনি যে দস্যুদের পরাজিত করে নিজের রথ উদ্ধার করেছিলেন তারও যৌগিক তাৎপর্য আছে। বলা হয়েছে ঃ

"বি সূর্যো মধ্যে অমুচদ্রথং দিবো বিদদ্দাসায় প্রতিমানমার্যঃ।
দৃঢ়্হানি পিপ্রোরসুরস্য মায়িন ইন্দ্রো ব্যাস্যচ্চকৃবাঁ ঋজিশ্বনা॥"৩

অর্থাৎ "সূর্যদেব আকাশের মধ্যে রথ চালনা করলেন। তিনি দেখলেন আর্যজাতি দাসজাতির সমকক্ষ। ইন্দ্র ঋজিশবা নামক ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব করে পিপ্রু নামক মায়াবী অসুরের বলবীর্য নাশ করেছিলেন। এর দ্বারা আসলে কিন্তু সমাধির কথাই বোঝাচ্ছে, যার দ্বারা দেহস্থ প্রাণশক্তিকে অর্থাৎ আন্তর-সূর্যকে বাইরে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। বৈদিক সূক্তে অন্ধকার থেকে যে সূর্যকে মুক্তি দেওয়া হয় সেই সূর্য হল প্রাণ বা আত্মা। আত্মা এর দ্বারা কর্মের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করে এবং চিৎসত্তার চিরন্তন দিবালোকে প্রবেশ করে।

ঋগ্বেদের ৮ম মণ্ডলের ৪০নং সূক্তের ৫নং শ্লোকে উল্লেখ আছে ঃ

"যা সপ্তবুধ্নমর্ণবং জিহ্মবারমপোর্ণুত ইন্দ্র।
ঈশান ওজসা নভন্তামনাকে সমে ॥"৫

অর্থাৎ "নাভাকের মত ঋষি ইন্দ্র ও অগ্নির উদ্দেশে স্তুতি প্রেরণ করছেন। এরা সপ্তমূলবিশিষ্ট ও অবরুদ্ধ দ্বারবিশিষ্ট অর্ণবকে আচ্ছাদিত করেন। ইন্দ্র তেজবলে ঈশ্বর। ইন্দ্র ও অগ্নি সকল শত্রু হিংসা করুন।" এই সপ্ত-সাগর চেতনার সপ্তস্তর। এ ধরনের চিন্তা কোন প্রাচীন মানুষের শুধুমাত্র কল্পনাপ্রসূত নয়। ইন্দ্রকে ঋগ্বেদে দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রেই শিবের মত ব্রাত্য হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন। শিবের মত তিনি দুঃখ সুখের অতীত। তিনি শত্রু-হন্তারক অর্থাৎ ইন্দ্রিয় নাশক। ইন্দ্র শুধুমাত্র যে অসুরনিধনকারী তা নন। অনেক সময় দেবতাদের সঙ্গেও সংগ্রামে রত। অর্থাৎ ভালমন্দ সকল ধরনের গুণকে জয় করে তিনি নির্গুণে যাবার পথ করে দেন। এই জন্যই ঋগ্বেদের চতুর্থ মণ্ডলের ৩০নং সূক্তের ৩নং শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ

"বিশ্বে চনেদনা ত্বা দেবাস ইন্দ্র যুযুধুঃ। যদহা নক্তমাতিরঃ ॥"৩

অর্থাৎ "হে ইন্দ্র। সকল দেবতা তোমাকে বল স্বরূপে গ্রহণ করে যুদ্ধ করেছিলেন। তুমি দিবারাত্র শত্রুদের বধ করেছিলে।" এর মূল অর্থ—সকল দেবতা একত্র হয়েও তোমাকে জয় করতে পারেন নি। হে ইন্দ্র! তুমি দিবারাত্র শত্রুদের বধ করেছিলে অর্থাৎ ইন্দ্র আত্মজ্ঞানের পরিপন্থী শত্রুদের বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম করেছিলেন। দেবতাদের মধ্যেও সামান্যতম ইন্দ্রিয়ের প্রভাব থাকলেও ইন্দ্রের মধ্যে তা নেই বলেই তিনি সকল দেবতার সমবেত শক্তি অপেক্ষা বড়। ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রক হিসেবে সেই সকল দেবতারও নিয়ন্ত্রক।

আত্মজ্ঞান লাভ করলে যে ব্রাত্য জনও উন্নত স্তরের অধিকারী হন ঋগ্বেদে ইন্দ্রের স্তুতিকালে তারও উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলের ১৩নং সূক্তের ১২নং শ্লোকে তার উল্লেখ আছে, যেমন—

"অরময়ঃ সরপসন্তরায় কং তুর্বীতয়ে চ বয্যায় চ স্রুতিম।
নীচা সন্তমুদনয়ঃ পরাবৃজং প্রান্ধং শ্রোণং শ্রবয়ন্ত্সাস্যুক্থ্যঃ ॥"১২

অর্থাৎ "হে ইন্দ্র। তুর্বীতি ও বয্য যাতে বিনা বাধায় প্রবহমান জল পার হতে পারে—সে জন্য তুমি তাদের পথ করে দিয়েছিলে। তুমি অন্ধ ও পঙ্গু পরাবৃজকে নিম্ন থেকে উদ্ধার করে নিজেকে কীর্তিমান করেছ। সুতরাং তুমি স্তুতির যোগ্য।"

ইন্দ্র অনেক সময়ই ব্রাত্য হিসেবে চিহ্নিত হয়ে ছিলেন এই কারণে যে, তিনি প্রচলিত তৎকালীন আর্য সমাজের রীতিনীতি ভঙ্গ করেছিলেন। আসলে মুক্ত পুরুষরা কখনই সামাজিক রীতিনীতি দ্বারা বদ্ধ নন। এই কারণেই ভারতীয় সন্ন্যাসীদের জন্য আর্য সমাজের বর্ণাশ্রম ধর্ম নেই। ইন্দ্র প্রকৃত অর্থে মানুষের আত্মসত্তার প্রতীক। ইন্দ্রের উদ্দেশে রচিত সূক্তসমূহ পাঠ করে একথাই মনে হয় যে, বৈদিক ধর্মে অধ্যাত্মতাই ছিল তার প্রাণসম্পদ। আপাত যে গল্পের আবরণ সেটা ভাষা রূপমুখি ছিল বলে। বৈদিক বহু দেবতার মধ্য দিয়ে এই জন্যই অদ্বৈতবাদের সুর প্রবাহিত ছিল একথাই বলা যেতে পারে। বহুদেববাদ তো ছিলই না। এমন কি একেশ্বরবাদও সেখানে প্রাধান্য পায়নি। ইন্দ্রকে এই জন্য অনেকেই 'ওঁ'-এর শক্তি হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ইন্দ্র বাদেও বায়ুমণ্ডলে বজ্রের সঙ্গে যুক্ত আরও তিনটি দেবতা রয়েছেন। এঁদের মধ্যে প্রথম হলেন তৃত। অস্পষ্ট দেবতা। আরও অস্পষ্ট হয়েছেন তাঁর ক্ষেত্রে 'আপত্য' শব্দ প্রয়োগের জন্য। আপত্য অর্থ জলীয়। তবে ঋগ্বেদে একটু বিচ্ছিন্ন ভাবেই তাঁর উল্লেখ করা হয়েছে। 'তৃত' শব্দ দ্বারা সম্ভবতঃ অগ্নির তৃতীয় অবস্থার কথা বোঝানো হয়েছে। খুঁজে পেতে দেখলে ইরাণীয় ধর্মগ্রন্থ অবেস্তাতেও তার সন্ধান পাওয়া যাবে। ঋগ্বেদে তাকে সোম পেষক হিসেবে লক্ষ্য করা যায়। তিনি ইন্দ্রকে বৃত্র ও তিন মস্তিষ্ক যুক্ত অসুর বিশ্বরূপ হত্যায় সাহায্য করেছিলেন। তিনি স্বর্গীয় অগ্নি-প্রজ্বালক। কখনও কখনও নিজেই অগ্নি হিসাবে প্রতিভাত। তার নিবাস অজ্ঞাত এবং অনেক দূরে। ইন্দ্রের সঙ্গে তাঁরও জন্মকথার কিছু সামঞ্জস্য আছে। পরে অবশ্য বৈদিক সাহিত্য থেকে ধরতে গেলে বাদই পরে যান। ব্রাহ্মণ সাহিত্যে এসে দেখা যায় অগ্নির তিন পুত্রের এক পুত্র হিসেবে দেখা দিচ্ছেন। আর দু'জনের নাম একতা ও দ্বিত। মহাকাব্যে ওইমাত্র মানব ঋষি হিসেবে প্রতিভাত।

মনে হয় ইন্দ্রই তৃত রূপে ত্বষ্টার পুত্রকে হত্যা করেছিলেন। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৮নং সূক্তের ৭-৯ পর্যন্ত শ্লোকে তৃতের উল্লেখ আছে। এখানে দেখা যাচ্ছে তৃত ত্বষ্টার তিন মস্তিষ্ক ও সপ্তরশ্মি সম্পন্ন পুত্রকে হত্যা করছেন। আসলে এর অর্থ হল দেহের সপ্ত চক্র ও চেতনার তিন স্তর। সে যজ্ঞেরও প্রতীক। ইন্দ্রের ত্বষ্টা হত্যা আত্মনের বিশ্বজগৎ অতিক্রম করে পরমাত্মনে মিশে যাবার প্রতীক। ইন্দ্র আত্মনের প্রতীক। শিবের দক্ষযজ্ঞনাশের প্রতীকও তাই —যে কথা রুদ্র প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে।

আর একটি রহস্যময় দেবতার উল্লেখ ঋগ্বেদে আছে যার নাম অপাম্ নপাৎ। এর অর্থ সাগর বা জলের পুত্র। এরও উৎস ইন্দো-ইরাণীয় পর্যায়ে। ঋগ্বেদে এর উল্লেখ কম আছে। তাঁকে দেখা যাচ্ছে বিদ্যুৎ দ্বারা পরিবৃত, এবং জলের বুকে কোন দাহ্য পদার্থ দ্বারা জ্বলছেন। এতে মনে হয় তিনি বারবানল। আবার বজ্রমেঘজাত বিদ্যুৎও হতে পারেন।

মাতরিশ্বা নামে আর এক দেবতার কথা ঋগ্বেদে ছড়ানো ছিটোনো ভাবে উল্লেখিত আছে। কিছুটা গ্রীক পুরাণ-কাহিনীর প্রমেথিউসের মত। তিনিও

প্রমেথিউসের মত স্বর্গ থেকে আলো চুরি করে নিয়ে এসেছিলেন। সম্ভবতঃ অগ্নির অন্তরীক্ষলোকের দিক হলেন এই মাতরিশ্বা। পরবর্তী বেদ, ব্রাহ্মণ সাহিত্য ও বেদোত্তর সাহিত্যে তাঁর চরিত্রের অনেকটাই পরিবর্তন ঘটে গেছে। তখন তাঁকে মনে হচ্ছে বায়ুদেবতা হিসেবে। এর পেছনেও ঋগ্বেদীয় ঋষিদের যে একটা মরমিয়া অভিজ্ঞতার ব্যাপার আছে সেটা স্বীকার করতে হবে। কারণ ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ১৬৪নং সূক্তের ৪৬নং শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ

"ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্।
একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ ।।"৪৬

অর্থাৎ "এই অদিত্যকে জ্ঞানীব্যক্তিগণ ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ ও অগ্নি বলে থাকেন। ইনি স্বর্গীয়, পক্ষবিশিষ্ট ও সুন্দরভাবে গমনশীল। ইনি এক হলেও এঁকে বহুরূপে বর্ণনা করা হয়। একে অগ্নি, যম ও মাতরিশ্বা বলে।"

এর পরই উল্লেখযোগ্য দেবতা রুদ্র। যাঁর কথা বিষ্ণু প্রসঙ্গেই বলেছি। রুদ্র ও পৃশ্নির (spotted cow) পুত্র হিসেবে মরুৎদের দেখানো হয়েছে। এঁরা হলেন ঝড়ের দেবতা। ইন্দ্রের সংগ্রামে সর্বদাই এঁরা সহকারী হিসেবে থেকেছেন। তাঁদের জন্ম সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে, বিদ্যুতের হাসি থেকে তাঁদের জন্ম। এই তরুণ যোদ্ধারা বর্শা ও কুঠারসজ্জিত। মাথায় শিরস্ত্রাণ আছে, দেহে হিরণ্য অলংকার। তাদের স্বর্ণমণ্ডিত রথ বিদ্যুতের আলোয় ঝল্‌মল্‌ করে। তাঁদের দাপটে পর্বতশৃঙ্গ ও অরণ্যের মহীরুহ বিপর্যস্ত হয়। রুদ্রের ধ্বংসাত্মক ও কল্যাণপ্রদ উভয় দিকই তাঁদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। তাঁদের বজ্রপাতে মানুষ ও পশুপালের মৃত্যু হয়। কিন্তু তাঁরা বৃষ্টিপাত ঘটিয়ে ধরণীকে উর্বরা করেন।

যাঁরা মরমিয়া দৃষ্টিতে ঋগ্বেদকে দেখেন তাঁরা মনে করেন যে, মরুৎগণ হলেন ঋষিদের শক্তির প্রতীক। কেউ কেউ মরুৎগণকে বৈদিক ঋষি বলেই মনে করেছেন—যাঁরা যোগী, সন্ন্যাসী ও ভ্রাম্যমাণ সাধুদের মত জ্ঞানান্বেষাতে স্বাধীন ভাবে ঘুরে বেড়ান। দেখা যাচ্ছে তাঁরা স্বর্গ মর্ত্য সর্বত্রই স্বাধীন পরিব্রাজক। এই জন্য ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলের ৫৬নং সূক্তের ৮নং শ্লোকে 'দুর্ধর্ষ মৌন সন্ন্যাসীর ন্যায়' তাঁদের দেখানো হয়েছে। যেমন ঃ

"শুভ্রো বঃ শুষ্মঃ ক্রুধ্মী মনাংসি ধুনির্মুনিরিব শর্ধস্য ধৃষ্ণোঃ ।।"

অর্থাৎ "তোমাদের বল সর্বত্র শোভমান। তোমাদের চিত্ত ক্রোধপরায়ণ। ধর্ষণযোগ্য শক্তিমান মরুৎগণের বেগ স্তোস্তার মত নানা শব্দকারী।" এই তরুণ সন্ন্যাসীদের যে সত্য জ্ঞান আছে ঋগ্বেদের ৫ম মণ্ডলের ৫৮নং সূক্তের ৮নং শ্লোকে তাও বলা হয়েছে। যেমন,

"হয়ে নরো মরুতো মৃলতা নস্তুবীমঘাসো অমৃতা ঋতজ্ঞাঃ।
সত্যশ্রুতঃ কবয়ো যুবানো বৃহদ্গিরয়ো বৃহদুক্ষমাণাঃ ।।"৮

অর্থাৎ "হে মরুৎগণ। তোমরা আমাদের প্রতি অনুকূল হও। তোমরা নেতা, বিপুল ঐশ্বর্যশালী, অবিনশ্বর, বারিবর্ষক, সত্য নিবন্ধন জ্ঞানসম্পন্ন, তরুণ, প্রভূত স্তুতিযুক্ত ও প্রচুর বর্ষণকারী।"

বিষ্ণুকেও অনেক সময় মরুৎগণের নেতা হিসাবে লক্ষ্য করা যায়। ঋগ্বেদের ষষ্ঠ মণ্ডলে তাই এঁদের বলা হয়েছে—'এভয়ো মরুৎ'। ইন্দ্রেরও তাঁরা সহযোগী।

বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীতে যাঁরা বিচার করতে চান তাঁরা মরুৎকে আগ্নেয়গিরি বলে ভাবতে চান। তাঁদের এ ধরনের চিন্তা এসেছে ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলের ২০নং সূক্তের ৪-৫নং শ্লোক থেকে। যেমন ঃ

"প্র ধন্বান্যৈরত শুভ্রখাদয়ো যদেজথ স্বভানবঃ ।।৪
অচ্যুতা চিদ্বো অজ্মন্না নানদতি পর্বতাসো বনস্পতিঃ।
ভূমির্যামেষু রেজতে ।।"৫

অর্থাৎ "হে সুন্দর আয়ুধ ও দীপ্তিযুক্তগণ! তোমরা যখন কম্পন সৃষ্টি কর তখন দ্বীপগুলি পতিত হয়। স্থাবর পদার্থ লাঞ্ছিত হয়। দ্যাবা পৃথিবী কম্পিত হয়। গতিশীল বারিরাশি প্রগত হয়। হে মরুৎগণ! তোমাদের গতিকালে অচ্যুত মেঘ ও বৃষাদি প্রচণ্ড শব্দ করে। পৃথিবী কাঁপতে থাকে।"

ঋগ্বেদে বায়ু অন্যতম এক গুরুত্বপূর্ণ দেবতা। নরাকৃতি নিয়ে তিনি ইন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত। তাঁর সাধারণ নাম বাত। 'বা'=বাজানো এই উৎস থেকে বাত্ শব্দ এসেছে। তিনি পর্জন্যের সঙ্গে যুক্ত। পর্জন্যের মধ্যে মানবভাব থাকলেও একটু কম আছে। বৃষ্টির মেঘের নাম পর্জন্য। তিনি দ্যৌ-এর সন্তান। দেবতা হিসেবে তাঁর যে খুব গুরুত্ব আছে তা নয়। ঋগ্বেদে তাঁর উদ্দেশ্যে গোটা তিনেক সূক্ত আছে। তবে ঝড়বৃষ্টি হিসেবে তার বর্ণনা বড় জীবন্ত। পৃথিবীকে বৃষ্টিপাত দ্বারা তিনি শস্যসমৃদ্ধ করে তোলেন। পশুজগৎও তাঁরই জন্য উর্বর হয়ে ওঠে। সেই জন্য তাঁকে 'দিব্যপিতা' নামেও আহবান করা হয়েছে।

বায়ুকে অধ্যাত্মবাদীরা যোগের প্রাণ-বায়ুর সঙ্গে সমার্থক করে দেখেন। বৈদিক যজ্ঞের অর্থ আত্মশুদ্ধি। এ জন্য বায়ুশুদ্ধিও করতে হয়। বায়ুশুদ্ধি করতে হয় সত্য জ্ঞান অর্জনের জন্য। সেইজন্য বাত্ বা বায়ু ঋগ্বেদে অন্যতম এক শ্রেষ্ঠ দেবতা হতে পেরেছেন। তাঁকে ইন্দ্রের সঙ্গে এক করে দেখানো হয়। সেইজন্য ঋগ্বেদের চতুর্থ মণ্ডলের ৪৭নং সূক্তের ১-২নং শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ

"বায়ো শুক্রো অয়ামি তে মধ্বো অগ্রং দিবিষ্টিযু।
আ যাহি সোম পীতায় স্পার্হো দেব নিযুত্বতা ।।১
ইন্দ্রশ্চ বায়বেষাং সোমানাং পীতিমর্হথঃ।
যুবাং হি যন্তীন্দবো নিম্নমাপো ন সধ্র্যক ।।"২

অর্থাৎ "হে বায়ু! আমি পবিত্র হয়ে স্বর্গলাভার্থে তোমার কাছে প্রথমে সোমরস এনেছি। হে দেব! তুমি আকাঙ্ক্ষার যোগ্য। তুমি সোমপানের জন্য নিযুক্ত অশ্বে আগমন কর। তোমরা সোমপান করার যোগ্য, কারণ জল যেমন নিম্নগামী তেমনই সোমরস তোমাদের দিকে ঊর্ধ্বগামী।"

এই সোমরস হল প্রাণবীর্য। বায়ু এই প্রাণবীর্যকে সাহায্য করে। ফলে

প্রাণায়ামের একটা ইঙ্গিত বায়ুর মধ্যে পাওয়া যায়। এই জন্যই ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলের ৯১নং সূক্তের ৪নং শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ

"শুচিং সোমং শুচিপা পাতমস্মে ইন্দ্রবায়ু সদতং বর্হিরেদম ।।"৪

অর্থাৎ "যে পর্যন্ত তোমাদের দেহে বেগ থাকে, যতক্ষণ বল থাকে, ততক্ষণ নেতৃগণ জ্ঞানবলে দীপ্যমান থাকেন। ততক্ষণ হে বিশুদ্ধ সোমপায়ী ইন্দ্র ও বায়ু! তোমরা আমাদের বিশুদ্ধ সোম পান কর। এই বর্হিতে এসে উপবেশন কর।"

এই ক্ষেত্রে ইন্দ্রের দুটি অশ্বের কথাও বলা যেতে পারে যারা ইন্দ্রকে যজ্ঞস্থলে নিয়ে আসে। এই দুটি অশ্বই হল প্রাণায়ামের প্রাণবায়ু ও অপানবায়ু। জাগ্রত প্রাণসত্তার দেবতাই হলেন বায়ু। ইন্দ্র হলেন জাগ্রত আত্মা—দিব্যসত্তা। আমাদের প্রাণশক্তিকে দিব্যসত্তার সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়াই যোগের মূল কথা।

ঋগ্বেদে দেবতা হিসেবে 'আপহ্'-এরও উল্লেখ আছে।। চার সূক্তে তাকে দিব্যশক্তি রূপে স্তুতি করা হয়েছে। এই দেবতা স্বর্গীয় দেবতা। দেবতাদের গৃহেই বাস। আকাশী জল অগ্নির একটি রূপের জননী। অপাম নপাৎ জলেরই সন্তান। তবে এই বারিধারা সমুদ্রমুখী বলে এই জল পার্থিব জলও। তারা তরুণ পত্নী, জননী বা গৃহদেবীও। এঁরা যজ্ঞে আগমন করেন ও যজ্ঞে এসে আশীর্বাদ জানান। তাঁরা শুধু যে মানুষের কলঙ্ক মোচন করেন তা নয় নৈতিক অপরাধও ক্ষমা করে দেন। তাঁরা নানা অসুবিধার প্রতিকার করেন ও মানুষকে নিরাময়, দীর্ঘজীবন ও অমরত্ব দান করেন। এই 'আপ' হল ব্যোম বা void। এর উপরেও একটি void আছে যাকে বলে supervoid। এই মহাশূন্যতায় মিলিয়ে যেতে পারলে সকলপ্রকার আশা-আকাঙ্ক্ষার ক্লেদ থেকে মুক্তি। এই জন্যই এই আপের শুদ্ধিকরণ ক্ষমতার কথা বলা হয়েছে।

ঋগ্বেদে মর্ত্যলোকের দেবতাদের মধ্যে নদনদীর নাম প্রথমে আছে। একটি ঋগ্বৈদিক সূক্তে সিন্ধুকে এইজন্য দেবী হিসেবে স্তুতি করা হয়েছে। অবশ্য সিন্ধু বলতে যে বিশেষ কোন নদী যেমন 'সিন্ধুনদ'কেই বুঝিয়েছে তা নয়। সিন্ধু অর্থ ঋগ্বেদে বৃহৎ জলাশয় বা সাগর। তবে দুএক ক্ষেত্রে 'সিন্ধু' শব্দ দ্বারা বিশেষ 'নদটি'কেই বোঝানো হয়েছে। সিন্ধুর অধ্যাত্ম গুরুত্ব কতখানি বোঝা দায়। তবে একেবারে যে অধ্যাত্মতা বর্জিত তা নয়। সেই কারণেই পরবর্তীকালে ভারতীয় অধ্যাত্মসঙ্গীতে 'ভবসিন্ধু' শব্দের বেশ প্রয়োগ হয়েছে।

বিপাশ (I) ও সুতুদ্রীকেও ঋগ্বেদের একটি সূক্তে দেবী হিসেবে বন্দনা করা হয়েছে। এরা পাঞ্জাবের নদী। কিন্তু ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের ৩৩নং সূক্তের ১-২নং শ্লোকে তাদের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তাতে ইন্দ্র কর্তৃক পরিচালিত হওয়ার জন্য তাদের অধ্যাত্মতার একটু ছোঁয়া নিশ্চয়ই লেগেছে। যেমন,

"প্র পর্বতানামুশতী উপস্থাদশ্বে ইব বিষিতে হাস মানে।
গাবেব শুভ্রে মাতরা রিহাণে বিপাট্ছুতুদ্রী পরসা জবেতে ।।১

ইন্দ্রেষিতে প্রসবং ভিক্ষমাণে অচ্ছা সমুদ্রং রথ্যেব যাথঃ।
সমারাণে ঊর্মিভিঃ পিন্বমানে অন্যা বামন্যামপ্যেতি শুভ্রে ॥"২

অর্থাৎ "জলপ্রবাহবতী বিপাশ ও সুতুদ্রী নদীদ্বয় পর্বতের উত্তুঙ্গ প্রদেশ থেকে সাগর সঙ্গমং অভিলাষিনী হয়ে মন্থরগতিমুক্ত ঘোটকীদ্বয়ের মত স্পর্ধাভরে গোদ্বয়ের মত শোভমানা হয়ে, বৎস্য লেহনাভিলাসিনী গাভীদ্বয়ের মত বেগে ধাবমান হচ্ছে। হে নদীদ্বয়। ইন্দ্র তোমাদের প্রেরণ করেছেন। তোমরা তাঁর প্রার্থনা রক্ষা করে দুটি রথীর মত সমুদ্র অভিমুখে যাচ্ছ। তোমরা একযোগে প্রবাহিত হয়ে পরস্পর কাছাকাছি গিয়ে শোভা পাচ্ছ। উপরোক্ত শ্লোকে ইড়া ও পিঙ্গলা দিয়ে প্রাণ ও আপন বায়ু প্রবাহিত হওয়ার ও সুষুম্নাতে তাদের কাছাকাছি আসার কথা মনে করা খুব কষ্টসাধ্য নয়। এরকম মনে হতে পারত না যদি না ইন্দ্রের আত্মসত্তামূলক পরিচয় আগে লক্ষ্য করতাম। এখানে সহস্রারের কূটস্থানস্থ singularity-ই সিন্ধু হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। তাছাড়া সিন্ধুর সুষোমা নামও এই প্রসঙ্গে লক্ষ্যণীয়। সুষুম্না নাড়ি—যেখানে দেহের সব নাড়ি মিলিত হয়ে মহাসমুদ্রে যাত্রা করে সেই সুষুম্না নাড়িও সুষোমা হতে পারে।

ঋগ্বেদে সুদাসের একটা মৌলিক তাৎপর্য আছে। 'সু' অর্থাৎ ভাল দিকেরই তিনি প্রতীক। ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের ৩৩নং সূক্তে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, সুদাস ভারত ভূখণ্ডের সমতল প্রান্তরে বিপাশ ও সুতুদ্রী অতিক্রম করেই ঢুকেছিলেন। সেই ক্ষেত্রে ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়িতে প্রাণ ও অপান বায়ুর খেলা এতে থাকতে পারে। কারণ পরবর্তী তন্ত্রে দেখা যাচ্ছে এই দুটি নাড়িকে গঙ্গা ও যমুনা নামে উল্লেখ করা হচ্ছে। যেমন—

"গঙ্গা যমুনয়োর্মধ্যে মৎস্যৌ দ্বৌ চরতঃ সদা।
তৌ মৎসৌ ভক্ষয়েদ যস্তু স ভবেন্মৎস্য সাধক ॥"

অর্থাৎ "গঙ্গা ও যমুনার মধ্যে দুটি মৎস্য চরে বেড়ায়। এই গঙ্গা ও যমুনা হল ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ি। প্রাণ ও অপান বায়ুর মধ্য দিয়ে রজঃ ও তমঃরূপী দুটি গুণ এর মধ্য দিয়ে চলাফেরা করে। যে সাধক এই দুটি মৎস্য ভক্ষণ করতে পারেন তিনি মৎস্যাশী। এই দুটি রিপুকে হনন করা গেলে সত্যের আলো দেখা যায়। বস্তুতঃ কুম্ভক হলেই অপরিচ্ছিন্নের জ্ঞান জন্মে। সুতরাং বিপাশ ও সুতুদ্রীর যে সে রকম কোন ভূমিকা নেই তা বলা যায় না। কারণ 'সরস্বতী নদী' (ঋগ্বেদের আর একটি নদী) সম্পর্কে সে রকম ইঙ্গিত অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবেই পাওয়া গেছে।

ঋগ্বেদে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ নদী হল সরস্বতী। সরস্বতী যে যথার্থই একটি নদী, শুধু তাই নয়, এর একটি সূক্ষ্ম অধ্যাত্ম তাৎপর্যও আছে। সরস্বতীই সুষুম্না নাড়ি। সুষুম্না নাড়ি হল জ্ঞানতরঙ্গিণী। সূক্ষ্মদেহের সপ্তচক্রের মধ্য দিয়ে এই নদী প্রবহমানা। অনেকে অবশ্য একে আকাশের নদী বা ছায়াপথ হিসেবে ধরতে চেয়েছেন। তবে আন্তরক্ষেত্রে তিনি হলেন সত্য-প্রবাহিনী। মহাবৈশ্বিক নদী হিসেবেও বোধ হয় ঋগ্বেদে সে উচ্চতর মর্যাদা

লাভ করেছে। বেদের জ্ঞানকাণ্ড এই জন্যই নদীতীরে করতে হয়। তার মানে জাগ্রত চক্রের পাশে বসে।

সরস্বতীর এই ধরনের অধ্যাত্ম গুরুত্ব আছে বলেই ঋগ্বেদের ৬ষ্ঠ মণ্ডলের ৬১নং সূক্তের ৮, ৯, ১১ ও ১২নং শ্লোকে নানাভাবে তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে। যেমন,

"যস্য অনন্তো অহ্রুতস্ত্বেষশ্চরিষ্ণুরর্ণবঃ। অমশ্চরতি রোরুবৎ ॥৮
সা নো বিশ্বা অতি দ্বিষঃ স্বসৃরন্যা ঋতাবরী। অতন্নহেব সূর্যঃ ॥৯
আপপ্রুষী পার্থিবান্যুরু রজো অন্তরিক্ষম্। সরস্বতী নিদস্পাতু ॥১১
ত্রিষধস্থা সপ্তধাতুঃ পঞ্চ জাতা বর্ধয়ন্তী। বাজেবাজে হব্যাভূৎ ॥"১২

অর্থাৎ "যার অপরিমিত, অকুটিল, দীপ্ত, অপ্রতিহতগতি ও জলবর্ষী বেগ প্রচণ্ড শব্দে বিচরণ করে।"৮

"নিয়ত ভ্রমণকারী সূর্য যেমন দিন আনেন, তেমনই সেই সরস্বতী যেন আমাদের সকল শত্রুকে পরাজিত করেন এবং নিজে অন্যান্য ভগ্নীকে আমাদের কাছে নিয়ে আসেন।"৯

"পৃথিবী ও স্বর্গের বিস্তীর্ণ প্রদেশগুলিকে যিনি নিজের দীপ্তি দ্বারা পূর্ণ করেছেন সেই সরস্বতী দেবী যেম নিন্দুকদের থেকে আমাদের রক্ষা করেন।"১১ "ত্রিলোকব্যাপিনী, সপ্ত অবয়বা পঞ্চশ্রেণীর সমৃদ্ধিকারিণী সরস্বতী দেবী যেন প্রতিযুদ্ধে লোকের আহ্বানযোগ্যা হন।"১২

সরস্বতীকে যে সপ্ত অবয়বা বলা হয়েছে তা চেতনার সাতটি স্তর ছাড়া আর কিছুই নয়: প্রত্যেকটি স্তরে তিনি ত্রিধা বিভক্ত ত্রিলোকব্যাপিনী। এ হল প্রত্যেকটি স্তরে যে তিনটি অবস্থা আছে ধ্বনাত্মক, নঙর্থক ও নিরপেক্ষ তা হল ইড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়িতে প্রবাহিত বায়ুর ক্রিয়া বিশেষ। পঞ্চশ্রেণীর সমৃদ্ধিকারিণী বলে যে শব্দ ব্যবহার করা হচ্ছে তা হল পঞ্চেন্দ্রিয়। এই ইঙ্গিতটি বুঝলেই ঋগ্বেদে নদীর গুরুত্ব বোঝা যায়। অন্যান্য ঋগ্বেদীয় সূক্ত—যেখানে সরস্বতীর উল্লেখ আছে সেই সূক্তগুলিও যদি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করা যায় তবে তার মধ্য থেকেও অতীন্দ্রিয়তার গন্ধ খুঁজে পাওয়া খুব একটা কষ্টকর ব্যাপার হবে না, অবশ্য এ-জন্য যোগ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন।

ঋগ্বেদে পৃথিবীর উল্লেখের পাশাপাশি দস্যুদেরও উল্লেখ এসেছে। পৃথিবীকে ব্যক্তিরূপ দেওয়া হলেও ভৌগোলিক স্থূলতার গন্ধ তার গায় লেগে রয়েছে। কিন্তু ভূগোলের যে-গন্ধই পৃথ্বী বা পৃথিবীর গায় পাওয়া যাক না কেন অধ্যাত্মবাদীরা এর মধ্যেও অধ্যাত্মতার গন্ধ খুঁজে পান। বেদের বিশ্ব সম্পর্কে যে ধারণা, তার সবটাই বহিরাবয়বের ব্যাপার নয়। ঋগ্বেদীয় ঋষিরা ত্রিস্তরীয় যে বিশ্বের কল্পনা করেছিলেন—তার একটা ইঙ্গিতার্থও আছে। পৃথিবী এখানে স্থূল দেহ। অন্তরীক্ষলোক হল প্রাণশক্তি বা শ্বাস। স্বর্গ হল মন। এই অন্তরীক্ষলোকেই শুভ ও অশুভ শক্তির লড়াই হয়। এর বাইরেই স্বর্গীয় সলিল—অর্থাৎ পরমাত্মা। এর সঙ্গেই রয়েছে সূর্যের দীপ্তি

সৌর জগৎ বা স্বর, অর্থাৎ যা নাকি তূরীয় স্তর বা অতিক্রান্তিক চতুর্থ স্তর। এই চতুর্থ স্তরই হল জ্যোতিপূর্ণ স্বর্গ, যেখানে দিব্যশক্তির বাস। এই চতুর্থ স্তরকে অবিচ্ছিন্ন হিসেবে ঋগ্বেদে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে অন্যান্য স্তরগুলিও যে বিচ্ছিন্ন তা নয়। বস্তুতঃ সব স্তরই একটি অবিচ্ছিন্ন সত্তাতে যুক্ত হয়ে আছে। একেই আধুনিক বিজ্ঞানে singularity বলা হয়েছে। বিজ্ঞানের মতে singularity এমন এক জিনিস যেখানে অসীম ঘনত্বের জন্য দেশও ধারণাতীতভাবে বক্র হয়ে আছে। আপেক্ষিকতার অংকও সেখানে কাজ করে না।[১৭]

পৃথিবী যে ঈশ্বরের স্থূলতার প্রতীক এবং স্বর্গও যে শেষ কথা নয় ঋগ্বেদে একথাও বলা হয়েছে। ঋগ্বেদেই 'পৃথিবী', 'স্বর্গ' এসব শব্দের যথার্থ তাৎপর্য প্রকাশ পেয়েছে। ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ৩৬নং সূক্তের ৮নং শ্লোকে তাই বলা হয়েছে ঃ

"ঘ্নন্তো বৃত্রমতরন্রোদসী অপ উরু ক্ষয়ার চক্রিরে।
ভুবৎকণ্বে বৃষা দ্যুম্ন্যাহুতঃ ক্রন্দদশ্বো গবিষ্টিষু ॥"৮

অর্থাৎ "দেবগণ প্রহার করে বৃত্রকে (কুলকুণ্ডলিনী) হত্যা করেছেন। উভয় জগৎ ও অন্তরীক্ষ নিবাসার্থে বিস্তৃত করেছেন। অগ্নি (তেজ) ধনবান্; তিনি গো (আলো, জ্যোতি) জয়ের জন্য যুদ্ধে শব্দায়মান অশ্বের ন্যায় সর্বোতভাবে আহূত হয়ে কণ্বকে অভীষ্ট দ্রব্য বর্ষণ করুন।" শ্লোকটির যথার্থ অর্থ এই ঃ বিঘ্ন দূর করে তাঁরা স্বর্গ ও মর্ত্যে গেলেন (অপরিচ্ছিন্নের দুটি স্তর)। অসীমকে তাঁদের বাসস্থান করলেন। এই ভাব লক্ষ্য করলে পৃথিবীকে ঋগ্বেদে স্থূল পৃথিবী অর্থে ধরলে ভুল করা হবে। তবে যারা স্থূলতার মধ্যে ঋগ্বেদকে ধরে রাখতে চান তাঁরা কিছু কিছু বক্তব্য নিশ্চয়ই দাঁড় করাতে পারেন। তবে ঋগ্বেদের বহু শব্দের রহস্যময় ইঙ্গিত স্থূলতা দিয়ে তাঁরা কখনই ধরতে পারবেন না। তখনই অনেকটা হেঁয়ালী বলে বোধ হবে। তবে মনে রাখতে হবে যে, ঋগ্বেদের ভাষা যে স্থূলতা ঘেঁষা তার কারণ—সেকালে নৈর্ব্যক্তিক ভাব বহনকারী শব্দের সৃষ্টি হয়নি। সেই জন্য ভাষার মধ্যে একটা বাস্তবের ছবি ফুটে উঠেছে—অর্থাৎ সমালোচকদের ভাষায় imagistic অবস্থা ফুটে উঠেছে। সেই জন্যই এই ভাষা যে কোন image বহন করে তা নয়।

মর্ত্যলোকের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দেবতা নিশ্চয়ই অগ্নি। ইন্দ্রের পর অন্য কোন দেবতা যদি ঋগ্বেদে বেশি স্তুতি পেয়ে থাকেন, তবে তিনি অগ্নি। ঋগ্বেদের প্রায় এক পঞ্চমাংশ-সূক্ত তাঁর উদ্দেশেই নিবেদিত। সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হয় যজ্ঞের অগ্নি হিসেবেই অগ্নি এই মর্যাদা পেয়েছেন। অগ্নি সাধারণ

১৭ Singularity : "A point of infinite density where space is infinitely curved and the equations of general relativity break down." Masters of Time, John Boslough, glossary. p. 232.

অর্থে আগুন মাত্র, ল্যাটিন ignis-এর মত। অগ্নির দেহের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তাতে মনে হয় যজ্ঞের অগ্নির বিভিন্ন অবস্থার কথাই সেখানে বলা হয়েছে। ঘৃত যে অগ্নির খুব প্রিয় তা বোঝাতে গিয়ে—ঘৃতমুখ, ঘৃতকেশ ইত্যাদি রূপে তাঁর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। তাঁর দাঁত, চোয়াল জিব ইত্যাদির যা বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা দ্বারা অগ্নির দাহ্যমান অবস্থাই প্রকাশ পায়। অগ্নি অপূর্ব রথে বাহিত হয়। দুটি অশ্ব তাকে টানে। রথে তিনি অশ্ব জুতেন দেবতাদের যজ্ঞস্থলে আনার জন্য। তিনিই হলেন যজ্ঞের রথচালক।

এই যাজ্ঞিক ভূমিকা ছাড়া অগ্নি সম্পর্কে ঋগ্বেদে আর খুব বেশি একটা কিছু বলা হয়নি। এ ছাড়া যা নিয়ে চিন্তা করা হয়েছে তা তাঁর নানা জগৎ, আকৃতি, আবাস প্রভৃতি। অগ্নিকে সাধারণতঃ দ্যৌ ও পৃথিবীর সন্তান বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কখনও কখনও ত্বষ্টা ও জলের সন্তান বলা হয়েছে। অরণি কাষ্ঠ থেকে জন্ম ফলে দুটি শুষ্ক কাষ্ঠকেও তার জনক-জননী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁকে শক্তিপুত্রও বলা হয়েছে, কারণ অগ্নি প্রজ্বলনের জন্য শক্তি প্রয়োগ করা প্রয়োজন হত। বলা হয়েছে প্রত্যুষে তার ঘুম ভাঙে অর্থাৎ প্রত্যুষে অগ্নি প্রজ্বলিত করা হয়। অগ্নিকে দেবতাদের মধ্যে কনিষ্ঠতম বলা হয়েছে। আবার এক দিক থেকে তিনি জ্যেষ্ঠও, কারণ তিনি প্রথম যজ্ঞ পরিচালনা করেন।

অগ্নি যে শুধু মর্ত্যের কেউ তা নয়। অনেক সময় ব্যোমমার্গীয় সলিলজাত হয়ে মর্ত্যে আনীত হয়েছেন। তাঁর তিন ধরনের চরিত্রের কথা বলা হয়েছে। অগ্নির এই তিন অবস্থা পরবর্তী ঋগ্বেদে সূর্য, বায়ু ও অগ্নির ত্রয়ী হিসাবে কাজ করেছে। এর সঙ্গে বিশ্বের তিনটি স্তরেরই সম্পর্ক রয়েছে। সূর্য, ইন্দ্র ও অগ্নির সম্পর্ক ঋগ্বৈদিক না হলেও প্রাচীন। হয়তো পরবর্তীকালে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ত্রয়ীর কল্পনাও এই অগ্নির তিন অবস্থাজাত। অগ্নির এই তিন অবস্থা যজ্ঞাগ্নির ত্রিধা বিভক্তি থেকেও আসতে পারে।

নানা ভাবে অগ্নির উৎপত্তি বলে অগ্নির বহু জন্ম, এমন ভাবা হয়েছে। এই জন্য তাঁর যেমন নানা রূপ তেমনই নানা নামও, তাঁরই মধ্যে অন্য সকল দেবতা ধৃত এমন কল্পনা করা হয়েছে, যেমন চক্রের ঘেরের মধ্যে চক্রদণ্ডগুলি থাকে। তবে নানাভাবে ছড়িয়ে থাকলেও মূলতঃ তাঁকে 'এক' বলে বলা হয়েছে। অগ্নির এই বহুরূপের মধ্যে একক সত্তার কথা মনে রেখেই বেদে বহু দেবতার সবাই সেই 'এক'-এরই নানারূপ এমন ভাবনা আসতে পারে।

মানুষের জীবনে নিত্য প্রয়োজনীয় হিসাবে অগ্নি তাঁদের সঙ্গে নিকট সম্পর্কে যুক্ত। তাঁকে চিন্তা করা হয়েছে অমর হিসেবে—যিনি মানুষের গৃহে অতিথি হিসেবে বা গৃহদেবতা হিসেবে স্থান পেয়েছেন। যজ্ঞ পরিচালক ও দেবতা-আহবায়ক হিসাবে অগ্নিকে দূত হিসেবেও বর্ণনা করা হয়েছে যিনি স্বর্গ ও মর্ত্য সর্বত্র ঘুরে বেড়ান। তাঁকে পুরোহিতও বলা হয়েছে। বলা হয়েছে ঋত্বিজ ও বিপ্র। প্রধান পুরোহিত হিসেবে বলা হয়েছে হোতৃ, ইন্দ্র যেমন শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা অগ্নিও তেমনই আর্যদের প্রধান পুরোহিত। অগ্নি

পূজারীদের কাছে কল্যাণপ্রদ, কারণ, তিনি তাঁদের শত্রু নিধন করেন। তার মুখ্য অবদান গৃহের মঙ্গল ও সার্বিক উন্নতি।

অগ্নিকে ভূতপ্রেত বিতাড়ক হিসেবেও কল্পনা করা হয়েছে। হয়তো প্রাচীন কালে অশুভ শক্তি বিতাড়নের জন্য আগুনের ব্যবহার থেকেই এমনতর ধারণা এসেছে।

অগ্নি যে শুধুমাত্র অগ্নি নয়—এর একটা দূরবগাহ ইঙ্গিত আছে পরবর্তী-কালে শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ-এ। সেখানে এ কথা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। যাঁরা ঋগ্বেদে অধ্যাত্ম সত্য খুঁজে পান তাঁরা এইজন্য একে শুধুমাত্র সাধারণ অর্থে অগ্নি বলে ধরতে রাজি নন। অগ্নি তাঁদের মতে অধ্যাত্ম মানস—বস্তুসত্তা থেকেই যার উদ্ভব। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ-এ এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ

"স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিম্।
ধ্যাননির্ম্মথনাভ্যাসাদ্দেবং পশ্যেন্নিগূঢ়বৎ।।"১৪

অর্থাৎ "যাহারা স্ব-শরীরকে অরণি (অগ্নিধ্যান কাষ্ঠ) ও ওঙ্কারকে উত্তরারণি (ঘর্ষণকাষ্ঠ) করে ব্রহ্ম চিন্তনরূপ ঘর্ষণ করেন তাঁরা জ্ঞানচক্ষু দ্বারা নিগূঢ় ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করতে সমর্থ হন।"

যোগের যেটা বাইরের যজ্ঞানুষ্ঠান আন্তরক্ষেত্রে তাই যোগ। বাইরের আগুন ভেতরের আগুনেরই বহিঃপ্রকাশ, যে আগুনের দিব্যচেতনায় অহংতত্ত্ব পুড়ে ছাই হয়ে যায়। যদি কেউ লক্ষ্য করেন, তবে বেদের অগ্নিসূক্তে জ্ঞানযোগের সূত্র খুঁজে পাবেন। অগ্নি যেমন জ্ঞানযোগের প্রতীক, ঋগ্বেদে ইন্দ্র তেমনই প্রাণযোগ—এবং সোম হলেন ভক্তিমার্গ বা ভক্তিযোগের প্রতীক।

অগ্নি যে মানস অগ্নি, মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার শিখা, মনঃসংযোগ ও জাগ্রতাবস্থা, ঋগ্বেদের সূক্তেও তেমন ইঙ্গিত আছে। যেমন ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলের ৪৪নং সূক্তের ১৫নং শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ

"অগ্নির্জাগার তমৃচঃ কাময়ন্তেঽগ্নির্জাগার তমু সামানি যন্তি।
অগ্নির্জাগার তময়ং সোম আহ তবাহমস্মি সখ্যে ন্যোকাঃ।।"৫

অর্থাৎ "অগ্নি সর্বদা বিনিদ্র থাকেন। ঋক্ সকল তাঁকে কামনা করে। অগ্নি সর্বদা বিনিদ্র থাকেন ও সামগানগুলি তাঁকে প্রাপ্ত হয়। অগ্নি সর্বদা বিনিদ্র থাকেন এবং সোম তাঁকে এই কথা বলে ঃ হে দেব! আমি যেন সবর্দা তোমার সহবাসে থাকি।" এর যথার্থ অর্থ—"যিনি জাগ্রত থাকেন, ঋক্গুলি তাকেই ভালবাসে। যিনি জাগ্রত থাকেন—তাঁর কাছেই ময়মিয়া সঙ্গীতগুলি আগমন করে। যিনি জাগ্রত থাকেন সোম তাকেই বলেন "তোমার বন্ধুত্বের মধ্যেই আমার বাস। অগ্নি জাগ্রত থাকেন, ঋক্গুলি তাকেই ভালবাসে। অগ্নি জাগ্রত থাকেন মরমিয়া সঙ্গীতগুলি তাঁর কাছেই আসে। অগ্নি জাগ্রত থাকেন, সোম তাঁকে বলেন—'তোমার বন্ধুত্বের মধ্যেই আমার বাস'।"

পরবর্তী কালের দেহতাত্ত্বিক গানের মতই এগুলি রহস্যময়। যেমন ("কোথায় পাব তারে, আমার মনের মানুষ যে রে। হারায়ে সেই মানুষে দেশ বিদেশে খুঁজে বেড়াই অন্ধকারে।") আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে কোন প্রেমিকা

বোধহয় তার মনের মানুষকে হারিয়ে উন্মাদ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বস্তুতঃ সবাই জানেন যে, ব্যাপারটা তা নয়, যেমন 'একটা কলসীর নয়টা ছিদ্র কমনে রাখি জল।' এই কলসী যেমন মাটির কলসী নয়। তেমনই ঋগ্বেদের অগ্নিও সাধারণ অগ্নি নন। এ হল যথার্থই মানস-অগ্নি, জ্ঞানাগ্নি।

ঋগ্বৈদিক অগ্নি হলেন কুণ্ডলিনী। তাঁর শিখা হল মূলাধারের শিখা। সোম হল ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ অমৃত। পরবর্তীকালে তন্ত্রে যাকে বলা হয়েছে ঃ

"সোমধারা ক্ষরেদ যাতু ব্রহ্মরন্ধ্রাদ্ বরাননে।
পিত্বানন্দময় স্তাং যঃ স-এব মদ্যসাধক ॥"

অর্থাৎ "মদ হল ব্রহ্মরন্ধ্র থেকে যে অমৃত ঝরে সেই অমৃত।"

সূর্য ঋগ্বেদে চিৎসত্তা আত্মন। ইন্দ্র হলেন জাগ্রত প্রাণশক্তি। এই প্রাণ-শক্তিই যোগে যোগীকে সাহায্য করে। এই অগ্নি বা কুণ্ডলিনী থেকেই দেবী কালিকার জন্ম বলে মুণ্ডকোপনিষদের প্রথম মুণ্ডকের দ্বিতীয় খণ্ডের ৪নং শ্লোকে উল্লেখ আছে। যেমন,

"কালী করালী চ মনোজবা চ সুলোহিতা যা চ সুধূম্রবর্ণা।
স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী চ দেবী লেলায়মানা ইতি সপ্তজিহ্বাঃ ॥"

অর্থাৎ "কালী, করালী, মনোজবা (মনের ন্যায় বেগবতী) সুলোহিতা, স্ফুলিঙ্গিনী, এবং দীপ্তিশালিনী বিশ্বরুচী (সর্বসৌন্দর্যশালিনী) অগ্নির এই বিচাল্যমান সপ্তজিহ্বা।" কালী ও কুণ্ডলিনী কিন্তু সমার্থবোধক। ঋগ্বেদেও এই জিহ্বাগুলির উল্লেখ আছে এবং তাঁরা মহিলাত্মক। তবে এঁদের নাম দেওয়া হয়নি। কালী হলেন অগ্নির অন্ধকার দিক, নীলবর্ণের দেবী অগ্নির নীলাভ দীপ্তি থেকে এসেছেন। অগ্নিকে স্বাহা (সর্বাঙ্গে প্রণিপাত করি) ও স্বধা (অর্থাৎ স্বয়ং-জাতা) শব্দ দ্বারাও স্তুতি করা হয়। অগ্নির যাজ্ঞিক রূপ মুণ্ডমালা ও হস্তধৃত দণ্ড দ্বারা সূচিত হয়। এক্ষেত্রে তিনি বেদের শ্রেষ্ঠতম যজ্ঞ হিসেবে স্বীকৃতা। একেই বলে আত্ম-যজ্ঞ। এই যজ্ঞ করেই অহং-তত্ত্বকে বলি দেওয়া হয়। কালীর উপাসনা এই জন্যই মূলতঃ যজ্ঞোপাসনা। যজ্ঞের মহিলাত্মক দিক। বেদেই তার ইঙ্গিত সুস্পষ্টভাবে দেওয়া আছে।

অগ্নি-উপাসনা প্রাচীন কালের সকল ধর্মেই ছিল—যেমন গ্রীক, রোমান, কেল্ট, জার্মান, পার্শী, ইহুদী, ব্যাবিলনীয়ান, মিশরীয়, চৈনিক, আমেরিকান ইণ্ডিয়ান—সকলের মধ্যে। প্রত্যেক প্রাচীন ধর্মের দেবতার নামে অগ্নি উৎসর্গের ব্যাপার ছিল। দেবতারা ছিলেন বিশ্বজাগতিক কোন অর্থের দ্যোতক। অগ্নি বস্তুর মধ্যে লুক্কায়িত থাকে। সেই জন্য তাকে দিয়ে দিব্য জগতের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা হত। অন্তর্জগতের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমও ছিল অগ্নি। এই জন্যই প্রাচীন সব সংস্কৃতিতেই পবিত্র অগ্নিবেদীর ব্যবস্থা ছিল। আর্য সংস্কৃতির মেরুদণ্ড যদি বলা যায় অগ্নিকে তাহলে প্রাচীন সব সংস্কৃতিকেই আর্য সংস্কৃতি বলে মানতে হবে। (আর্য শব্দের অর্থ যদি 'মহান' হয়ে থাকে) তবে অন্যান্য প্রাচীন সংস্কৃতিকেও আর্য বললে ক্ষতি নেই।

স্থূল পৃথিবীতে যা অগ্নি, স্বর্গে তাই সূর্য। মর্ত্যে সেই স্বর্গীয় অগ্নিরই অবতরণ ঘটেছে।

ঋগ্বেদে ইন্দ্র অর্থ প্রভু। অগ্নি জ্ঞান, সোম সানন্দ সত্তা। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে বায়ু হল প্রাণশক্তি, অগ্নি পিত্ত ও সোম কফতুল্য। ইন্দ্র, অগ্নি, সোম প্রাণের এই তিনটি নির্ভেজাল রূপই হল প্রাণ, তেজ ও ওজ।

ঋগ্বেদে সোমযজ্ঞ অগ্নি উপাসনার পাশাপাশি আর একটি বিরল ভূমিকা নিয়ে আছে। সাধারণ অর্থে কোন উদ্ভিদের রসকে ব্যক্তিরূপ আরোপ করে পূজা করা হচ্ছে। সোম প্রকৃত পক্ষে তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঋগ্বৈদিক দেবতা। সোমরস তৈরি করার পদ্ধতির উপরও সূক্ত রচনা করা হয়েছে। যে সকল জিনিস এই সোমপেষণে ব্যবহার করা হত তারাও দেবত্বের মর্যাদা লাভ করেছে।

সোমলতা উদ্ভিদ-জগতের প্রভু হিসেবে বন্দিত হয়েছে। তাকে 'অরণ্যের প্রভু' এই অভিধাও দেওয়া হয়েছে। সোমলতা বা উদ্ভিদ পর্বতশৃঙ্গে উৎপন্ন হয় এমন বলা হযেছে। পর্বতশৃঙ্গ মস্তিষ্কের ব্রহ্মরন্ধ্রও হতে পারে। তবে এর উত্তেজক শক্তি ইন্দ্রের সঙ্গেই বেশি যুক্ত। দৈত্যদের সঙ্গে সংগ্রামে এই সোমরসই মূল শক্তি জুগিয়েছে। এই জন্য সোমকে দিব্যপানীয় হিসেবে দেখা হয়েছে। বলা হয়েছে সোমরস অমরত্ব দান করে। এই জন্য তার নাম অমৃত। বলা হয়েছে যাঁরা সোমসাধনা করেন তাঁরা চিরজ্যোতির্ময় অক্ষয় গৌরবের জগতে যমের সঙ্গে বাস করেন। সোমকে নিরাময়ক্ষমতাও দেওযা হয়েছে। এই সোমরস পানে রুগ্ন ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করে, অন্ধ দৃষ্টিশক্তি লাভ করে। পঙ্গু চলতে পারে।

ঋগ্বেদের পরবর্তী কিছু কিছু সূক্তে সোমকে চন্দ্রের সঙ্গে এক করে দেখানো হয়েছে। অথর্ব বেদ ও যজুর্বেদে এই চন্দ্রাত্মক সোমের কথা অত্যন্ত স্পষ্ট। ব্রাহ্মণ শাস্ত্রে দেখা যায় পিতৃপুরুষ ও দেবতারা চন্দ্রের সুধা পান করেন বলে তার ক্ষয় হয় এ কথা বলা হয়েছে। একটি উপনিষদে সোমকে সোমরাজ বলে বর্ণনা করা হয়েছে, দেবতারা যাকে পান করেন। বেদোত্তর সাহিত্যে দেখা যায় চন্দ্রকে সোম বলেই ডাকা হচ্ছে। সাধারণ দৃষ্টিতে মনে হয সোমকে ঋগ্বেদে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হত বলেও স্বর্গীয় চন্দ্রের সঙ্গে তাকে এক করে দেখানো হয়েছে। ঋগ্বৈদিক ঋষিদের কবি-ভাবও এজন্য দায়ী। সোম সম্পর্কে বলা হয়েছে তাঁর বাস জলে। সোমকে অনেক সময় ইন্দু বা ফোঁটা হিসেবেও বর্ণনা করা হয়েছে।

ইন্দো-ইরাণীয় পর্যায়েও আর্যদের মধ্যে সোম-এর বিশেষ গুরুত্ব ছিল। ঋগ্বেদের সোমের সঙ্গে অবেস্ত-এর 'হওম'[১৮]-এর অনেক মিল রয়েছে।

কিন্তু বাস্তববুদ্ধিজাত এই সব ব্যাখ্যা দ্বারা সোমের যথার্থ চরিত্র ধরা

---

১৮ **H**-এর পেছনে ভাওয়েল থাকলে ভারতে **H-'S'** রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন—
Ha = Sa. Haom = Som.

পড়েছে বলে মনে হয় না। আসলে সোমের যথার্থ গুরুত্ব রয়েছে যোগের অনুভূতির মধ্যে। সোমকে যথার্থ সমাধির আনন্দ বলা হয়েছে যোগে। সোমের এই গুরুত্বের কথা ঋগ্বেদের ৬ষ্ঠ মণ্ডলের ৪৪নং সূক্তের ২২-২৩নং শ্লোকে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। বলা হয়েছে ঃ

"অয়ং দেবঃ সহসা জায়মান ইন্দ্রেন যুজা পণিমস্তভায়ৎ।
অয়ং স্বস্য পিতুরায়ুধানীন্দুরমুষ্ণাদশিবস্য মায়াঃ ।।২২
অয়মকৃণোদুষমঃ সুপত্নীরয়ং সূর্যে অদধাজ্জ্যোতিরন্তঃ।
অয়ং ত্রিধাতু দিবি রোচনেষু ত্রিতেষু বিন্দদমৃতং নিগূড়্হম্ ।।"২৩

অর্থাৎ "দীপ্তিমান এই সোম মিত্রভূত ইন্দ্রের সঙ্গে জন্ম গ্রহণ করে বলপূর্বক পণিকে স্তব করেছিল। এই সোম উষা সকলের পতির ন্যায় সূর্যকে শোভা সম্পন্ন করেছেন। এ সোম সূর্যমণ্ডলে দীপ্তি সংস্থাপন করেছেন। এ সোম দীপ্যমান ত্রিভুবনের মধ্যে স্বর্গে গূঢ়ভাবে অবস্থিত ত্রিবিধ অমৃত লাভ করেছে।" যথার্থ অর্থ কিন্তু এই ধরনের ঃ সোম উষাকে যথার্থ স্বামী সকল দান করেছেন। সূর্যে তিনি আলো সংস্থাপন করেছেন। স্বর্গের দীপ্যমান অঞ্চলে তিনি ত্রিবিধ চরিত্র সংস্থাপন করেছেন। তৃতীয়টিতে অমরত্ব লুকিয়ে ছিল। সোম স্বর্গ ও মর্ত্যকে ধরে রেখেছেন ; তিনি এতে এমন রথ যোজনা করেছেন যার সাতটি রশ্মি আছে।"

এই যে সপ্তরশ্মিসম্পন্ন রথ—তাই হল সাতটি চক্র (পদ্ম) সহ সূক্ষ্মদেহ। ঊর্ধ্ব ত্রিবিধ চরিত্র হল সৎ+চিৎ+আনন্দ=সচ্চিদানন্দ। যোগের যে অনুষ্ঠান-রথ তা হল প্রকৃতপক্ষে আন্তরযোগ মাত্র।

ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলের ৪৪নং সূক্তের ১৫নং শ্লোকে সোমের যৌগিক চরিত্র আরো স্পষ্ট। এখানে বলা হয়েছে ঃ

"অগ্নির্জাগার তমৃচঃ কাময়ন্তেঽগ্নির্জাগার তমু সামানি যন্তি।
অগ্নির্জাগার তময়ং সোম আহ তবাহমস্মি সখ্যে ন্যোকাঃ।।"২৫

অর্থাৎ "যিনি জাগ্রত, ঋক্‌সকল তাকেই কামনা করে। যিনি জাগ্রত মরমিয়া সঙ্গীত তাঁর কাছেই আসে। যিনি জাগ্রত সোম তাঁকে বলেন 'তোমার বন্ধুত্বের মধ্যেই আমার স্থিতি। অগ্নি জাগ্রত, তাই ঋক্‌সমূহ তাকে কামনা করে। অগ্নি জাগ্রত তাই তাঁর কাছে মরমিয়া সঙ্গীত আগমন করে। অগ্নি জাগ্রত তাই সোম তাকে বলেন 'আমার গৃহ তোমার বন্ধুত্বের মধ্যে।'" আসলে এর দ্বারা যা বোঝায় তা হল—'সোম হল আন্তর-অমৃত-আনন্দ—যা নাকি মস্তিষ্কের ব্রহ্মরন্ধ্র থেকে ক্ষরিত হয় এবং মনকে জ্ঞানদীপ্ত করে।

ঋগ্বেদের নবম মণ্ডলের ৬৮নং সূক্তের ৭নং শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ

"ত্বাং মৃজন্তি দশ যোষণঃ সুতং সোম ঋষিভির্মতিভির্ধীতিভির্হিতম্।
অব্যো বারেভিরুতে দেবহূতিভির্নৃভির্যতো বাজমা দর্ষি সাতয়ে।।"৭

অর্থাৎ "হে সোম! দশটি কুমারী (দুহস্তের দশটি আঙ্গুল) মিলিত হয়ে তোমাকে মেষলোমের উপর শোধন করছে। তুমি নিষ্পীড়নের সাহায্যে ঋষিদের দ্বারা উৎপাদিত হয়েছ। শোধনকালে তোমার উদ্দেশে নানাধরনের

স্তব পাঠ করা হচ্ছে। তুমি পাত্রে পাত্রে সংস্থাপিত হয়েছ। যারা দেবতাদের নাম করে তুমি তাদের অন্ন বিতরণ কর।" (এই দশটি কুমারী হল পঞ্চ জ্ঞান ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়—যারা নাকি পরিশুদ্ধ হয়েছে। মেষলোম এখানে পরিশুদ্ধতার প্রতীক, অর্থাৎ নির্ভেজাল চিৎশক্তি।") এই পরিশুদ্ধিকরণ যে হৃদয় ও মনের পরিশুদ্ধিকরণ ঋগ্বেদের নবম মণ্ডলের ৭৩নং সূক্তের ৮নং শ্লোকে তার উল্লেখ আছে।

"ঋতস্য গোপা ন দভায় সুক্রতুস্ত্রী ষ পবিত্রা হৃদ্যং তরা দধে।

বিদ্বান্ত্স বিশ্বা ভুবনাভি পশ্যত্যবাজুষ্টান্বিধ্যাতি কর্তে অব্রতান॥"৮

অর্থাৎ "সত্যের ও সৎ ইচ্ছার রক্ষাকর্তাকে প্রতারণা করা চলে না। হৃদয়ের মধ্যে তিনি তিনটি পরিস্রাবী স্থাপন করেছেন। সেই সর্বজ্ঞ সবই জানেন। যারা অবাঞ্ছিত, অনুষ্ঠান রীতি মানেন না তাদের তিনি গহ্বরে নিক্ষেপ করেন।" এই যে পরিস্রবণের কথা বলা হয়েছে তা (হৃদয়ের শুদ্ধিকরণ যা তিনটি অবস্থার মধ্য দিয়ে হয়—যেমন জাগ্রত, স্বপ্ন ও নিবিড় নিদ্রার অবস্থার মধ্য দিয়ে।) পাশ্চাত্য জগতের বিভক্তি অনুযায়ী এ হল মনের চেতন, অবচেতন ও অচেতন অবস্থা।

দেবতাদের এই মরমিয়া ভাবের জন্যই বহু বিচিত্র হয়েও ঋগ্বেদের সকল দেবতার মধ্যে একটা ঐক্য রয়েছে। বেদের দেবতাদের ইতিহাস একটু অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করলে আমরা এর মধ্যে যেমন বহুদেববাদের গন্ধ পাব, সর্বেশ্বরবাদের স্বাদ পাব তেমনই অদ্বৈতবাদও এর মধ্যে অনুপস্থিত থাকবে না। দিব্য সত্তাকে বৈদিক ঋষিরা 'এক' বলেই ভাবতেন। সেই একেরই মধ্যে বহুর প্রকাশ গুণ হিসেবে। ইন্দ্র যেমন প্রভু (ইন্দ্রিয়ের প্রভু) অগ্নি তেমনই জ্ঞান ও সোম আনন্দ। বৈদিক দেবতারা সত্যের প্রকাশক মাত্র। যাঁরা তাঁদের আরাধনা করতেন তাঁদের মনে কখনও দেবতাদের মধ্যে ভেদকরণের প্রবণতা ছিল না। ফলে যে-কোন দেবতাই সর্বোত্তম হতে পারতেন। কখনও কখনও তাঁদের মধ্যে মানবিক রূপ ও চরিত্রও দেখা দিয়েছে। ঋষিরাও দেবতাতে পরিণত হয়েছেন। যাঁর সত্য জ্ঞান হয়েছে সত্যের সঙ্গে তিনি তো একাত্মই। বৈদিক সংস্কৃতি এই জন্য মূলতঃ আধ্যাত্মিক।

সোম-এর দুটি দিক থাকা সম্ভব ছিল। প্রথমত সোম হল স্নায়ুনিঃসৃত রস যে রস যোগের দ্বারা যোগীরা অর্জন করেন। বর্তমানে দেখা যায় যোগ-ব্যায়ামে দেহস্নায়ুগুলি সক্রিয় হয়ে উঠলে রোগমুক্তি ঘটে। যোগীদের যে দেহের দীপ্তি লক্ষ্য করা যায় তা এই দেহতন্ত্রীরস নিঃসৃত হবার জন্যই। যদি বাইরের কোন সোম উদ্ভিদ থেকেও থাকত তবু তা একক ছিল না। আরও অনেক কিছুর সঙ্গে তাকে মিশিয়ে হয়তো উত্তেজক দাওয়াই তৈরি করা হত বর্তমানে যেমন L. S. D ব্যবহার করা হয় তেমনই। L. S. D অনেক সময় অতীন্দ্রিয় অনুভূতি দান করে বলে বিশ্বাস রয়েছে। এই জন্য অতীন্দ্রিয় জগতের যাঁরা সন্ধান করেন পশ্চিমে তাঁদের অনেকেই L. S. D ব্যবহার করেন। আমাদের দেশেও সাধকেরা গঞ্জিকা সেবন করেন। বিশ্বাস, গঞ্জিকা

চিত্তবৃত্তিকে বিশেষ একটি কেন্দ্রে নিয়ে আসতে সাহায্য করে। কিন্তু যোগে যাঁরা দেহের তেজকে অর্থাৎ কুলকুণ্ডলিনীকে ব্রহ্মরন্ধ্রের কাছাকাছি নিয়ে আসতে পারেন তাঁরা এমনিতেই অদ্ভুত ধরনের প্রশান্তি লাভ করেন। সেই প্রশান্তি জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধতার মত। সেই জন্য এই রসকে 'সোম' বা চন্দ্র নাম দেওয়া হয়েছে।) সেই স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না প্লাবিত দেশ যোগীদের মরমিয়া অভিজ্ঞতার মধ্যে রয়েছে বলে বাস্তব পৃথিবীভুক্ত সাধারণ মানুষের কাছে এই সোম দুর্বোধ্য। কিন্তু ব্রহ্মরন্ধ্রের এই স্নিগ্ধ পর্যায় যে অমৃততুল্য সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সেই যৌগিক সোমের স্বাদ নিশ্চয়ই ঋগ্বেদের ঋষিরাও জানতেন। তাই ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৮৫নং সূক্তের ৪নং শ্লোকে পাই ঃ

"আচ্ছদ্বিধানৈগুপিতো বার্হতৈঃ সোম রক্ষিতঃ।
গ্রাবৃণামিচ্ছৃণ্বন্তিষ্ঠসি ন তে অশ্নাতি পার্থিবঃ ॥"৪

অর্থাৎ "হে সোম! স্তুতিকারকগণ গোপন করার ব্যবস্থা করে তোমাকে গোপন রাখেন। তুমি পাষাণের শব্দ শুনতে থাক। পৃথিবীর কেউই তোমাকে পান করতে পায় না।" এই সোমকে যে পার্থিব মানুষ লাভ করতে পারে না এ ধরনের বক্তব্য থেকে এটাই স্পষ্ট যে সোম যথার্থই ব্রহ্মরন্ধ্র ক্ষরিত ধাতু তন্ত্রে যার স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে ঃ

"সোমধারা ক্ষরেদ্ যাতু ব্রহ্মরন্ধ্রাদ্ বরাননে।
পিত্বানন্দময় স্তাং যঃ স-এব মদ্যসাধকঃ ॥"

সোমের এই অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার জন্য ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলের ৪৮নং সূক্তের ৩নং শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ

"অপামসোমমমৃতা অভূমাগন্ম জ্যোতিরবিদাম দেবান্।
কিং নূনমস্মান্ কৃণবদরাতিঃ কিমু ধূর্তিরমৃত মর্ত্যস্য ॥"৩

অর্থাৎ "হে অমৃত সোম। আমরা তোমাকে পান করে অমর হব। পরে দীপ্ত স্বর্গে গমন করব এবং দেবতাদের জানব। শত্রু আমাদের কি করবে? আমি মানুষ, হিংসাকরী, আমার কি করবে?" এখানে শত্রু হল ইন্দ্রিয়। মানুষ হিংসাকারী অর্থ ইন্দ্রিয়পরায়ণ মানুষ হিংসাকারী। নরবৃত্তিনাশ।

ঋগ্বেদের যুগে ভাষা যদিও রূপকল্পময় ছিল, তবু ভাষার মধ্যে ঋষিরা নৈর্ব্যক্তিক দ্যোতনাও এনেছিলেন। এই নৈর্ব্যক্তিক ভাব থেকে কিছু কিছু নৈর্ব্যক্তিক দেবতারও জন্ম হয়েছিল। প্রথম দিকে নৈর্ব্যক্তিক শব্দ রূপকল্পময় দেবতাদের গুণাত্মক হিসেবে ব্যবহৃত হত। শেষ পর্যন্ত এই গুণবাচক শব্দগুলি নৈর্ব্যক্তিক দেবতাও সৃষ্টি করে ফেলে। 'তৃ', 'তর', 'তার' প্রভৃতি প্রয়োগেই নৈর্ব্যক্তিক দেবতাদের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। যেমন ধাতৃ বা প্রজনক। প্রজাপতি, ইন্দ্র, বিশ্বকর্মণ প্রভৃতির গুণবাচক হিসেবে এর প্রয়োগ হলেও পরে ধাতৃ নিজেই স্রষ্টা ও পালনকর্তার নাম-ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়—যেমন (বিধাতৃ =বিধানকর্তা, ধাত্রী=পালনকর্তা, ত্রাতৃ=ত্রাণকারক, নেতৃ=নেতা ইত্যাদি)। এ ধরনের শব্দ দিয়ে ঋগ্বেদে যে-দেবতার নাম বেশি দেওয়া হয়েছে তার নাম ত্বষ্টৃ=রূপকার। তবে এর নামে কোন সূক্ত উৎসর্গীকৃত হয়নি। জীবের রূপ-

দান তিনিই করেন। সোমেরও তিনি রক্ষক। বিশ্ববৎ-এর স্ত্রী সরণ্যুর তিনি পিতা। যম ও যমীর মাতা। কিভাবে যে এর উদ্ভব হয়েছে, অজ্ঞাত। হয়তো প্রথম দিকে সূর্যের কর্মতৎপরতা হিসেবে দেখা দিয়েছিলেন। ফলে সৃজনশীল প্রতিভা রূপে প্রকাশ পান এবং স্বর্গীয় কারিগর হিসেবে দেখা দেন। 'ত্বস্তৃ' সবিতৃ বা সূর্যকে কর্মে প্রেরণাদায়ক বলে মনে করা হত। তিনিই ইন্দ্রের বজ্র তৈরি করে দিয়েছিলেন বলে বিশ্বাস। দেবতাদের পানপাত্র তাঁরই তৈরি।

এমন অনেক নৈর্ব্যক্তিক দেবতাও দেখা যায় যাঁরা কোন না কোন প্রাচীন দেবতার গুণবাচক শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হতেন। ঋগ্বেদে এমন দেবতা খুব একটি নেই। এলেও ঋগ্বেদের পরের পর্যায়ে এসেছেন। এঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হলেন প্রজাপতি। প্রজাপতি অর্থ জীবের প্রভু। আদিতে তিনি ছিলেন সবিতৃ ও সোমের গুণাত্মক শব্দ। ঋগ্বেদের শেষ মণ্ডলে স্পষ্ট একটি স্বতন্ত্র দেবতা হিসেবে দেখা দেন। তবে অথর্ববেদ ও শুক্ল যজুর্বেদে তাঁকে প্রায়ই দেখা যায়। ব্রাহ্মণ সাহিত্যে তাঁর গুরুত্ব এমন বেড়ে যায় যে, একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেবতা হিসেবে দেখা দেন। সূত্র সাহিত্যে তাঁকে ব্রহ্মার সঙ্গে এক করে দেখানো হয়।

প্রজাপতিকে নিয়ে পরবর্তীকালে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে গল্পকথাই তৈরি হয়ে গেছে। অবশ্য এই গল্পের অন্তরালে একটি জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক প্রতীক কাজ করেছে। গল্পটি এই ধরনের ঃ

"প্রজাপতি (বৃষপ্রভু) নিজের কন্যার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করলেন। কারো করো মতে এই কন্যা আকাশ, কারো মতে উষা। উষা ছিলেন হরিণীর আকারে। প্রজাপতি তাঁকে হরিণ হয়ে অনুসরণ করলেন। দেবতারা দেখলেন এ পর্যন্ত যা হয়নি প্রজাপতি তাই করতে যাচ্ছেন। তাঁরা এমন একজনকে খুঁজতে লাগলেন যিনি প্রজাপতিকে শাস্তি দেবেন। কিন্তু কাউকে পাওয়া গেল না। ফলে তাঁরা তাঁদের সকলের ভয়ঙ্কর দিকগুলিকে এক করে একটি সত্তা তৈরি করলেন। তার নাম রুদ্র। দেবতারা প্রজাপতিকে বললেন—'এ-পর্যন্ত যা হয়নি—প্রজাপতি তাই করছেন। সুতরাং তাঁকে ভেদ করুন। রুদ্র তাঁকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করলেন। তীরবিদ্ধ হয়ে প্রজাপতি ঊর্ধ্বে উঠলেন। দেবতারা তাকে বললেন মৃগ। মৃগভেদকারী দেবতাকে বলা হল মৃগব্যাধ। হরিণীকে রোহিণী। ত্রিমুখ শর হল কালপুরুষের তিনটি নক্ষত্র। জ্যোতির্বিদ্যায় বৃষরাশির শেষের দিকে নক্ষত্রসমূহই রোহিণী। মৃগব্যাধ নক্ষত্র হল রুদ্র। এই কাহিনীটিই পরবর্তীকালে দক্ষযজ্ঞ কাহিনীর উৎস হিসাবে কাজ করেছে।

ভারতীয় সাহিত্যে শুধু জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক বক্তব্যই যে গল্প হিসেবে স্থান পেয়েছে তা নয়। অনেক সময় বৈজ্ঞানিক সত্যও রূপকের আড়ালে প্রকাশ পেয়েছে। পুরাণ সাহিত্যের মৎস্যপুরাণে গল্প আছে—'ব্রহ্মা নিজের পবিত্র দেহ থেকে একটি মহিলা সৃষ্টি করলেন যার নাম শতরূপা, সাবিত্রী, সরস্বতী, গায়ত্রী, ব্রাহ্মণী ইত্যাদি। সেই মহিলাকে দেখে ব্রহ্মা কামমোহিত হলেন।

মনে মনে ভাবতে লাগলেন—কী অপূর্ব সুন্দরী! তাঁর দৃষ্টি থেকে সরে শতরূপা ডান দিকে গেলেন। ব্রহ্মা যখন তাঁকে আবার দেখবার চেষ্টা করলেন। তখন তাঁর কাঁধ থেকে আর একটি মাথা বের হল। ব্রহ্মার কামমোহিত দৃষ্টি এড়াবার জন্য শতরূপা কখনও বাঁয়ে কখনও পেছনে লুকোলেন। তাঁকে দেখতে গিয়ে ব্রহ্মার আরো দুটি মস্তিষ্ক গজালো। ফলে শতরূপা আকাশে উঠে গেলেন। সেখানে তাঁকে দেখার জন্য ব্রহ্মার পঞ্চম মুণ্ড গজালো। ব্রহ্মা কন্যাকে বললেন, এস আমরা জীবজগৎ সৃষ্টি করি—মানুষ, সুর, অসুর সব। এ কথা শুনে শতরূপা নেমে এলেন। তারা নির্জন স্থানে গিয়ে বসবাস করলেন। বাস করলেন একহাজার দিব্যবৎসর।

এই গল্পের মধ্যে বাস্তববাদীরা কামের গল্প পাবেন। কিন্তু যথার্থ অর্থে এটি একটি বৈজ্ঞানিক সত্য। ব্রহ্মার চতুর্দিকে ব্রাহ্মণীর এই নৃত্য প্রকৃতপক্ষে একটি অণুর প্রোটনের পাশে ইলেকট্রনের নৃত্য।

মৎস্যপুরাণই কিন্তু এ ধরনের গল্পের তাৎপর্যের কথা বলে দিয়েছে। বলেছে, "পুরাণ কাহিনীর এই ধরনের গল্প সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা মানুষের মনে আসতেই পারে। মানুষ জানে না যে, তাঁদের সূক্ষ্ম আণবিক দেহ আছে। নানাভাবে তা থেকে সন্তানের জন্ম হয়। আদিতে যখন সৃষ্টি হয়েছিল তখন রজগুণের প্রাধান্য ছিল। তখন দিব্যরূপ অস্তিত্ব ধরেছিল ভিন্নভাবে: এই গুহ্য তত্ত্ব বোঝা মানুষের পক্ষে বেশ কষ্টকর।" সৃষ্টির এই কাহিনী বুঝতে গেলে আদিতে সৃষ্টির ধ্বনাত্মক ও নঙর্থক অবস্থার একত্র অবস্থানের স্বরূপ জানতে হবে। বিজ্ঞানীরা এক্ষেত্রে যতটুকু বোঝেন সাধারণ মানুষ তা বুঝতে পারেন না। তবে বিজ্ঞানীরাও কোন ঘটনার সূক্ষ্ম অবস্থার মধ্যে দৈবী কোন বিষয় খুঁজে পেতে আগ্রহী নন বলেই বহু প্রাচীন অধ্যাত্ম কাহিনীই অবিশ্বাস্য হিসেবে আজ প্রতীয়মান। এই জন্যই মানুষ ধর্ম সম্পর্কে অবজ্ঞা করতে শিখেছেন। তবে আনন্দের কথা এই যে, অধুনা কোয়াণ্টাম পদার্থ বিজ্ঞানের যুগে বিজ্ঞানীরা তাঁদের অতি আধুনিক তত্ত্বসমূহের মধ্যে প্রাচীন কাহিনীর অনেক সাদৃশ্য খুঁজে পেয়ে সেদিকে আবার নতুন করে তাকাবার চেষ্টা করছেন।

এই প্রজাপতির একটা অধ্যাত্ম তাৎপর্যও আছে। সৃষ্টির উৎস হিসেবে প্রজাপতি নিজেই যজ্ঞতুল্য। নামের সার্থকতার জন্যই প্রজাপতির বিনাশ প্রয়োজন। ইন্দ্র ও রুদ্র সেই কাজই করেছেন। সেইজন্য যজ্ঞের যজ্ঞ প্রয়োজন এই বোধ থেকে ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ১৬৪নং সূক্তের ৫০নং শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ

"যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাস্তানি ধর্মাণি প্রথমান্যাসন্।
তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত যত্র পূর্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ ॥"

অর্থাৎ "দেবতারা যজ্ঞ দ্বারা যজ্ঞ করেছেন। কারণ এটাই প্রথম ধর্ম। সেই মাহাত্ম্য আকাশের সেই স্থানে একত্রিত হয়ে আছে যেখানে দেবতারা পূর্ব থেকেই বিরাজমান রয়েছেন।" এ হল ব্রহ্মনের আত্মত্যাগের কাহিনী যা থেকে জগৎ উদ্ভূত হয়েছে।

ঋগ্বেদের শেষ মণ্ডলে সর্বস্রষ্টা বিশ্বকর্মণকে লক্ষ্য করা যায়। এখানে তিনি স্বতন্ত্র দেবতা হিসাবে আবির্ভূত। ব্রাহ্মণ সাহিত্যে এই বিশ্বকর্মণ

কিন্তু প্রজাপতির সমার্থক। কিন্তু বেদোত্তর সাহিত্যে বিশ্বকর্মা হিসাবে স্বর্গীয় কারিগর রূপে প্রতীয়মান। সেখানে তিনি ঋগ্বেদের 'ত্বস্তৃ'র সমার্থক। ঋগ্বেদে বিশ্বকর্মাও অনেকটাই স্বয়ম্ভু। তাই ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৮১নং সূক্তের ৫নং শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ

"যা তে ধামানি পরমাণি যাবমা যা মধ্যমা বিশ্বকর্মন্নুতেমা।
শিক্ষা সখিভ্যো হবিষি স্বধাবঃ স্বয়ং যজস্ব তন্বং বৃধানঃ ॥"

অর্থাৎ "হে বিশ্বকর্মা ! হে যজ্ঞভাগ গ্রহণকারী, তোমার যে সকল উত্তম, মধ্যম ও নিম্নবর্তী ধাম আছে যজ্ঞের সময় সেগুলি আমাদের বলে দাও। তুমি নিজে নিজে যজ্ঞ করে নিজের শরীর পুষ্ট কর।"

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৮২নং সূক্তের ২নং শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ

"বিশ্বকর্মা বিমনা আদ্বিহায়া ধাতা বিধাতা পরমোত সন্দৃক্।
তেষামিষ্টানি সমিষা মদন্তি যত্রা সপ্তঋষীন্ পর একমাহুঃ ॥"

অর্থাৎ "যিনি বিশ্বকর্মা তাঁর মন বৃহৎ। তিনি নিজে বৃহৎ। তিনি নির্মাণ করেন, ধারণ করেন। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ও সকল লোক অবলোকন করেন। সপ্তঋষির (সপ্ততলের) পরবর্তী যে স্থান আছে সেখানে তিনি একাকী আছেন।" উপরোক্ত শ্লোক থেকে বিশ্বকর্মণের গুরুত্বের মাত্রা আরও একটু বেশি বলে মনে হয় না?

এক সময় ঋগ্বেদে হিরণ্যগর্ভকে সর্বোচ্চ দেবতার মর্যাদা নিয়ে উদ্ভাসিত হতে দেখা যায়। যজুর্বেদে তাঁকে প্রজাপতির সঙ্গে এক করে দেখানো হয়েছে। পরবর্তী সাহিত্যে ব্রহ্মার উপাধি হিসাবেই আমরা তাঁকে পাই। ঋগ্বেদের পরবর্তী এক সূক্তে দেখা যায় একটি অজ্ঞাতনামা দেবতার উল্লেখ করা হয়েছে 'ক'=কোন্ এই শব্দটি উল্লেখ করে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১২১নং সূক্তের ১নং শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ

"হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূবস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।
স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥"১

অর্থাৎ "সর্বপ্রথম কেবল হিরণ্যগর্ভই বিদ্যমান ছিলেন। তিনি জন্ম মাত্রই সর্বভূতের অদ্বিতীয় ঈশ্বর হলেন। তিনি এই পৃথিবী ও আকাশকে স্ব-স্বস্থানে স্থাপিত করলেন। কোন্ দেবতাকে হব্যদ্বারা পূজা করব?" পরবর্তীকালে এই 'ক' অক্ষরটিই একটি দেবতার নাম হিসাবে পূজিত হয়। কস্মৈ-এর 'ক'।

নৈর্ব্যক্তিক ভাবব্যঞ্জক আর এক ঋগ্বৈদিক দেবতার নাম বৃহস্পতি। তাঁরই দ্বিতীয় সত্তা হিসেবে প্রায়শই ব্রহ্মণস্পতির উল্লেখ পাই। কারো মতে ব্রহ্মণস্পতি ব্রহ্মের ব্যক্তিরূপ। তবে যজ্ঞাগ্নির একটি পরোক্ষ রূপও হতে পারেন তিনি। ইন্দ্রের সঙ্গী হিসেবে বৃহস্পতিকে দেখা যাচ্ছে দস্যু বলের কাছ থেকে গোধন মুক্ত করছেন। তবে তার প্রধান চরিত্র পুরোহিত হিসেবেই বেশি প্রকটিত। ব্রহ্ম-পুরোহিত হিসেবে তিনি ব্রহ্মারই একটি নমুনা মাত্র। বেদোত্তর পুরাণকাহিনীতে তিনি দেবগুরু ও বৃহস্পতি গ্রহের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছেন। তবে বৃহস্পতির মধ্যে যে একটা মরমিয়া ভাব আছে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৬৭নং সূক্তের ৩নং শ্লোকে তা স্পষ্ট বলা হয়েছে ঃ

"হংসৈরিব সখিভির্বাবদদ্ভিরশ্মন্ময়ানি নহনা ব্যস্যন।
বৃহস্পতিরভিকনিক্রদদ্গা উত প্রাস্তৌদুচ্চ বিদ্বাঁ অগায়ৎ।।"

অর্থাৎ "বৃহস্পতির সহায়গণ হংসের মত কোলাহল করতে লাগলেন। তাদের সাহায্যে তিনি প্রস্তরময় দুয়ার খুলে দিলেন। অভ্যন্তরে রুদ্ধ গাভীগণ চিৎকার করে উঠল। তিনি উৎকৃষ্ট স্তব ও উচ্চরবে গান করে উঠলেন।" এখানে যে কথাটি বলবার চেষ্টা করা হয়েছে তা হল 'ওঁ'-এর উৎপত্তি। তা যদি হয় তাহলে বৃহস্পতি ব্রহ্মের সমার্থক হয়ে দাঁড়ান। এখানকার শব্দ ও আলো হচ্ছে **Big Bang**-এর শব্দ ও **Blackhole**-এর বিস্ফোরণ জাত আলো। এই বিস্ফোরণের ধ্বনিই 'ওঁ' শব্দ। এ থেকেই দীর্ঘদিন পরে আলো প্রকাশ পেয়েছিল। তাও প্রায় কয়েক লক্ষ বছর পরে।

কিছু কিছু নৈর্ব্যক্তিক ভাবব্যঞ্জক শব্দ ঋগ্বেদে দেবতার রূপ পেয়েছে। যেমন, (মন্যু (ক্রোধ), শ্রদ্ধা (বিশ্বাস), অনুমতি (করুণা) ইত্যাদি। অরমতি (ভক্তি), সূনৃতা (বদান্যতা), অসুনীতি (সূক্ষ্মজীবন), নিঋৃতি (রোগ)) প্রভৃতিও দেবতার মর্যাদা লাভ করেছে।

পরবর্তী বেদে এই নৈর্ব্যক্তিক ভাবব্যঞ্জক শব্দের দেবতা হিসেবে অনেক দেবতার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়—যেমন কাম (অথর্ববেদেই প্রথম শব্দটির উৎপত্তি হয়), কাল, (স্কম্ভ (নির্ভর), প্রাণ (শ্বাস), শ্রী (সৌন্দর্যের ব্যক্তিরূপ) ইত্যাদি।)

একেবারে নির্ভেজাল নৈর্ব্যক্তিক দেবতার মধ্যে ঋগ্বেদের অদিতিই প্রথম উল্লেখযোগ্য। অদিতিই হলেন বর্তমান বৈজ্ঞানিক চিন্তার **Singularity,** তিনি আদিত্যদের জননী। তবে পুরাণ কাহিনীতে গিয়ে এই মাতাই অনেক সময় তাঁর পুত্রদের অপেক্ষাও বয়সে ছোট হিসেবে দেখা দিয়েছেন। তবে রূপ দিয়ে তাঁকে পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে যে ভাবেই ধরার চেষ্টা হোক না কেন ঋগ্বেদে তাঁর মধ্যে অসীমের দ্যোতনা অত্যন্ত স্পষ্ট। ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ৮৯নং সূক্তের ১০নং শ্লোকে তাই বলা হয়েছে ঃ

"অদিতি র্দ্যৌরদিতিরন্তরিক্ষমদিতি র্মাতা স পিতা স পুত্রঃ।
বিশ্বে দেবা অদিতিঃ পঞ্চজনা অদিতি র্জাতমদিতি র্জনিত্বম।।"

অর্থাৎ "অদিতি আকাশ, অদিতি অন্তরীক্ষ, অদিতি মাতা, তিনি পিতা, পুত্র, সকল দেবতা, পঞ্চলোক, জন্ম ও জন্মের কারণ।" এ যেন শূন্যতা জাত সব কিছুই মূলতঃ শূন্য একথাই বোঝাচ্ছে। অদ্বৈতবাদের ইঙ্গিত এখানে স্পষ্ট।

দিতির কথা ঋগ্বেদে মাত্র তিনবার ব্যবহার করা হয়েছে, সম্ভবত অদিতির বিপরীত দিককে বোঝানোর জন্যই। পরবর্তী বেদে অবশ্য বহুবার তাঁর কথা আছে। অথর্ববেদে দিতির পুত্রদেরই দৈত্য বলা হয়েছে। তবে অদিতির দ্যোতনা অনুযায়ী দিতিও তার থেকেই জাত। দিতি স্থূলতার প্রতীক।

ঋগ্বেদে সাধারণ দৃষ্টিতে দেখতে গেলে দেবীরা তেমন বিরাট ভূমিকা পালন করেন নি। যেমন উষা, সরস্বতী, প্রভৃতি। তবে এঁদের যদি অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে দেখা যায় তাহলে স্বীকার করতেই হবে যে, ঋগ্বৈদিক অধ্যাত্মতার মেরুদণ্ড হিসেবে কাজ করেছেন তাঁরা। এঁদের কথা আগেই বলেছি।

তবে অন্যান্য দেবীর মধ্যে অসীমের অংশ হিসেবে তাঁদের দেখানো হলেও কিছুটা স্থূলতার ভাব সেখানে ফুটে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে পৃথিবী, রাত্রি, অরণ্যানী, বাক্, পুরন্ধি ধিষণা, রাকা, সিনিবালী, কুহু এদের কথা বলা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে ইলাকে নিয়ে একটু ভাবা যেতে পারে। যজ্ঞে দুগ্ধ ও ঘৃত যা আহুতি হিসেবে দেওয়া হত, ইলাকে তারই ব্যক্তিরূপ হিসেবে অনেকে মনে করেন। কারো মতে ইলা স্থানদ্যোতক। আবার যোগ মতে ইলা ও ইড়া একই জিনিস। ইলার সঙ্গে মাহী ও ভারতী নামে আরও দুটি দেবীর উল্লেখ আছে। ঋগ্বৈদিক আর্যদের প্রত্যেকটি শব্দের মধ্যেই একটি রহস্যময় ভাব আছেই। সেই দিক থেকে ভাবতে গেলে প্রত্যেকটি শব্দকেই মহান ভাবে উদ্ভাসিত দেখা যাবে। তবে কোথাও কোথাও স্থূলতা নিশ্চয়ই ছিল। ইদানিং বিজ্ঞান তো প্রমাণ করে দিয়েছে যে নিষ্প্রাণ কোন জিনিসই নয়। উদ্ভিদের মধ্যেও অতীন্দ্রিয় শক্তি আছে। প্রকৃতির বিভিন্ন রূপের মধ্যেও রয়েছে প্রাণ ও মনের স্পন্দন। সেদিক থেকে সব কিছুই 'দেব' অভিধাতে স্তুতিযোগ্য হবার কথা।

ঋগ্বেদে বৃহৎ দেবতাদের সহধর্মিণী হিসেবে কোন দেবীর তেমন মর্যাদা ছিল না।

ঋগ্বেদে কিছু কিছু দেবতা যুগ্মভাবে উপস্থিত হয়েছেন। যেমন 'মিত্র-বরুণ', 'দ্যাবা-পৃথিবী'।

আবার কিছু কিছু দেবতা আছেন যাঁরা দল বেঁধে উপস্থিত। যেমন, মরুৎগণ, রুদ্রগণ, আদিত্যগণ। ব্যক্তিনাম বাদ দিয়েও কিছুসংখ্যক দেবতা আছেন যেমন বসুগণ, 'বিশ্বেদেবা' প্রভৃতি। ঋগ্বেদের ৮ম মণ্ডলের ৮৩নং সূক্তের ৭নং শ্লোকে তাঁদের চরিত্র অত্যন্ত সুন্দর ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

"অধি ন ইন্দ্রৈষাং বিষ্ণো সজাত্যানাম্। ইতা মরুতো অশ্বিনা॥"

অর্থাৎ "হে ইন্দ্র। হে বিষ্ণু! হে মরুৎগণ! হে অশ্বিদ্বয়! এক জাতীয়গণের মধ্যে আমাদের কাছে এস।" এখানে সব দেবতা বিশ্বেদেবা-তে পরিণত হচ্ছে।

উচ্চমাত্রার দেবতা বাদেও ঋগ্বেদে কিছু কম গুরুত্বপূর্ণ দেবতার উল্লেখ আছে। এঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হলেন ঋভুরা। এঁরা হলেন এক-ধরনের দক্ষ কারিগর। তাঁদের পাঁচ ধরনের সুদক্ষ কাজের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখ করার মত—ত্বষ্টার বাটী জাতীয় পাত্র থেকে চারটি উজ্জ্বল পানপাত্র তৈরি করা। কেউ কেউ মনে করেন এই বাটি ও পেয়ালা হল চন্দ্রের চারটি অবস্থা—বা বছরের চারটি ঋতু। ঋভুরা তাদের পিতামাতার যৌবন ফিরিয়ে দিয়েছিলেন বলেও বলা হয়েছে। হয়তো এই পিতা মাতা বলতে দ্যাবা-পৃথিবীকে বোঝানো হয়েছে। সূর্যের গৃহে ঋভুরা ১২ দিন বিশ্রাম নিয়েছিলেন। হয়তো এটা সূর্যের দক্ষিণ অয়নান্ত বা মকরক্রান্তিতে অতিরিক্ত বার দিন ঢুকে যাওয়ার কোন ব্যাপার। এর ফলে ৩৫৪ দিনের চান্দ্র বৎসর ৩৬৬ দিনের সৌর বছরের সমপর্যায়ে আসতে পারে। দেখা যাচ্ছে এই ঋভুরা মরণশীল ছিলেন। কিন্তু তাঁদের দক্ষতাবলে অমরত্ব অর্জন করেন। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১১০ নং সূক্তের ৪নং শ্লোকে তাই বলা হয়েছে ঃ

"বিষ্ট্বী শমী তরণিত্বেন বাঘতো মর্তাসঃ সন্তো অমৃতত্বমানশুঃ।
সৌধন্বনা ঋভবঃ সূরচক্ষসঃ সম্বৎসরে সমপৃচ্যন্ত ধীতিভিঃ।।"

অর্থাৎ "তাঁরা শীঘ্র কর্ম করেছেন বলে এবং ঋত্বিকদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন বলে মানুষ হয়েও অমরত্ব লাভ করেছিলেন। তখন সুধন্বার পুত্র ঋভুগণ সূর্যের মত দীপ্যমান হয়ে সংবাৎসরিক হব্য গ্রহণ করার যোগ্য হলেন।"

ঋভুদের দেখা যায় কিছু জাদু ক্ষমতা রয়েছে যেন। কারণ তাঁরা, এমন এক রথ তৈরি করেছিলেন যা তিনলোকব্যাপী প্রসারিত ছিল। ঋগ্বেদের চতুর্থ মণ্ডলের ৩৬নং সূক্তের ১-২নং শ্লোকে তাই বলা হয়েছে ঃ

"অনশ্বো জাতো অনভীশুরুক্থ্যো রথস্ত্রিচক্র পরিবর্ততে রজঃ।
মহত্তদ্বো দেজস্য প্রবাচনং দ্যামৃভবঃ পৃথিবীং যচ্ছ পুষ্যথ।।১
রথং যে চক্রুঃ সুবৃতং সুচেতসোহবিহ্বরন্তং মনসস্পরি ধ্যয়া।
তাঁ উ ন্বস্য সবনস্য পীতয় আ বো বাজা ঋভবো বেদয়ামসি।।"২

অর্থাৎ "হে ঋভুগণ! তোমাদের দ্বারা নির্মিত ত্রিচক্র রথ অশ্ব ও প্রগ্রহ ছাড়াই অন্তরীক্ষে ভ্রমণ করছে। যা দিয়ে তোমরা দ্যাবা-পৃথিবী পোষণ করছ সেই রথ নির্মাণরূপ মহৎ কর্ম তোমাদের দেবতা রূপে খ্যাত করেছে। হে সুন্দর অন্তঃকরণসম্পন্ন ঋভুগণ! তোমরা মানসিক ধ্যানদ্বারা সুবৃত অকুটিলগামী রথ নির্মাণ করেছিলে। হে রাজগণ! হে ঋভুগণ! আমরা তোমাদের সোমপানের জন্য আবেদন জানাচ্ছি।"

ঋভুদের যে এই ক্ষমতা তা কিন্তু সাধারণ ক্ষমতা নয়—জাদু ক্ষমতা। ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের ৬০নং সূক্তের ১-২নং শ্লোকে সেই রকমই বলা হয়েছে, বলা হয়েছে ঃ

"ইহেহ বো মনসা বন্ধুতা নর উশিজো জগ্মুরভি তানি বেদসা।
যাভি র্মায়াভিঃ প্রতিজূতিবর্পসঃ সৌধন্বনা যজ্ঞিয়ং ভাগমানশ।।
যাভিঃ শচীভিশ্চমসাঁ অপিংশত যয়া ধিয়া গামরিণীত চর্মণঃ।
যেন হরী মনসা নিরতক্ষত তেন দেবত্বমৃভবঃ সমানশ।।"

অর্থাৎ "হে রিভুগণ! তোমাদের কর্মের কথা সকলেই জানে। হে মনুষ্যগণ! তোমরা সুধন্বার পুত্র। তোমরা যে সকল কর্মদ্বারা শত্রুপরাভবের তেজবিশিষ্ট হয়ে যজ্ঞের ভাগ প্রাপ্ত হয়েছ যজ্ঞভাগ কামনা কালে যেসব কর্ম তোমরা জানতে পেরেছিলে। হে রিভুগণ! তোমরা যে শক্তি দ্বারা চমসকে বিভক্ত করেছিলে, যে প্রজ্ঞাবলে গোদেহে চর্ম যোজনা করেছিলে, যে মনীষা দ্বারা ইন্দ্রের অশ্বদ্বয় নির্মাণ করেছিলে সে-সবের জন্যই দেবত্ব প্রাপ্ত হয়েছ।"

এতে রিভুদের সম্পর্কে মনে হয় তাঁরা পুরোহিতদের জাদুশক্তিরই প্রতীক। ঠিক অনুরূপ ক্ষমতা অশ্বিদ্বয়ের মধ্যেও লক্ষ্য করে গেছে। তারা মৃতকে জীবনদান, অন্ধকে দৃষ্টিদান, বৃদ্ধকে যৌবন দান ইত্যাদি নানা অলৌকিক কাজ করেছিলেন। এসবই হয় আয়ুর্বেদিক ক্ষমতা, নয়তো যৌগিক ক্ষমতা। দেখা যাচ্ছে মানুষও যদি এ ধরনের ক্ষমতা প্রদর্শন করতে পারে ঋগ্বেদীয় ঋষিরা তাঁদের দেবতা হিসেবেই বর্ণনা করতেন। এ ধরনের মানসিকতা অদ্যাবধি আমাদের মধ্যে বিদ্যমান। আমরা অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন কোন

মহাপুরুষকে আজও 'ভগবান' বলে সম্বোধন করি।

ঋগ্বেদে অপ্সরাদের উল্লেখ আছে। (অপ্সরা শব্দের অর্থ যারা জলে বিচরণ করে।) কিন্তু এই অপ্সরারা স্বর্গীয় অপ্সরা। দেশরূপ সলিলে এরা বিচরণ করে। যোগীরা অনেক সময়ই ধ্যানে এই সব নৃত্যরতা মূর্তি দেখে থাকেন। পুরাণে যদিও এঁরা স্থূলদেহী হিসাবে দেখা দিয়েছে—ঋগ্বেদে এঁরা সম্ভবত সূক্ষ্মদেহী ছিল। ঋগ্বেদীয় ঋষিরা হয়তো মানস দৃষ্টিতে এদের দেখেছিলেন। পরবর্তী সাহিত্যে নৃত্যগীতে অভিজ্ঞ গন্ধর্বদের সঙ্গে অপ্সরাদের উল্লেখ আছে। দেশ (space) থেকে এদের মর্ত্যভূমিতে নামিয়ে আনা হয়। ব্রাহ্মণ সাহিত্যে অপ্সরাগণ অপূর্বসুন্দরী মহিলা রূপে আবির্ভূতা হন। ঋগ্বেদে একজন অপ্সরার কথাই উল্লেখ আছে—উর্বশী। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে ৯৫নং সূক্তে তাঁর কথা আছে। আছে পুরূরবা ও উর্বশীর মধ্যে কথোপকথনের ভঙ্গীতে। এই সূক্তের ১০নং শ্লোকে উর্বশীর উল্লেখ স্পষ্টই পাওয়া যায়, যেমন—

"বিদ্যুন্ন যা পতন্তী দাবদ্যোদ্ভরন্তী মে অপ্যা কাম্যানি।
জনিষ্টো অপো নর্যঃ সুজাতঃ প্রোর্বশী তিরত দীর্ঘমায়ুঃ ॥১০

অর্থাৎ "যে উর্বশী আকাশ থেকে পতনশীল বিদ্যুতের মত ঔজ্জ্বল্য ধারণ করেছিল এবং আমার সকল মনোবাসনা পূর্ণ করেছিল তার গর্ভে মানুষের ঔরসে সুশ্রী পুত্রও জন্মগ্রহণ করল। উর্বশী তাকে দীর্ঘায়ু করুন।" এখানে অবশ্য উর্বশী স্থূল দেহীও। তবে যখন বশিষ্ঠকে উর্বশীর মানসজাত সন্তান বলা হয় তখন উর্বশী ভিন্ন অর্থে প্রতীয়মান হতে চায়।

ঋগ্বেদে কিছুসংখ্যক রক্ষক ও কুলদেবতার উল্লেখ আছে। এঁরা গৃহের কল্যাণের দিকে নজর রাখতেন। কেউবা ক্ষেত্ররক্ষকও ছিলেন। এঁদেরই একজনের নাম বাস্তোস্পতি। তার কাছে বিপদ আপদ থেকে ত্রাণ ও সমৃদ্ধি প্রার্থনা করা হত। নতুন গৃহে যাবার আগে এই বাস্তোস্পতিকে পুজো দিতে হত। এই বাস্তোস্পতিই বর্তমানে বাস্তুদেবতা। ভূমি কর্ষণারম্ভেও তাঁর পুজো দেওয়া হত। ভূমিতে লাঙলের ফলার মুখে যে দাগ পরত—যাকে বলে সীতা, সেই সীতাকেও দেবী নামে পুজো দেওয়া হত। এমন কি ভূমির উর্বরা শক্তি 'উর্বরা' দেবী নামে পুজো পেতেন।

ঋগ্বৈদিক যুগের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরাও যেমন ঋষি ও পুরোহিত—দেবতা হিসেবে পুজো পেতেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন বিবস্বত-এর পুত্র **মনু**, অগ্নি-পুরোহিত **অথর্বন**, অথর্বনপুত্র **দধ্যঙ্ক**, প্রাচীন ঋষি **অত্রি**, **কণ্ব**, ইন্দ্ররথী **কুৎস**, ঋষি **কাব্য উশনা**, **অঙ্গিরস**, **ভৃগু**, প্রভৃতি। এঁদের প্রত্যেকের সঙ্গেই কিছু না কিছু কাহিনী যুক্ত আছে। বর্তমানেও এই মানসিকতা রয়ে গেছে। ঋষিতুল্য ব্যক্তিরা অদ্যাবধি ভক্তদের পুজো লাভ করেন।

আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, ঋগ্বেদে বহু পশুও দিব্য মর্যাদা লাভ করেছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল দ্রুতগতি অশ্ব **দধিক্রা** বা **দধিক্রাবন**। দিব্য অশ্ব **তার্ক্ষ্য**। কোথাও কোথাও একে পাখি হিসেবেও দেখানো হয়েছে। আর একটি শ্বেত অশ্বের কথা আছে যার নাম **পৈদ্ব**। রয়েছে দ্রুতগতি অশ্ব **এতষা**। **গাভী** হবণ উষার চালনাকারী জন্তু। কিন্তু এর যথার্থ অর্থ আলোকরশ্মি। মৌসুমী

মেঘও অনেক সময় **গো**-হিসাবে বর্ণিত। মরুৎগণের জননীর **পৃশ্নিই** হলেন এই **গো**। গরুর একটা পবিত্র মর্যাদা ঋগ্বেদের যুগেই ছিল। এজন্য তাকে বলা হত **অঘন্যা**। **ইলা, অদিতি** ও **পৃথবী**কেও অনেক সময় **গো**-হিসেবে কল্পনা করা হত। অথর্ব বেদে এসে দেখা যায় গোপূজা রীতিমত প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। ইরাণীয় অবেস্ততেও গরুর প্রতি এই শ্রদ্ধা লক্ষ্যণীয়। ঋগ্বেদে দেখা যাচ্ছে **অজ পূষণের** রথ টানছে। অজ অর্থ দিব্যসত্তাও যখন একে বলা হয়েছে **অজ একপাদ**। পরবর্তী বেদে অজ অগ্নির সমার্থক হয়ে ওঠে। এমন কি **গর্দভ কুক্কুর** এরাও মূল্য না পেয়ে থাকেনি। কোন না কোন দেবতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে।

ঋগ্বেদে না হলেও যজুর্বেদে **শূকরও** দিব্য মর্যাদা লাভ করে। এই শূকর বা বরাহ দেশে (space) পৃথিবীকে ধারণ করে উদ্ধার করেছিল বলে গল্প আছে। বিষ্ণুর অবতার রূপেই তাকে কল্পনা করা হয়। **বৃষাকপি** নামে **বাঁদরও** ইন্দ্রের প্রিয় হিসেবে ঋগ্বেদে মর্যাদা লাভ করেছে। ভেকও ঋগ্বেদীয় সূক্তে স্তুতি লাভ করেছে। বিশ্বাস ছিল ভেকেরা গোধন ও দীর্ঘজীবন দান করে। ঋগ্বেদে দেখা যাচ্ছে **শ্যেন** নামে ইগল ইন্দ্রের কাছে যাচ্ছে।

ক্ষতিকর পশু পাখিও আছে। যেমন **বৃত্ররূপ** সর্প। যদিও যৌগিক ধারণা মতে বৃত্র হল মূলাধারস্থ কুল বা শক্তি যা প্রাণশক্তিকে বদ্ধ করে রাখে। ইন্দ্র তাকে হত্যা করেই প্রাণশক্তিকে দিব্য চেতনার স্তরে নিয়ে যান। ব্যোম-মার্গের নিবিড় কোনস্থানে **অহি বুধ্ন্যের** কল্পনা করা হয়েছে। পরবর্তী কালের বৈদিক সাহিত্যে গন্ধর্বাদির সঙ্গে সর্পের উল্লেখ করে তাকে দেবোপম মহিমা দেওয়া হয়েছে। সূত্র সাহিত্যে মনুষ্যরূপী সর্প-নাগের উল্লেখ পাওয়া যায়।

সাধারণ অর্থে জড় বলে যা প্রতীয়মান ঋগ্বেদীয় আর্যরা তাদেরও দিব্য মর্যাদা দিয়ে পূজো করতেন। এঁদের মধ্যে প্রথম উল্লেখ করা যায় পর্বতের কথা। **পর্বত** ইন্দ্রের সঙ্গে একত্রে মানুষের স্তুতি লাভ করেছে। বৃহৎ বৃক্ষকে বনস্পতি নাম দিয়ে পূজো করা হত। উদ্ভিদ পূজো লাভ করেছে **ওষধি** নামে। বলিদেবার **যূপ-কাষ্ঠও** মর্যাদা লাভে বঞ্চিত হয় নি। যজ্ঞের পাত্র **বর্হিও** দেবতার মর্যাদা পেয়েছে। যজ্ঞভূমির **দিব্য দরওয়াজাও** স্তুতি লাভ থেকে বঞ্চিত হয়নি। যা দিয়ে সোমলতা পেষণ করা হত সেই **গ্রাবন**ও স্তুতি লাভ করেছে। **খল** ও **দণ্ড** পর্যন্ত সম্মান লাভে বঞ্চিত হয়নি। ঋগ্বেদে কৃষি যন্ত্র **শুন** (লাঙলের ফাল) ও **সীরা** (লাঙ্গল)) পর্যন্ত সূক্তের ভাগী হয়েছে। ঋগ্বেদে অস্ত্রশস্ত্রাদিও স্তুতি লাভ করত।

ঋগ্বেদে প্রতিমা না থাকলেও ইন্দ্রের সম্পর্কে স্তুতিগানের সময় একটি সূক্তে এমন বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যে, মনে হয় ইন্দ্রের যথার্থই কোন প্রতিমারূপ ছিল।

পশু পাখি, জন্তু-জানোয়ার, জড়, উদ্ভিদাদি নানা জিনিসের প্রতি ঋগ্বেদীয় ঋষিদের এই শ্রদ্ধা অনেক সময়ই এমন ধারণার সৃষ্টি করতে পারে যে, ঋগ্বেদীয় ঋষিরা কুসংস্কারের দাস ছিলেন। কিন্তু বাস্তবে ঘটনা তা নয়। তাঁরা তাঁদের দিব্যদৃষ্টি দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন যে, সর্বত্রই দিব্য সত্তা বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত। তাদের সঙ্গে একাত্মতা স্থাপন যদি না করা যায়

তাহলে যথার্থ অর্থে সুস্থ জীবন যাপন করা সম্ভব নয়। নিজে বাঁচার জন্য পশুকুলকে হনন করে মানুষ আজ নিজেরই বিপদ সৃষ্টি করেছে। প্রকৃতির ভারসাম্য হারিয়ে গেছে। ইকোলজিকাল ব্যালান্স আজ বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অরণ্য ধ্বংস করে মানুষ আবহাওয়া মণ্ডলকে দূষিত করে তুলেছে। পেস্টিসাইড ব্যবহার করে শস্য বৃদ্ধি করতে গিয়ে দুরারোগ্য ব্যাধি আহ্বান করে এনেছে। অথচ পশুপাখি এরা যে কিভাবে শস্য রক্ষা করত আজ তা প্রকৃতি-বিশারদরা প্রকৃতি চর্চা করে জানতে পেরেছেন।

অরণ্যের অতীন্দ্রিয় আহ্বানে সাড়া দেবার ক্ষমতা আছে। উদ্ভিদ জগতের উপর কাজ করতে গিয়ে মানুষ সে কথা জানতে পেরেছে। পশুরা মানুষের মানসিকতায় সাড়া দিতে জানে—অনুসন্ধান করে এ সত্যেব সন্ধান পাওয়া গেছে। জড় পদার্থ যে জড় নয় আধুনিক বিজ্ঞান তাও প্রমাণ করে দিয়েছে। এই বিজ্ঞানের পথিকৃৎ আমাদের মহান এক বিজ্ঞানসেবী আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। সুতরাং সুস্থভাবে যদি জীবন যাপন করতে হয় তাহলে সকলের সঙ্গে একাত্ম সম্পর্ক স্থাপন করেই করতে হবে। কেউ যদি অন্তরের প্রার্থনা দ্বারা পশুপাখি কীটপতঙ্গ অবণ্য উদ্ভিদ সকলেরই সহযোগিতা অর্জন করে চলতে পারত তাহলে পার্থিব জীবনের চিত্রটাই আজ অন্যরকম হত। প্রাচীন আর্যরা এ-সত্য জানতেন বলেই অন্তরের সাদর আহ্বান জানিয়েছিলেন সকলকেই। সব কিছুর মধ্যেই দিব্যচেতনার সন্ধান করা কোন কুসংস্কারের ব্যাপার নয়। মহাব্যোম, দেশ, ছায়াপথ, গ্রহনক্ষাদি কিছুই যে চেতনাবিহীন নয় সত্যদর্শী যাঁরা তাঁরা তা জানেন।

আর্যরা অন্তর্লোকে ডুব দিয়ে মহাবিশ্বলোকের খবর পেয়েছিলেন। বিজ্ঞান আজও যার খবর পায়নি তাদের আন্তর-বিজ্ঞান বহুকাল আগেই তার সন্ধান পেয়েছিল। তাঁদের সেই মানসিকতার কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছুতে না পারলে আর্য-ঋষিদের দিব্যচেতনার অর্থ ধরা যাবে না। এই দেহের মধ্যেই মহাবিশ্ব রয়েছে একথা তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই দেহের মৌলশক্তির বিভিন্ন স্তর দেবতারূপে তাঁদের কাছে ধরা দিয়েছিল। ইন্দ্র, অগ্নি, সোম্য, মরুৎ, অদিতি, দিতি ইত্যাদি দেবতা সেই আন্তর মহাবিশ্বপরিক্রমার অভিজ্ঞতার উপর লিখিত। মিত্র তাদের কাছে সৌরলোকের সূর্য নয়, জ্যোতির আদি অবস্থা। আর্যধর্ম যদি বুঝতে হয় ঋগ্বেদের দেবতার চরিত্র যদি জানতে হয় তাহলে আর্যদের সেই অন্তর্জগতের খবর জানতে হবে। যজ্ঞ তাদের কাছে একটি প্রতীক মাত্র। মন্ত্র তাঁদের কাছে বিশ্বছন্দের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শব্দ উচ্চারণ। বেদ চর্চার জন্য তাই শিক্ষা, ছন্দ, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, কল্প, নিরুক্ত, অর্থাৎ উচ্চারণ শিক্ষা, ছন্দে পাঠ করা, বাক্যরীতি জানা, জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা করা, অনুষ্ঠান রীতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা, শব্দ-তত্ত্ব জানা সব প্রয়োজন হত। তাদের আন্তরিক অভিজ্ঞতা বাইরের জগতে প্রতীকরূপে দেখা দিয়ে আনুষ্ঠানিকতার সৃষ্টি করেছে। সেই অনুষ্ঠান দেখে যদি কেউ ভুল করেন, তাহলে আর্যদের অধ্যাত্ম সত্যের সন্ধান পাবেন না। ঋগ্বৈদিক আর্যদের স্বরূপ বুঝতে হলে তাঁদের মহাবিশাল মানসিকতার সঙ্গে একাত্ম হতে হবে।